চন্দ্রকেতুগড়

শ্রীপারাবত

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্থা
জুলাই, ১৯৬১

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রন
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

মধ্যরাত্র। সুষুপ্ত নগরী চন্দ্রকেতুগড়। জনশূন্য রাজপথ। কোথাও কোন আবর্জনা নেই। পরিচ্ছন্ন পথের দু'পাশে সমদূরত্বে আর্বজনা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান। কোথাও যাতে অযথা জল-সঞ্চয় না হয় তার জন্য দুই পাশে পোড়া মাটির পয়ঃপ্রণালী মাটির নীচ দিয়ে বিদ্যাধরী নদী পর্যন্ত প্রলম্বিত।

অনতিদূরে আবছা অন্ধকারে কাষ্ঠনির্মিত রাজপ্রাসাদ দৃশ্যমান। সেখানকার একটি গবাক্ষ থেকে টিমটিমে আলো বাহরে এসে পড়ছে। হয়ত সেই শয়নকক্ষেই মহারাজা চন্দ্রকেতু নিদ্রাচ্ছন্ন। কিংবা জাগ্রত রয়েছেন ভেবে রাতের টহলদার প্রহরীর সতর্ক হাঁক—নগরবাসী সাবধান থাকো। বলা যেতে পারে এই প্রহরা নগরবাসীদের মনে নিশ্চিন্ততা আনার জন্য। নইলে কোন প্রয়োজন হয় না। বহু বছর ধরে নগরে রাতের অন্ধকারে কোন অপরাধ হয় না। ঝগড়া বিবাদ এমনকি হত্যা ইত্যাদিও ঘটে যায়, সময়ে অসময়ে। তবে সে সমস্ত ব্যক্তিগত স্বভাবের দোষ। তবু এই প্রহরা চলে এবং চলবে। কারণ কোন এক সময়, বহু বৎসর পূর্বে হলেও, জলদস্যুরা মাঝে মাঝে বিদ্যাধরীর দুই কূলে অনেক অত্যাচার করেছে। সেই অত্যাচার বন্ধের জন্য দুই পুরুষ ধরে নদীর মুখে দুইটি জলযান রাখা আছে। তাতে সশস্ত্র প্রহরী থাকে। মহারাজা চন্দ্রকেতুর মনে পরিকল্পনা রয়েছো ক্ষুদ্রাকারের হলেও তিনি একটি নৌ বাহিনী গড়ে তুলবেন। নগরীর গড়ও নিরাপত্তার জন্যই নির্মাণ করা হচ্ছে। কাজ এখনো শেষ হয়নি। দক্ষ বাস্তুকার কৃতবিদ্য এটি নির্মাণের ভার গ্রহণ করেছে। তার অধীনে কাজ কবছে কর্মবীর হামা-দামা ভ্রাতৃদ্বয়। দূর থেকে শত শত ঝুড়িতে মাথায় করে এখনো মাটি আনা হচ্ছে। যেখানে ঝুড়ি ঝেড়ে আবার মাটি আনতে চলেছে, সেই স্থানটির নাম ইতিমধ্যেই লোক বলে ঝুড়িঝাড়া। সেখান থেকে অনেকে নিজ নিজ গৃহে মাটি নিয়ে যাচ্ছে। শত হলেও নদীর পাড়ের মাটি। মৃত্তিকাশিল্পীদের অনেকে এই মাটি কাজে লাগিয়ে নানা দেবদেবী, বুদ্ধদেব ইত্যাদির মূর্তি এবং মিথুন ফলক তৈরি করছে। মিথুনের ফলক খুব জনপ্রিয়। অসামান্য সৌন্দর্য এবং অনন্ত যৌবন ও সুখ ভোগের প্রতীক এই মিথুন। তারা সবাই তো বল্লভের মত জাত শিল্পী নয়। তারা পিতৃপুরুষেরা যেমন গড়েছে, তেমনি গড়ে।

গড়বেষ্টিত হলেও বিদ্যাধরী নদীর দিকের নগরদ্বারে প্রহরীর সংখ্যা তিনগুণ। কারণ মহারাজের প্রপিতামহের সময়ে নদীর দিক থেকে জলদস্যুরা এসে অপ্রস্তুত নগরীর অনেক ক্ষতিসাধন করেছিল। এখানকার পুরবাসীরা সেই সব ঘটনা নিছক গল্প-গাথাব মত শুনে আসছে। নইলে যামিনীর এই প্রহরে নূপুর-ধ্বনি শোনা যায় কেন? নিশ্চয়ই প্রত্যাশিত! নগরীর প্রহরীরাও এত সজাগ ভাবে নিজের নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? এই নূপুর-ধ্বনি তাদের সম্মোহিত করে। এই সময় নটী কাঞ্চনমালা প্রায় দিনই ফিরে যায় বিদ্যাধরী-তীরবর্তী তার কুটিরে। কোথা থেকে? যেখানে যেদিন নৃত্যের আসর বসে সেখান থেকে। রাজধানীতে ধনী ব্যক্তির অভাব নেই। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বণিক সম্প্রদায়ের। কারও রয়েছে কৃষিসম্পদ, কারও অনেক গরু-মহিষ। কাঞ্চনমালার গৃহদেবতা কুটিরে রয়েছেন, তারই হৃদয় দিয়ে গড়া প্রাণের দেবতা। কে এই দেবতা? কেউ জানে না। অনেকে বলে

একটি মূর্তি রয়েছে তার গৃহে, সবার অলক্ষ্যে। নাকি রক্তমাংসের গোটা মানুষ? তর্ক বাধে। মানুষের এত সয় নাকি? প্রতিদিন অন্যের দ্বারা আস্বাদিত হয়ে ফিরে এলে কোন্ পুরুষ সোহাগ-ভরে সাদর আলিঙ্গনে তাকে কাছে টেনে নেবে?

—নেয় নেয়। এ এক ইন্দ্রিয়জয়ী সাধুপুরুষ। আগের দিনের মুনি ঋষিদের মত এর কোন স্খলন নেই।

কোন্‌টা সত্য, আর কোনটা অসত্য কেউ জানে না। তবে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে বিদ্যাধরী থেকে সদ্যস্নাতা পট্টবস্ত্র পরিহিতা নটী একটি সাজিতে রাতের ফোটা শ্বেতপুষ্প চয়ন করে গৃহে প্রবেশ করে। বেলা একটু বাড়লে একজন স্ত্রীলোক এসে নদীর দিকে চলে যায়। সেখানে ওপার থেকে লোকেরা এসে তরিতরকারির পসরা নিয়ে বসে। সারারাত ধরে জালফেলা ধীবরদের জালে ওঠা টাট্‌কা মাছও পাওয়া যায়। স্ত্রীলোকটি সারাদিন কাঞ্চনমালার কুটিরে থেকে সায়াহ্নে চলে যায়। অনেকে কৌতূহলী হয়ে তাকে অনুসরণ করে নদীর তীরে কিংবা অন্য পণ্যশালায়। তার কাছ থেকে নটী সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার আগ্রহ তাদের। লাভ হয়নি। স্ত্রীলোকটি মূক। তর্ক ওঠে, মূক মানুষেরা তো বধির হয়। এতো বধির নয়। ক্রয় করার সময় বিক্রেতা যত কড়ির মূল্য দিতে বলে, গুনে গুনে ততগুলো দেয়। সবাই শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে।

বিদ্যাধরী নদীর রাজধানীর পাড় বরাবর ঘন ঘন শালগাছের খুঁটি দিয়ে সুরক্ষিত। যদিও নদী প্রশস্ত হলেও অশান্ত কোনদিনই নয়। তবে অতি বর্ষণে বা বন্যায় তার গর্বিতা এবং অশান্ত সপত্নী গঙ্গা কুল ছাপিয়ে তার সঙ্গে এসে মিলিত হয়। তখন সেও কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সেইজন্য এই সাবধানতা। গঙ্গা তাকে প্ররোচিত করে ক্রোধান্বিত করে তোলে। তাকে কোন রকমে স্পর্শ করতে পারলেই ফিস্‌ফিস্ ক'রে গঙ্গা বলে, তুই তো উপপত্নী। আমি পাটরানী। দুর্গার চেয়েও উঁচুতে, একেবারে শিবের মাথায়। দুর্গা অনশন করে করে কৃশ হয়ে গিয়ে ওঁর মন জয় করেছিল, আর আমি বিষ্ণুর কমণ্ডলু থেকে সোজা ওঁর জটাজূটের মধ্যে। তুই তো বলতে গেলে পাতালবাসিনী। স্বর্গের আস্বাদ পাবি না কখনো। বিদ্যাধরী নদী জানে কথাটা কতখানি সত্য। সে মনে মনে শিবের কাছে প্রার্থনা জানায়— এ জন্মে না হোক যেকোন জন্মে আমাকে তোমার পাশে ঠাঁই দিও। আর যদি সম্ভব হয় যদি কারও কোন ক্ষতিসাধন না হয় আমার অবলুপ্তি ঘটাও, আমাকে বিশুদ্ধ করে দাও। হৃদয়ে এত যাতনা চেপে রেখে প্রাণিজগৎ আর উদ্ভিদজগতের জন্য আমার স্নেহ ভালবাসা উথলে উঠতে চায় না।

তবু বিদ্যাধরী সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সহজতম পথ, যে সাগরের কৃপায় কতবছর আগে থেকে শ্বেতকায় মানুষদের সঙ্গে তাদের ব্যবসার সম্পর্ক। এই শ্বেতজাতির একজন, আলেকজান্দার যাঁর নাম, দেশের উত্তরে কত কাণ্ডই করে গেলেন। তিনি এদিকে আসতে পারেননি। সাধ্য ছিল না আসার। তবে তাঁর এবং তাঁর প্রতিবেশী দেশের মানুষেরা অনেক পণ্য আদান-প্রদান করে সুন্দর সম্বন্ধ গড়ে তুলেছিল। ওদেশের অনেকে খুব জ্ঞানী-গুণী, আমাদের মুনি-ঋষিদের মত। কৃষ্ণবর্ণ আর রক্তবর্ণের মৃন্ময় বাসনকোসন, ফলক, মূর্তি তার

আগে থেকেই নির্মিত হতে শুরু হয়েছে এই রাজবংশের রাজত্বে। কত অলংকরণ, কত লিপি এইসব মৃৎপাত্রের গায়ে। মনের কথা সংক্ষেপে লিখে রাখে কত শিল্পী। ভাবে, বহুযুগ অক্ষয় হয়ে থাকবে এই লিপি। ভূর্জপত্রের মত অল্পদিনে বিনষ্ট হয়ে যাবে না। শ্বেতকায়দের ব্যবহৃত সুরার পাত্র দেখে এখানকার শিল্পীরাও সেই আদলে মাটির পাত্র তৈরি করে। বিদেশেও যায় সেই পাত্র।

পুষ্পচয়ন করতে করতে প্রতিদিন কত কথা নটী কাঞ্চনমালার মনের মধ্যে শরতের শ্বেতশুভ্র হালকা মেঘের মত ভেসে ভেসে চলে যায়। মনে হয় সেই নিশীথের কথা যেদিন নৃত্যের আহ্বান পায়নি। গৃহে স্ত্রীজাতির বাধ্যতামূলক অবরুদ্ধতায় রাত জেগে বসেছিল। সেদিন সেই জনমানবহীন রাজপথ দিয়ে একটি শিবিকা নিঃশব্দে এসে তার কুটিরের সামনে আসল। সে বিনিদ্র রজনী যাপন করছিল বলে সবই দেখছিল। কৌতূহল তীব্র হয়। তার কুটিরে শিবিকা? হতে পারে না। কোন নারী কখনোই নটীর গৃহের মৃত্তিকায় পদস্পর্শ করতে আসবে না। পুরুষ এলেও আসতে পারে। তবে এই রাজ্যে তার কাছে কখনই নয়। আর পুরুষ তো শিবিকায় আসে না।

একজন নারী বাতায়নের সামনে এনে নিম্নকণ্ঠে বলে—নটী আপনি জেগে রয়েছেন দেখছি।

—হ্যাঁ।

—রাজমাতা অম্বিকা আপনার দর্শনপ্রার্থিনী।

বিস্মিত কাঞ্চনমালা বলে ওঠে—আমার দর্শন? তুমি বলছ কী? আমি তাঁর চরণের দাসী হওয়ার অযোগ্য। তিনি কেন আসতে যাবেন এখানে? তুমি কে?

—আমি তাঁর পরিচারিকা। তিনি শিবিকায় অপেক্ষা করছেন। আপনি বোধহয় গাছের আড়ালে শিবিকা দেখতে পাচ্ছেন না।

—আমি দেখেছি। কিন্তু আমাকে আদেশ করলেই তো—

—না। তিনি এখানেই আসতে চেয়েছিলেন।

কাঞ্চনমালা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দ্বার খুলে বাইরে যেতে চায়। নারী বলে—না, আপনি আপনার শয্যায় গিয়ে বসুন, যেমন বসেছিলেন। রাজমাতা আপনার গৃহে প্রবেশ করবেন।

কাঞ্চনমালা ব্যস্ত হয়ে সবচেয়ে মূল্যবান আসনটি পেতে দেয় ভূমিতে। সবচেয়ে বড় প্রদীপটি এনে জ্বেলে দেয়। তারপর রাজমাতা এসে প্রবেশ করতেই তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে। পদস্পর্শ করতে সাহস পায় না। হয়ত তাঁর কাছে সে অস্পৃশ্য। কিন্তু সে তাঁর পৃষ্ঠদেশে কোমল করের স্পর্শ পায়। তার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সে অস্ফুটস্বরে ডেকে ওঠে—মা।

—ওঠো কাঞ্চন। উঠে বস।

রাজমাতা ততক্ষণে কাঞ্চনমালার পেতে দেওয়া আসনে উপবেশন করেন।

—আপনি আমাকে স্পর্শ করলেন মা?

—কেন? তুমি অস্পৃশ্য হতে যাবে কোন্ দুঃখে?

-তাই তো বরাবর শুনে এসেছি। যদিও আমি সত্যই নৃত্যে পারদর্শিনী, তবু নটী যে বারবনিতার পর্যায়ের।

—জানি। সবক্ষেত্রে না হলেও অনেক ক্ষেত্রে তো বটেই। তবু আমি তোমাকে ঘৃণা করি না। কারণ নৃত্যকে তুমি পূজা কর। নৃত্যকালে তুমি এত আবিষ্ট হয়ে যাও যে সহজেই বোঝা যায় তুমি ঈশ্বরের সান্নিধ্য উপভোগ করছ। সেই আনন্দকে পার্থিব কোন আনন্দ নাগাল পেতে পারে না। আমি একথা জানি কাঞ্চন যে শুধু তোমার শিল্প নয়, তোমার অনুপম রূপের জন্য কালেভদ্রে তোমায় নৃত্য-ক্লান্ত দেহ কারও কামবহ্নির দ্বারা অপবিত্র হয়। তখন তো প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তাছাড়া তোমাকে উপার্জন করে দেওয়ার আর তো কেউ নেই। বাঁচতে হলে উপার্জন প্রয়োজন।

নটী কাঞ্চনমালার নয়ন ঝরে। জীবনে এমন কথা কেউ তাকে শোনায়নি। তার দেবতাও নন। তিনি শুধু হাসেন। হাসি ছাড়া তিনি তো কিছু জানেন না। এই পৃথিবীর মলিনতা তাঁকে যে বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করে না।

—আমি তোমার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি কাঞ্চন।

চকিত কাঞ্চনের চোখে মুখে ফুটে ওঠে অপার বিস্ময়। সে বলে ওঠে—আপনি এ কি বলছেন মা? এমন কথা শোনার আগে আমার মৃত্যু হল না কেন?

—শান্ত হও কাঞ্চন। যার যে ক্ষমতা রয়েছে, তাকে তার জন্য স্বীকৃতি দিতে কোন সংকোচ থাকতে নেই। আমার কথা শোনো।

—আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমার প্রাণ মন, আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা সবই আপনার চরণে সমর্পণ করলাম।

রাজামাতা অম্বিকা কাঞ্চনমালার মস্তক স্পর্শ করে বলেন—উতলা বা উচ্ছ্বাসপ্রবণ হওয়া কোন কাজের কথা নয়। আমার কথা আগে মন দিয়ে শোনো।

—বলুন মা।

—মহারাজ চন্দ্রকেতু আমার একমাত্র সন্তান। সে মহারাজা হলেও তার বয়স মাত্র দ্বাবিংশতি বৎসর। এই বয়সে পুরুষেরা কী রকম হতে পারে সেকথা অন্তত তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না।

কাঞ্চনমালা ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

—সে উদার-মনা, সে বীর সাহসী। সে তার রাজ্য সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করে। তাই ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম তার। নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদগ্র-লালসা তার মধ্যে নেই। এ কথা আমি তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সহচরদের কাছ থেকে জেনেছি। এই সহচরেরা আমার খুব বিশ্বাসী। তাছাড়া রাজ্যের পালক ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হলে সেকথা গোপন রাখা যায় না। তোমার কী মত?

—তাঁর সম্বন্ধে এই অপবাদ আমিও শুনিনি। এমনকি যারা নেশার বশে মহারাজের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে তারাও একথা কখনো উচ্চারণ করেনি।

—কিন্তু এই বয়সেও সে আমার কাছে তার মনের কথা বলে যা কেউ প্রত্যাশা করে না। সে তোমাকে দেখেছে।

—আমাকে?

—হ্যাঁ। তুমি তাকে দেখোনি?

—অনেকবার। দেশের অধীশ্বরকে দেখব না? তবে লুকিয়ে দেখেছি।

—তোমার বয়স কত?

—আপনার মুখে শুনে জানলাম যে আমি মহারাজের চেয়ে দুই বৎসরের ছোট।

রাজমাতা অম্বিকা দেবী বলেন—আমি তাকে রানী আনার প্রস্তাব দিয়েছিলাম কয়েকদিন আগে। উজ্জয়িনীর মহারাজের সঙ্গে আত্মীয়তা রয়েছে এমন একজনের কন্যার সন্ধান পেয়েছি। সেখানে সন্দেশ প্রেরণ করতে চেয়েছিলাম। সে সম্মত হয়নি।

—কেন?

—সে প্রশ্ন করেছিল, মেয়েটি নিশ্চয় খুব রূপসী? আমি বলি, দেবকন্যার মত। তখনই প্রশ্ন করল, তার গুণের কথাও শুনেছ তো? আমি বলি, গুণ নিশ্চয় রয়েছে। অত বড় ঘরের মেয়ে যখন। সে তখন বলে, রূপ আর গুণে যদি সমান হয় তাহলে তার আপত্তি নেই। শুনে আমার রাগ হয়েছিল। বলেছিলাম, তোমার কন্যা পাওয়া কি সহজ? ও তখন বলে, তাহলে আর দূত প্রেরণের প্রয়োজন নেই। আমি বললাম, হয়ত রূপের মত গুণও রয়েছে তার। যদি না থাকে, তা'হলে দ্বিতীয়বারে গুণবতী দেখে আনা হবে। যখন শুনেছি এই কন্যার রূপের অন্ত নেই, তখন একেই আনা হোক প্রথমে। আমি তাকে বোঝালাম যে আমি তার পিতার পাটরানী ছিলাম, অথচ তাঁর অন্য রানীরাও রয়েছেন। তাঁরা অবশ্য সন্তানবতী হননি দুর্ভাগ্যবশত। তবু তাঁরা তাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তবু শেষ কথা শুনিয়ে চন্দ্রকেতু বলে, রূপে আর গুণে সমান না হলে সে সম্মত হবে না। আমি তখন জিজ্ঞাসা করি, তেমন কেউ কি আছে? সে বলে, নিশ্চয়ই আছে, এই রাজধানীতেই রয়েছে। বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করি— কে সে? ও তখন তোমার নাম বলল।

রাজমাতার কথা শোনামাত্র কাঞ্চনমালার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়। তার চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তার মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্ত হয় না। সে বুঝতে পারে তার নারীত্বের লজ্জা রাজমাতার চোখে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। তবু সে আত্মরক্ষা করতে পারে না।

অম্বিকাদেবী বলেন—লজ্জার কারণ নেই কাঞ্চনমালা। আমিও নারী। তোমার মনোভাব আমি অনুমান করতে পারি। শান্ত হও। আমার কথা শেষ করতে দাও।

সেই সময় বিদ্যাধরী নদীর পার্শ্ববর্তী কোন বন থেকে প্রথমে একটি শৃগাল ডেকে ওঠে। তারপর একে একে অনেক শৃগালের ঐকতান।

রাজমাতাকে একটু বিচলিত বলে মনে হল। তিনি বলেন—রজনীর শেষ প্রহর বোধহয়। চন্দ্রকেতু তোমাকে কোথায় দেখেছে বল।

—মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন বটে। কিন্তু সেভাবে তো নয়।

—কীভাবে?

—বণিক চিত্রাক্ষ তাঁর প্রমোদভবনে নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আমি বরাবর জানি এঁর আসরে নিজের শৈল্পিক সত্তা সম্পূর্ণরূপে মেলে ধরলেও কলুষতা স্পর্শ করার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকে না। মহারাজকে দেখি সেই রাতে। তাঁকে সহসা দেখে আমি স্বর্গীয়

অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম। কিন্তু তিনি তো বেশিক্ষণ ছিলেন না। চিত্রাক্ষের শত অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিদায় নিয়েছিলেন।

রাজমাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—আমার মর্মপীড়ার অবসান হল। এইবারে আমি যে ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমি সেটি বলতে চাই।

—ভিক্ষা নয়, বলুন আদেশ।

—না, কখনই নয়।

ক্রন্দনরতা কাঞ্চনমালা বলে ওঠে—মা, নিজের হৃদপিণ্ড কি কেউ ভিক্ষা দিতে পারে? তাকে উপড়ে নিতে হয়।

বিস্মিত রাজমাতা আর্তস্বরে বলে ওঠেন—কাঞ্চন, তুমিও?

কাঞ্চনমালার মস্তক অবনত হয়।

রাজমাতা কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলেন—বেশ তাহলে আমার আদেশই শোন তুমি। আমাকে তুমি মা বলে সম্বোধন করেছ। সেই সূত্রে তুমি আমার দুহিতা। এই পরিচয় যেন অমলিন থাকে। আমি সবাইকে বলবো যে তুমি আমার কন্যাস্থানীয়া। এখন থেকে রাজপুরীর দ্বার তোমার কাছে অবারিত।

—মা, আপনি ভেবে বলছেন তো?

—হ্যাঁ, অনেক ভেবে বলছি। তুমি আমার কন্যা। সেই সূত্রে মহারাজা তোমার সহোদর ভ্রাতা। সে আমার কোন আদেশ অমান্য করে না। আগামী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় তাকে আমি তোমার কুটিরে পাঠাব।

—না না, এখানে মহারাজাকে কোথায় বসাব? আমি সামান্যা নারী।

—তার মা যেখানে আসতে পারে, সেখানে স্বচ্ছন্দে আসবে সে। তাছাড়া মহারাজ যার ভ্রাতা সে তো সামান্যা নয়। তুমি তাকে আমার এই আসনেই বসাবে। হাত ধরে এনে বসাবে।

—স্পর্শ করব? কঠিন পরীক্ষা। যদি আমার দুর্বলতা প্রকাশ পায়?

—পাবে না আশা করি। তোমার আরাধ্য কোন দেবতা রয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—কে?

—তিনি যে কে, আমি নিজেই জানি না। কখনো মনে হয় শিব। আবার কখনো সূর্য। সব দেবতাকেই তাঁর মধ্যে দেখতে পাই। ইনি কখনো যক্ষ, কখনো বিষ্ণু, কখনো কুবের। তবে সূর্যই আমার প্রিয়। ওই দেখুন ওই কোণে বসে রয়েছেন উনি। নদী থেকে মাটি এনে ওই মূর্তি গড়ে তুলেছি। ওটির সম্মুখে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলে ধীরে ধীরে সূর্যকিরণের প্রথম রঙিন রশ্মি আমার অন্তরে প্রবেশ করে পূর্ব রাত্রের সমস্ত গ্লানি দূর করে দেয়। আমি জানি উনি সর্ব-পাপহর, উনি সমস্ত সৃষ্টির উৎস। আবার ইনিই নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

রাজমাতা নিজেই মূর্তির দিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এগিয়ে যান। প্রায়ান্ধকারেও দেবতার হাস্যময় মুখ দেখতে পান তিনি। ভাবেন, এ তো মৃৎশিল্পী নয় তাহলে এমন অসামান্য প্রতিমা কী করে গড়ে তুলল? কে এই প্রতিভাময়ী? স্বয়ং শ্রী কি?

তিনি ফিরে এসে নটীর চিবুক স্পর্শ করে বলেন—তুমি কেন উজ্জয়িনীর সেই কন্যাটি হয়ে জন্মালে না কাঞ্চনমালা? তোমাকে সামান্য সময় দেখেই আমার পুত্র খাঁটি রত্ন চিনতে পেরেছিল।

—আমাকে লজ্জা দেবেন না।

—লজ্জা দেব? আমিই লজ্জিত। তোমার কোন মন্ত্র রয়েছে?

—কোথায় পাব? কে দেবে? মন্ত্র দীর্ঘ হলে মনে থাকে না। তার জন্য অক্ষর চিনতে হয়। আমি তেমন পারদর্শী নই।

—তাহলে?

—আমি নিজের মত পূজা করি। নিজের ভাষায় দেবতাকে বলি।

—রাত শেষ হয়ে আসছে কাঞ্চনমালা। চন্দ্রকেতু এলে তুমি তাকে বলবে, সে তোমার জন্ম-জন্মান্তরের সহোদর ভ্রাতা। তুমি তার ভগিনী।

কাঞ্চনমালা কেঁদে ওঠে।

রাজামাতা কঠোর স্বরে বলেন—আর কোন পথ নেই। মহারাজকে বাঁচাতে হবে। তার সম্মান বাঁচাতে হবে। পূর্ণিমার দু'দিন পরে দ্বিপ্রহরে প্রাসাদে তোমার নিমন্ত্রণ রইল। সেদিন শুধু চন্দ্রকেতু, তুমি আর আমি বসে অনেক কথা বলব। দেখবে, সূর্যদেবের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে কখন তোমরা সত্যই ভ্রাতা-ভগিনী হয়ে গিয়েছ।

রাজমাতার বিদায়ক্ষণে কাঞ্চনমালা তাঁর চরণে মস্তক স্পর্শ করে।

মাত্র কয়েকটি দিন। অথচ এই প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই। অনিদ্রায় কাটছে প্রতিটি প্রহর, প্রতিটি পল। কাঞ্চনমালার ভয় হয় সেকি অসুস্থ হয়ে পড়বে সেই' অতি-আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তে? সে কি মূর্ছা যাবে? তেমন হলে সে নিজেকে ক্ষমা করবে না। আত্মঘাতী হবে।

কোন্ সাজে সাজবে? নটীর সাজে তো নয় কখনই। তবে? পরিধানের জন্য মাত্র তিনটি বস্ত্র রয়েছে। সেগুলো খুব কর্কশ। বর্ষায় খুব অসুবিধা হয়। সিক্ত বস্ত্র শুকোতে চায় না। সে নটী বলে রক্ষা। নটীর সাজে অনেকটা সময় কেটে যায়। আর সেই সাজ আসে ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে উপহার রূপে। নইলে খুব অসুবিধা হত।

কিন্তু মহারাজাকে কোন্ বস্ত্র পরিধান করে আহ্বান জানাবে? সহসা তার চোখের ওপর এসে পড়ে বিদ্যাধরী নদীর দিকের বাতায়নে দিনান্তের রবির রঙিন রশ্মি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় মহারাজা তো ওই দয়িতের মতই পবিত্র ও মহাসম্পদ। পট্টবস্ত্র পরিধান করে তাঁকে আহ্বান জানাবে। করজোড়ে সে অস্তগামী সূর্যকে প্রণাম করে।

পূর্ণিমায় বৃহৎ গোলাকার চন্দ্র যেদিন যে মুহূর্তে পূর্বগগনে উদিত হয় ঠিক তখন মহারাজের আদরের হস্তী মন্দার নিঃশব্দে এসে কাঞ্চনমালার কুটিরের অদূরে সারি সারি গাছের আড়ালে চন্দ্রকেতুর ইঙ্গিতে সুন্দরভাবে হাঁটুভেঙে মাটিতে বসে পড়ে। চন্দ্রকেতু লাফ দিয়ে নেমে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গিয়ে দ্বারে করাঘাত করেন।

কাঞ্চনমালা চমকে উঠে ছুটে গিয়ে দ্বার উদ্‌ঘাটন করে অপ্রস্তুত এবং বিহ্বল। নিজের অসাবধানতার জন্য অজস্রবার মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দেয়।

চন্দ্রকেতু মৃদু হেসে বলেন—কী হল, আমাকে আহ্বান জানাবে না?

—মহারাজা, আমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছি। গত তিনদিন প্রতিটি পল এই মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করেছি। শেষে কেন যে এমন হল—

চন্দ্রকেতু বলেন—অমন হয়। ও কিছু নয়। তুমি পট্টবস্ত্র পরেছ কেন? পূজা করছিলে বুঝি?

—পূজা? হ্যাঁ পূজাই তো। আপনাকে গৃহে আহ্বান করা পূজা ছাড়া কী?

রাজমাতার আদেশের কথা মনে পড়ে যায় তাই সে সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে নিরাসক্ত চিত্তে মহারাজের হাত ধরে তাঁকে কুটিরে সেই একই আসনে বসতে দেয়।

—বাঃ, সুন্দর ফুলের সুঘ্রাণ কাঞ্চনমালা।

—আজ আমি অনেক পুষ্প এনেছি। নদীর ওপারে তো ফুলের চাষ হয় তাদের অনেকে আমাকে পছন্দ করে। আমি তাদের বলেছিলাম দিয়ে যেতে, দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোন মূল্য নিল না কিছুতেই।

—ওরা তোমাকে ভালোবাসে।

—আপনি ভুল করেছেন মহারাজ। সবাই নয়। আমি নটী। আপনি যাদের কথা শুনেছেন, তাদের চোখের দিকে চাইলে বুঝতে পারতেন।

—কী বুঝতাম?

—তাদের অনেকের দৃষ্টিতে কামনার বহ্নি।

—অস্বাভাবিক নয়। সাধারণ মানুষ অনেকে অমন হয়।

—কেন হবে?

—এ তো তোমার আমার হাত নয়। সবাই জানি ওপরে একজন রয়েছেন। তাঁর ইচ্ছায় সব কিছু ঘটে। তিনি বোধহয় এমন চান। তাঁর উদ্দেশ্য শুধু তিনিই জানেন।

—আজকের দিনটা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

—সেই ভাবে ভাবলে আমারও। আচ্ছা, তোমার এখানে এভাবে থাকতে কোন অসুবিধা হয়?

—আমার আর কি অসুবিধা? এইভাবেই তো আছি।

—কিন্তু সামান্য অসুবিধা হলেই এবার থেকে আমাকে বলবে। মা বলে দিয়েছেন তুমি আমার ভগিনী।

কাঞ্চনমালা ভাবে মহারাজ কত স্বাভাবিক। কিন্তু সে তো হতে পারছে না। মহারাজকে সহোদর বলে ভাবতেই পারছে না। তার মনের মধ্যে মহারাজা যে আসন নিয়ে বসে রয়েছেন সেখান থেকে তাঁকে সরাতে পারছে না। ভাবে, নারীর মন কি সত্যই ক্লেদাক্ত? কেন মহারাজকে বারবার স্পর্শ করার জন্য প্রলুব্ধ হচ্ছে?

—চুপ করে আছ কেন কাঞ্চনমালা? আমি একা বলে সঙ্কুচিত বোধ করছ?

—না মহারাজ, না। আপনি আসায় আমি এত অভিভূত যে মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারছি না।

—আমি আজ তোমার জন্যে কিছু আনতে পারিনি। মা বললেন, তুমি কদিন পরে

রাজপুরীতে যাবে। তখন তোমাকে কিছু দেব। শূন্য হাতে এসে ভাল লাগছে না।

কাঞ্চনমালা নিজের মন থেকে কলুষতা বিদূরিত করার চেষ্টায় বলে—মহারাজ আপনি যার ভাই তার উপহারের কোন প্রয়োজন হয় না। এই সম্মানটুকু তাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে।

—তুমি কি জান, মা আমাকে কেন তোমার কাছে পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ। আমাকে উনি বলেছিলেন।

—চিত্রাক্ষের বিলাস গৃহে সেদিন তোমার নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আমার মনে হয়েছিল ওই নৃত্য পৃথিবীর কোন মানুষকে তুষ্ট করার জন্য নয়। তোমার যৌবন আর তোমার রূপ ওই নৃত্যকে একটা স্বতন্ত্র মাত্রায় উন্নীত করেছিল। তাই আমার মাকে বলেছিলাম রানী নির্বাচন করতে হলে অমন নারীকে ঘরে আনতে হয়। আমি একটুও ভুল করিনি।

—কিন্তু মহারাজ আপনার ওই উক্তি শুনে সেই নারীর মানসিক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে, একথা একবারও কি অনুভূতি দিয়ে ভাবার চেষ্টা করেছিলেন?

—সেই নারীর কানে এসে পৌঁছোবে, একথা ভেবে তো বলিনি। তাছাড়া পৌঁছলেই বা কি? সে অনেক সংযমী রয়েছে। আমি জানি এবারে তুমি কী বলবে।

—কী?

—মা উজ্জয়িনীতে যে দূত পাঠাবেন স্থির করেছেন তাকে পাঠিয়ে দিতে বলবে।

কাঞ্চনমালা হেসে বলে—বলবই তো। তিনি অসামান্যা রূপবতী। কতটা গুণবতী না এলে বুঝবেন কী করে? গুণ তো রূপের মত চোখে দেখা যায় না। দীর্ঘদিন ধরে না দেখলে বোঝা যায় না।

—তারপর?

কাঞ্চনমালা মনে মনে বলে, আমার বুকটা চিরে যদি দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে। আপনার প্রতিটি কথা, এমনকি আপনার নিশ্বাস প্রশ্বাসেও যেন সঙ্গীতের মূর্ছনা।

সে কোন রকমে বলে—যদি মনের মত না হয়, তাহলে দ্বিতীয় রানী নিয়ে আসবেন।

—তোমরা তেমন পারবে?

—পুরুষের সঙ্গে নারীর তুলনা? সৃষ্টিকর্তা নারীকে বোধহয় একটু অন্যভাবে গড়েছেন। তাদের স্বভাব পুরুষের মত হলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য বোধ হয় পুরুষকে বহুগামীও হতে হয়। সেই বীজ পুরুষের মধ্যে উপ্ত থাকে। আপনি জানেন আমি কুমারী নই, সতীও নই।

—তবু তোমাকে দুটির কোন একটি ভেবে নিতে আমার অসুবিধাটা হচ্ছে না।

সহসা কাঞ্চনমালার মনের মধ্যে কি যেন ঘটে গেল। রাজমাতার উপদেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয় সে। চন্দ্রকেতুর জন্য আকুল হয়ে ওঠে তার দেহ-মন। অন্তত একবার ভালভাবে স্পর্শ করতে চায় সে। একটা রাখি তৈরি করে রেখেছিল। উঠে গিয়ে সেটিকে নিয়ে এসে রা— বলে—রাখি পরাব।

—আজই?

—ক্ষতি কী?

মহারাজা হাত বাড়িয়ে দেন। সে সেই হাত কাছে টেনে নিয়ে রাখী পরাতে গিয়ে সুতো বাঁধতে পারে না প্রথমে। তারপর বাঁধা হয়ে গেলে হতাশ হয়ে ভাবে, আবার স্পর্শ করার কোন ছল নেই। সে কেমন যেন হয়ে যায়।

ঠিক সেই সময়ে একটি বৃহৎ এবং স্থূলকায় শুঁড় কুটিরের দ্বার ঠেলে ভেতরে চলে আসে। কাঞ্চনমালা তাই দেখে ভীত হয়ে মহারাজের কাছে সরে এসে দাঁড়ায়।

চন্দ্রকেতু হেসে বলেন—ভয় পেও না। মন্দার আমাকে ডাকছে। ও আমার বাহন। ও ওর মাহুত শিতিকণ্ঠ বা আমার দেহরক্ষী অচঞ্চলকে গ্রাহ্য করে না।

—ওটা যে আপনার হাতীর শুঁড়, আমি কল্পনাও করিনি।

চন্দ্রকেতু ডাকেন—অচঞ্চল?

একজন স্বাস্থ্যবান যুবক মন্দারের শুঁড় একপাশে ঠেলে দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে।

—ওকে তুমি বোঝাতে পারলে না?

—মাহুত শিতিকণ্ঠই পারল না। আমাকে তো অবহেলা বরাবরই করে। ভাবে, আমি ওর অধিকারে হস্তক্ষেপ করছি। আমি ওকে প্রহার করেছি।

—তোমার প্রহার তো ওর কাছে আদরের স্পর্শ। আজ তাহলে আসি কাঞ্চনমালা। পরে দেখা হবে। সেদিন মধ্যাহ্নে যেও। অন্য সময় ব্যস্ত থাকতে পারি। অনেক সময়ে নগরীতে থাকি না।

কাঞ্চনমালা সম্মতি জানায়।

সেই সময়ে পরিপূর্ণ চন্দ্র আকাশের আরও ওপরে উঠে এসেছে।

বর্ষীয়ান দূত যক্ষ একদিন মহারাজা এবং রাজমাতার অনুমতি নিয়ে উজ্জয়িনীর উদ্দেশে যাত্রা করে। তার সঙ্গে দেওয়া হয়েছে দশজন রক্ষী এবং উপঢৌকন। বহুদূরের পথ, বেশিকিছু দেওয়া সম্ভব নয়।

যক্ষের বয়স হলেও এখনো বেশ কর্মঠ। সে বাক্‌পটু এবং দূতীয়ালিতেও খুব দক্ষ। তবু যক্ষের বয়সের কথা ভেবে মহারাজা চন্দ্রকেতু যতদূর সম্ভব তাকে জলযানে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সম্ভব হলে কাশী পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে স্থলপথে উজ্জয়িনীর দিকে যাত্রা করবে।

আরও কিছুদিন পরে গেলেও চলত, কিন্তু মহারাজাকে সেদিন সন্ধ্যায় কাঞ্চনমালার কুটিরে যেতে দেখে প্রজারা খুব কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। তাঁদের মধ্যে নানারকম আলোচনা শুরু হয়েছে। সেইদিনই পঁচিশ-ত্রিশজন প্রজার দলের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেহরক্ষী অচঞ্চল বলেছিল মায়ের আদেশে কাঞ্চনমালার কুটিরে মহারাজের পদার্পণ। তারা অবিশ্বাস করেনি। কারণ এভাবে সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে কখনো মহারাজা নটীর গৃহে যেতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁর চরিত্র নিয়ে কখনো বিন্দুমাত্র প্রশ্নও ওঠেনি। তবু মানুষের মন তো। সামান্য বিষয়বস্তু পেলেই সেটাকে নাড়াচাড়া করে বিশাল করে তোলে।

ফলে যক্ষকে এত শীঘ্র যাত্রা করতে হল এবং বেশ প্রচার করেই তাকে পাঠাতে হল। সবাই

জানল, উজ্জয়িনীর রাজবংশের এক অসামান্যা। সুন্দরী তাদের রাজার রানী হতে চলেছেন। নটী কাঞ্চনমালার রূপও তাঁর কাছে নিষ্প্রভ। রাজমাতা সেদিন পুত্রকে নটীর রূপ দেখতে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নিজের রানী প্রাসাদে এলে যাতে তিনি মিলিয়ে দেখতে পারেন মায়ের কথা সঠিক কি না। এইভাবে কল্পনামিশ্রিত গুজব ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সবার মধ্যে একটা খুশি খুশি ভাব। তাদের রাজার রানী আসছেন। আর তিনি আসছেন পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত বা মিথিলা থেকে নয় ; সুদূর অবন্তী থেকে। প্রেত-সিদ্ধ মহারাজা বিক্রমাদিত্যের আত্মীয়ের কন্যা তিনি। উজ্জয়িনীর প্রাসাদ থেকে বেশিদূরে নয় তাঁর বসতবাটী।

রাজামাতা অম্বিকা রাজদূত যক্ষকে বুঝিয়ে বলেছেন, কন্যার পিতাকে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করতে হবে, তিনি গঙ্গারিদি রাজ্যের অধিপতি চন্দ্রকেতুর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহে সম্মত আছেন কি না।

যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছিল—কেন সম্মত হবেন না? আমাদের মহারাজের মর্যাদা কি তুলনায় কম?

রাজামাতা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ যক্ষ। উত্তর ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইত্যাদি নিয়ে অনেক বাছাবাছি রয়েছে, যা আমাদের ধারণায় আসে না। তুমিই বল, চন্দ্রকেতু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, না বৈশ্য? কিংবা সে কি শূদ্র?

যক্ষ মাথা চুলকে বলে—এ কথা কখনো মাথায় আসেনি। তবে কন্যার পিতা সেই প্রশ্ন তুললে সঙ্গে সঙ্গে বলব, যিনি সিংহাসনে উপবেশন করেন, যিনি অস্ত্রদ্বারা শত্রুকে দমন করার জন্য সদাপ্রস্তুত, যিনি রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটতে দেন না, যিনি প্রজাদের অনশনে মৃত্যু হতে দেন না তিনি যদি ক্ষত্রিয় না হন, তবে তিনি কী?

রাজমাতা অম্বিকা আনন্দিত হয়ে বলে ওঠেন—ঠিক বলেছ। এইজন্যই তোমাকে পাঠাচ্ছি। আর কারও এত ক্ষুরধার বুদ্ধি নেই। কন্যার পিতা সম্মত হলে তুমি বলবে, কন্যাকে তোমার সঙ্গে প্রেরণ করতে। তবে তিনি যেন একশত সৈন্য পাঠান, আর তাঁর কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কন্যার সঙ্গে আসেন। এ ছাড়া এক বা একাধিক পরিচারিকা যেন আসে। নইলে নববধূর খুব অসুবিধা হবে। এখানকার ভাষা সে জানে না। আমাদের ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা হলেও অন্যরকম। ওদের কথ্য ভাষা আমাদের মত নয়।

—বুঝেছি মা। আমার দৃঢ় ধারণা কন্যার পিতা মহারাজের পরিচয় পেয়ে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। তাতে মহারাজা বিক্রমাদিত্য নিশ্চয় সম্মতি দেবেন।

—কী করে এই ধারণা তোমার হল?

—কারণ তিনি জানেন, আমাদের সঙ্গে শ্বেতকায় মানুষদের দীর্ঘদিন থেকে সম্বন্ধ রয়েছে বাণিজ্যের মাধ্যমে। তাদের মধ্যে অনেকে এই দেশের টানে এখানে স্থায়ীভাবে থেকে গিয়েছে। এদেশের মেয়েদের নিয়ে ঘর পেতেছে। তাদের সন্তান-সন্ততি আমাদের মধ্যে মিশে গিয়েছে। আমাদের মহারাজার পূর্বপুরুষদের রাজত্বকালে অলেকজান্ডার অবন্তীর দিকে এসেছিলেন। সেই আলেকজান্ডার আমাদের গঙ্গারিদির কথা জানতেন।

—তুমি ঠিকই বলেছ যক্ষ।

যে বিখ্যাত পোতাশ্রয় থেকে দ্রব্যসম্ভার নিয়ে অর্ণবপোত দেশবিদেশে যাত্রা করে সেখানে

একটি সুবৃহৎ বজরা ভিড়ল একদিন। যক্ষ এল। প্রধান সেনাপতি ধনুর্ধর এল। নিজে সে সৈন্যদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে উপযুক্ত কিছু সৈন্য নির্বাচন করে যক্ষের সঙ্গে দিল। কারণ প্রত্যাবর্তনের সময় মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কিছু সৈন্য কন্যার সঙ্গে আসতে পারে। স্বীয় আত্মীয়ের সম্মান তিনি রাখবেন। সেই সৈন্যরা যাতে গঙ্গের সৈন্যদের চেয়ে উৎকৃষ্ট না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রেখে ধনুর্ধর নিজে এসে বেছে দিল যক্ষের রক্ষীদলকে।

বজরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত। দাঁড়ী এবং কিছু সৈন্য বজরার শক্ত রজ্জু খোলার জন্য হাত লাগাতেই ধনুর্ধর রাজপথের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—খুলো না। একটু অপেক্ষা কর।

যক্ষ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। সে যাত্রাকালে এই বাধাদানে বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে—কি হল?

—মহারাজের সুহৃদ চিত্রক অশ্ব ছুটিয়ে আসছে। নিশ্চয় কোন সংবাদ রয়েছে।

একটু পরে চিত্রক অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে বজরার দিকে এগিয়ে যায়। সে যক্ষের বন্ধুপুত্র।

—কী সংবাদ চিত্রক? মহারাজা পাঠিয়েছেন?

—হ্যাঁ তাত। আপনি কষ্ট করে নীচে নামবেন না। আমি যাচ্ছি আপনার কাছে।

চিত্রক বজরায় উঠে এগিয়ে গিয়ে বলে—মহারাজা একটি বিষয়ে আপনাকে সন্ধান নিতে বলেছেন।

— কোথায়?

—উজ্জয়িনীতেই। কন্যার পিতার সঙ্গে কথোপকথনের সময় যতটা সম্ভব জেনে নিতে বলেছেন। তাঁর খুব আগ্রহ দেখলাম।

ভ্রূকুঞ্চিত করে যক্ষ প্রশ্ন করে— কোন্ বিষয়ে বলতো?

—মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভায় বরাহ আর তাঁর পুত্র মিহির রয়েছেন। দুজনাই রত্ন।

—জানি সেকথা।

—আমাদের মহারাজা বললেন, পিতা বরাহ খুবই বড় জ্যোতির্বিদ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর পুত্র নাকি আরও উঁচুদরের। তাঁর জীবনকথার যেটুকু মহারাজা শুনেছেন, অদ্ভুত বলে মনে হয়। মহারাজা দেখলাম এঁদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। কী করে জানলেন, বুঝলাম না।

—দেশ বিদেশের কত জ্ঞানীগুণী মানুষ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাই অনেক কিছু জানেন তিনি। আমরা কি করে জানব? তুমি তাঁর সুহৃদ হতে পার। কিন্তু সব বিষয়ে তো তিনি তোমার সঙ্গে আলোচনায় করেন না। বরং কদাচিৎ গুণবানকে ডেকে পাঠান। সে বিজ্ঞ ব্যক্তি।

—আপনি যথার্থ বলেছেন। মহারাজার কৌতূহল কিন্তু শুধু মিহিরেই শেষ হচ্ছে না। তিনি মিহির-জায়া খনা সম্বন্ধে জানতে চান। কারণ খনার কৃষিবিষয়ে নাকি অগাধ পাণ্ডিত্য। আমাদের এই গঙ্গারিদি রাজ্য কদলী উৎপাদনের ওপর তো বহুলাংশে নির্ভরশীল। গত বছর কদলীবৃক্ষে মড়ক লাগায় আমাদের রাজকোষের অবস্থা এখনো খুব ভাল নয়। আপনি যে কোন ভাবে হোক, এ বিষয়ে খনা দেবীর মতামত জেনে নেবেন।

যক্ষ ধীরে ধীরে মাথা দোলায়। ভাবে, তাদের মহারাজা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছেন, তবু তাঁর মস্তিষ্ক কত পরিণত। রাজ্য সম্বন্ধে তিনি কত গভীরভাবে ভাবেন।

সে বলে—আমি অবশ্যই মহারাজের আদেশ পালন করব। যে কাজের জন্য আজ যাত্রা করছি ঠিক তার সমান গুরুত্ব দিয়ে আমি দ্বিতীয় কার্যোদ্ধারে ব্রতী হব। মহারাজকে তুমি গিয়ে একথা বলবে।

চিত্রক আর অপেক্ষা না করে বজরা থেকে নেমে অশ্বে আরোহণ করে দ্রুত ছুটিয়ে দেয় রাজপ্রাসাদের দিকে।

গঙ্গারিদি রাজ্যে রম্ভা নামে একটি বৃহৎ অঞ্চল রয়েছে। প্রবাদ আছে সেটি কোন একসময়ে জলের নীচে ছিল। কেউ বলে, সমুদ্রের নীচে, কেউ বলে গঙ্গানদী। অথচ এটি এখন গঙ্গা তো দূরস্থান বিদ্যাধরী নদী থেকেও আধক্রোশ ভেতরে। কেউ বলে রম্ভা ছিল বিশালাকার চর। কেউ বলে ওটা ছিল দ্বীপ। পরে জোড়া লেগে গিয়েছে এই রাজ্যের সঙ্গে। তবে একথা সত্য কদলী চাষের সময় লাঙলের ফলায় দু-একটি বড় শঙ্খও উঠে এসেছে এক-আধবার। রম্ভার উর্বর ভূমিতে শালি ধানের চাষও হয়। অন্যান্য স্থানেও কয়েক রকমের সুগন্ধিজাতের ধানের চাষ হয়। সেই ধানের চাউল সমুদ্রপথে বাইরেও যায়।

মহারাজা চন্দ্রকেতু তাঁর প্রয়াত পিতার উপদেশ অনুযায়ী তাঁর রাজ্যে দুই শ্রেণীর মানুষকে খুব প্রাধান্য দেন। পিতা বলতেন, এরাই তোমার শক্তি। বাইরের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে এরা তোমার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনো যাবে না, তবে তোমার আর তোমার যোদ্ধাদের মনোবল এরাই দৃঢ় রাখবে। এরা তোমার সম্পদ, নগরবাসীরা নয়। তারা শুধু অলংকার। তোমার দুই পেশীবহুল হাত হচ্ছে শবর আর ধীবর। বুঝতে পারলে না তো?

চন্দ্রকেতু সেদিন সত্যই বুঝতে পারেনি। কারণ তাঁর বয়স তখন অনেক কম ছিল। পিতার মৃত্যুর একবছর পূর্বের কথা এটি।

পিতা মৃদু হেসে বলেন—আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তুমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান, আমি বললেই বুঝতে পারবে। কৃষকেরা আমাদের অন্নবস্ত্র যোগায়। তারাও আর একটি শক্তি। তারাও যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ করে। কদলী চাষ যেবার নষ্ট হয় সেবার আমাদের রাজ্যের অবস্থা অসচ্ছল হয়। তবু ধীবরদের কেন প্রাধান্য দিচ্ছি, শোন। সম্রাট অশোকের নাম তো শুনেছ। তিনি সিংহাসনে আরোহণের সময় মগধের পরাক্রম বিশ্বের সব দেশ জানত। তাই এদেশের অন্য কোন রাজশক্তি দূরস্থান, বাইরের দিগ্বিজয়ী বীরেরাও অশোকের পূর্ব থেকেই এই দেশে প্রবেশ করতে ভরসা পাননি। পাননি শুধু মগধের ভয়ে। কলিঙ্গ জয়ের পরে সম্রাট অশোক বলতে গেলে সর্বশক্তিমান হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁর সময় থেকেই তাঁর অমিত শক্তিক্ষয়ের সূত্রপাত হল।

কৌতূহলী চন্দ্রকেতু প্রশ্ন করেছিলেন— কেন? কেউ কি তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল?

—না। কেউ সাহস পায়নি। কোন সামগ্রী ঘুণপোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে বাইরে থেকে কি বোঝা যায়? যায় না। শেষ পর্যন্ত সেটি যখন ভেঙে পড়ে তখন সবাই সচকিত হয়। ঘুণপোকা তাঁর সময়েই লেগেছিল।

—কীভাবে?

—তুমি তো জান, তিনি বিশ্বের এক অতি মহান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। বৌদ্ধধর্ম। আমি বুদ্ধদেবকে মনে মনে শ্রদ্ধা করি।

—তুমি একটুও ভুল করনি। তিনি শ্রদ্ধেয় না হলে কে হবেন? তুমি জান তাঁর ধর্মের মূল কথা হচ্ছে অহিংসা।

—হ্যাঁ।

—খুব ভাল কথা। প্রতি ধর্মেই ধর্মের প্রবর্তক ছাড়া কিছু কিছু শক্তিমান পুরুষ থাকেন যাঁদের আচরণে আর স্বভাবে সেই ধর্মের মূলকথা প্রতিভাত হয়। তাঁরাই যুগ যুগ ধরে ধর্মটির ঔজ্জ্বল্য দীর্ঘস্থায়ী করে রাখেন। বুদ্ধদেবেরও কিছু ভক্ত ছিলেন যাঁরা খুব সংযমের সঙ্গে থেকে সাধারণের নিকট ধর্মটির আকর্ষণ হ্রাস পেতে দেননি। বরং যুগের পর যুগ সেই ধর্মকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন। অশোকের জন্ম বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের বহু বৎসর পরে। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলেন সন্ন্যাসী উপগুপ্তকে স্বচক্ষে দেখে। উপগুপ্ত তেমনই এক পুরুষ যিনি বুদ্ধদেবের জীবন নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন। অশোক তাই দেখে মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অথচ তিনি বোধহয় শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে মৌর্যবংশের নিষ্ঠুরতম নরপতি ছিলেন। কী বুঝলে চন্দ্রকেতু?

চন্দ্রকেতুর তন্ময়তা ভাঙে। তিনি বলেন—আরও বলুন।

পিতা বলেন—অশোক তখন কী করলেন? তিনি চাইলেন তাঁর সাম্রাজ্যের প্রতিটি মানুষ এক একজন উপগুপ্ত হয়ে উঠুক। নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সবাই হিংসা-দ্বেষ বিস্মৃত হোক। তারা নিরামিষাশী হয়ে উঠুক। কিন্তু প্রতিদিন এত পশু বলি হচ্ছে, এত মৎস্যশিকার হচ্ছে, সে সব যাবে কোথায়? অশোক আদেশ দিলেন—সব বন্ধ কর। পশুবলি হবে না। ধীবর মৎস্যশিকার করবে না। কিন্তু পরিবর্তে তারা কী করবে? তাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি করে? ফলে কর্মহীন হয়ে পড়ল তারা। সামান্য একটু মাংস বা মাছের গন্ধে যারা পরিতৃপ্তি সহকারে উদরপূর্তি করে তারা ক্ষীণবল হতে লাগল। ধনবানেরা মাছ-মাংসের পরিপূরক অনেক কিছু যোগাড় করতে পারে কিন্তু দরিদ্রেরা তা পারে না। ফলে ভেতরে ভেতরে উষ্মা জাগতে থাকে সবার মনে। তারপর এই সব বিধি অগোচর লঙ্ঘিত হতে থাকল। শত সহস্র মানুষ কর্মহীন বলহীন হয়ে পড়ল।

চন্দ্রকেতু বলে—অশোক বোধহয় ভুল করেছিলেন। সাধারণ মানুষ যেভাবে যে খাদ্যই গ্রহণ করুক, তাকেই সমর্থন করা উচিত। আমি জানি ওরা কি খায়। অবস্থা যাদের একটু ভাল তারা কল্পনা করতে পারবে না। ওদের সব কিছুতেই অশোকের সমর্থন থাকা উচিত ছিল।

—তুমি একথা বললে, কারণ তুমি সবার সঙ্গে মেলামেশা কর। তিনি বোধহয় তা করতেন না। তিনি সম্রাটের পুত্র। সেই ভাবেই বড় হয়েছিলেন।

—আমি তো রাজপুত্র।

পিতা হেসে বলেন—দেখ চন্দ্রকেতু, তুমি রাজপুত্র হলেও সেই সময় মৌর্যবংশের যে পরাক্রম আর ঐশ্বর্য ছিল, সেই তুলনায় গঙ্গারিদি তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তবু আমি অশোকের সমালোচনা করতাম না।

—তবে? তিনি কি মনেপ্রাণে বৌদ্ধ ছিলেন না?

—অবশ্যই ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে পৃথিবীর বহুদেশে বৌদ্ধধর্মের বিজয় কেতন উড়েছে। নিজের কন্যা ও পুত্রকে তিনি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত করেছিলেন। তবু যতটা আত্মসংযম এবং নিষ্ঠা তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত ছিল তিনি তা দেখাতে পারেননি।

—কেন?

—তুমি জান, ময়ূর থেকে মৌর্য কথাটা এসেছে। ময়ূর মৌর্যদের অতিপ্রিয় খাদ্য ছিল।

—শুনেছি।

—প্রাসাদে ময়ূরের মাংস খাদ্যনির্ঘণ্ট থেকে কখনো বাদ পড়েনি। কিন্তু এই কথা তোমাকে বিশ্বাস করতে বলছি না। যিনি মহান হন, যিনি বিরাট হন, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ব্যক্তি কুৎসা রটনা করে। স্বয়ং বুদ্ধদেবেরও শত্রু ছিল। তুমি বরং এ থেকে শিক্ষা নাও। বৌদ্ধধর্ম খুবই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম। এই ধর্মের একতা অনুকরণ যোগ্য। আরও বড় হলে মগধের কোন জ্ঞানী ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করে এনে এই ধর্ম সম্বন্ধে জেনে নিও। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ওই ধর্মে অদৃশ্য ঈশ্বরের কোন প্রাধান্য নেই।

—তাই কি হয়?

—হয়। অন্তত আমি যতটুকু জেনেছি। যাঁর কাছ থেকে জেনেছি তিনি আমাকে একথাই বলেছিলেন।

—কে তিনি?

—তিনি জৈনধর্মের অনুগামী।

—সেই ধর্ম সম্বন্ধে আমি জানি না।

—আর একদিন শুনো। আমি আজ খুব ক্লান্ত।

সেই বিশেষ দিনটি আর কখনো আসেনি। চন্দ্রকেতুর পিতার জীবনে সেই অবকাশ আর হয়ে ওঠেনি। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে চন্দ্রকেতু মগধ থেকে একজন ভিক্ষুকে নিয়ে আসার বাসনা পরিত্যাগ করেননি।

সেদিন এত কথার পর, চন্দ্রকেতু যখন আলোচনার খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন, তখন তাঁর পিতা মৃদু হেসে বলেছিলেন—এত সব কথা যে আমি বললাম এসব কিসের জন্য? আমাদের আলোচনার বিষয়টি কি তুমি ভুলে গেলে?

চন্দ্রকেতু একটু থমকে যান। তারপর হেসে বলেন—না পিতা, শবর আর ধীবর।

—বাঃ, সুন্দর মনে রেখেছ। হ্যাঁ ধীবরদের ভাতে মেরেছিলেন অশোক। শবরদেরও হয়ত। তাই বলেছিলাম, ওরাই আমার রাজ্যের সম্পদ। ওরা রয়েছে বলে মাছ-মাংসের অভাব হয় না এই রাজ্যের অধিবাসীদের। তুমি প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে লক্ষ্য করে দেখবে স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ কারও মধ্যে নেই। তবে যারা রোগগ্রস্ত তাদের কথা স্বতন্ত্র। এসব জনগোষ্ঠীর সৈন্যদল দেহ এবং মনে দুর্বল হতে পারে না।

চন্দ্রকেতু বলেন—ধীবরদের সম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি নিজে নৌকা করে মাঝনদীতে গিয়ে ওদের মৎস্য শিকার দেখি এবং শিখি।

—আমি জানি, তুমি রাতও কাটিয়েছ ওদের নৌকায়।

—হ্যাঁ পিতা, ওরা খুব পরিশ্রম করে।

—পরিশ্রমই ওদের বাঁচিয়ে রাখে। এই পরিশ্রম ওদের বলিষ্ঠ করে। তবে বহু শবর রাজধানীতে এলেও তাদের সম্বন্ধে তোমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

—না।

—সেই অভিজ্ঞতা পেতে হলে তোমাকে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।

—নেবো।

—নিও। তবে একবছর পরে।

—কেন পিতা?

পিতা বলতে পারেন না যে তাঁর পরমায়ু আর বেশিদিন নেই। রাজবৈদ্য সেকথা বলে দিয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছে ঠিকই। কারণ, তিনি বিবাহ করেছিলেন একটু বেশি বয়সে এবং তাঁর পাটরানীর সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধান বেশি। যদিও দুই বৎসর কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁর খুল্লতাত-মন্ত্রী আরও দুই রানী এনেছিলেন ভ্রাতষ্পুত্রের জন্য। তিনি নিজে অবিবাহিত ছিলেন। চন্দ্রকেতুর মা অবশ্য বলেছিলেন যে তিনি জানতেন যে তাঁর পুত্রসন্তান হবে। কারণ বালিকা বয়স থেকে তিনি শংকরের পূজা করেন। রাজা ভাবতেন, একটি বিশ্বাস নিয়ে তো আছেন রানী। তাঁর নিজের বিশ্বাস কার প্রতি নিজেই জানতেন না। তবে প্রজাদের প্রত্যেকে তাদের বিশ্বাস নিয়ে চলে। তিনি অনুভব করতেন, তাঁর রাজ্যে দূর থেকে ভেসে আসা বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রভাব থাকলেও সাধারণত এক এক অঞ্চলের মানুষ এক এক ধরনের দেবদেবীর পূজা করে। কখনো তারা নদীর পলিমাটি দিয়ে মূর্তি গড়ে, কখনো বিশেষ কোন বৃক্ষের পাদমূলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে। কোথাও একাধিক দেবদেবী নানা রূপে পূজিত হন। তবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অজানা দেবদেবীকে তারা তুচ্ছ করে না। সমানভাবে শ্রদ্ধা করে। কোথাও কোথাও সেই শ্রদ্ধা বা ভক্তি ভীতিমিশ্রিত, কোথাও বা তার মধ্যে একটু মধুর স্পর্শ লেগে রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝা সব কিছুর মধ্যেই তারা চন্দ্র-সূর্য তারার কাছাকাছি ওপরের সেই অদৃশ্য দেবতার রূপ দেখতে পায়। তিনি হলেন, ভগবান। তিনি রাণী অম্বিকার শংকর। তিনি আবার শিবও। এই শিব এরাজ্যের বহু ব্যক্তির কাছের মানুষ। তিনি ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করেন। গঙ্গারিদি সংলগ্ন অরণ্যভূমিতে কতশত ব্যাঘ্র বিচরণ করে। শিব যদি এদেশের দেবতা না হতেন তাহলে তিনি নিশ্চয় অন্য কোন চর্ম পরিধায়ী হতেন, অথবা বল্কল। এছাড়া আরও কত দেবতা রয়েছেন। বিষ্ণু রয়েছেন, আছেন কুবের যক্ষ-যক্ষিনী, শ্রী দেবী।

এই রাজ্যের বহু মানুষ সেই বিশাল অন্তহীন অরণ্যভূমির অভ্যন্তরেও গিয়েছে। সখ করে কেউ যায়নি। যেতে হয় পেটের দায়ে। শবরদের প্রধান উপজীবিকা তো অরণ্যভূমিকে সম্বল করে। কেওড়া, ধুধুল, হেতাল আর গরাণ এবং সুন্দরী ইত্যাদি অজস্র রকমের বৃক্ষ সমন্বিত অটবী। শববেরা বলে কোন কোন স্থান সূর্যদেবেরও স্পর্শের বাইরে! বন্য শ্বাপদের চোখ জ্বলজ্বল করে সেখানে। বিচরণ করে বাঘ, ভাল্লুক, দাঁতার শুয়োর, চিতা আর তাদের কারও কারও জন্য লোভনীয় খাদ্য রূপে অনেক হরিণ। বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় অনেক কিচির-মিচির। পাখি নয়, বাঁদর। পাখিও রয়েছে তবে ওই গভীর অরণ্যে অত নয়। আর কোথাও

বৃক্ষশাখায় ঝুলে রয়েছে বৃহদাকার ময়াল সাপ খাদ্যের অপেক্ষায়। কোথাও কেউটে আর শঙ্খরাজ উজানে প্লাবিত সিক্ত মাটি ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলেছে খাদ্যের সন্ধানে। রয়েছে অগুনতি বড় বড় রক্তচোষা জোঁক। তারা যে পশুর গায়ে একবার লাগে উদরপূর্তির আগে ছাড়ে না তাকে। তারপর বিশাল আকার ধারণ করে দংশন শক্তি হারিয়ে মাটিতে খসে পড়ে।

বন পার হলে জল। কোথাও নদী কোথাও খাঁড়ি। সেখানেও নিস্তার নেই। বৃহদাকার কুমীর ওৎ পেতে রয়েছে ডাঙা ঘেঁষে। তারই মধ্যে অসমসাহসী শবরদের আনাগোনা। প্রাণ হাতে নিয়ে তারা যায়। যাত্রার পূর্বে তাদের অঞ্চলের দেবতাকে সবাই মিলে অত্যন্ত ভক্তিপূর্ণ চিত্তে পূজা করে বটে তবু দেবতা তো সবাইকে ফিরিয়ে দেন না। কারও পুত্র যায় কারও বা জামাতা, কারও পৌত্র যায় তো কারও দৌহিত্র। নবপরিণীতারা কাঁদে বিদায়ের পূর্বরাত্রে সারাক্ষণ ধরে স্বামীর বুকে মাথা রেখে। বিদায়কালেও সেই ক্রন্দনের উপশম হয় না। তবু তারা বলতে পারে না, যেওনা। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা।

এই সব দুঃসাহসী শবরেরা বন্যপ্রাণীর সম্মুখীন হয়। তাদের বধ করে। ব্যাঘ্রও নিস্তার পায় না এদের হাত থেকে। নইলে শিব কখনো ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিত হতেন না। তাদেরই অদম্য সাহসে তাঁর জটাজুট আর কণ্ঠ বিষধর সর্পশোভিত হতে পেয়েছে। রাজধানীর চিত্রকরেরা তাঁর পটই আঁকে, মৃত্তিকা শিল্পীরা তাঁর প্রতিমা গড়ে। সেই সব নিয়ে এখানকার একদল শিল্পী মাঝে মাঝে দেশ-দেশান্তরে চলে যায়। গান গেয়ে মানুষকে মোহিত করে ওইসব দেখিয়ে আর বিক্রয় করে।

বনভূমির প্রতি শবরদের আরও একটি বিশেষ আকর্ষণ হল, সেখানকার অগাধ মধু-ভাণ্ডার। মৌচাকগুলো দেখলে মনে হয় কেউ যেন বড় বড় পাহাড়কে উপড়ে এনে গাছের শাখায় উল্টো করে বসিয়ে দিয়েছে। শবরেরা তাদের নিজেদের পদ্ধতিতে এই চাক-ভাঙা মধু সংগ্রহ করে এনে রাজধানী চন্দ্রকেতুগড়ে উপস্থিত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর মহারাজা চন্দ্রকেতু এই শবর সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তাদের দলের সঙ্গে অরণ্য-ভূমিতে গিয়েছিলেন। বজরায় নয়, ওদের মত নৌকায়। খাঁড়ির ভেতরে বজরা যায় না। চন্দ্রকেতু নৌকায় কয়েকবার রাত্রি যাপনও করেছেন। ওদের সঙ্গে শিকার করেছেন। মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয়েছে কয়েকবার। তবু মৃত্যু হয়নি তাঁর। সেবারে তাঁর সঙ্গী ধীবরদের মধ্যে দুজনে ফিরে আসেনি। আর আসেনি রাজধানী থেকে তাঁর চার সঙ্গীর একজন। সে ভুল করে জলে নেমেছিল। জানত না সেখানে বাঘ না থাকলেও কুমির রয়েছে। তার সেই চিৎকার এখনো কানে ভেসে আসে। যুগ যুগ ধরে এমন কত আর্তনাদ যে বৃক্ষরাজি ভেদ করে অসীম আকাশে বিলীন হয়ে গিয়েছে কে তার খোঁজ রাখে?

মহারাজা চন্দ্রকেতু ঠিক করেছেন শববেরা যে মধু বা চর্ম নিয়ে আসে তার কিছু যদি অবিক্রিত থেকে যায় তাহলে সেগুলো তিনি কিনে নেবেন। এইজন্য তিনি নদীর তীরে একটি ভাণ্ডার গৃহ নির্মাণ করেছেন। শবরেরা এমন সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করেনি। তারা খুব নিশ্চিন্ত। তারা বুক ফুলিয়ে বেড়ায়।

ধীবরদের জন্যও তিনি এই ধরনের একটা কিছু করার ইচ্ছাপোষণ করেন। তবে কিছু ভেবে উঠতে পারেননি। পরিচিত ব্যক্তি এমনকি মন্ত্রী সেনাপতিদের মধ্যেও একটা উপেক্ষার ভাব। তারা বলে, ওরা ভালই আছে। এর চেয়ে ভাল কেই বা থাকে। বণিক চিত্রাক্ষ একমাত্র ব্যতিক্রম। সে তাঁর কথায় ইতিমধ্যে মৎস্যজীবীদের নৌকা নির্মাণ এবং জাল তৈরিতে সাহায্য করেছে। সে মনে মনে বিদ্যাধরীতে একটি অর্ণবপোত নির্মাণের কারুশালা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। মহারাজা তাকে উৎসাহিত করেন। তাকে ভাল লাগে চন্দ্রকেতুর। নবীন যুবক। যথেষ্ট উদার। জীবনকে ভোগ করতে পারে, আবার প্রয়োজনে স্বার্থত্যাগ করতে এতটুকু দ্বিধা নেই। এর সঙ্গে কিছু শ্বেত বণিকের বন্ধুত্ব রয়েছে। তাদের অনেকের ভাষায় সে একটু আধটু কথা বলতে পারে। তারাও তার কাছ থেকে কাজ চলার মত কিছু শিখে নেয়। তারা নানা রকমের সামগ্রী নিয়ে আসে। সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু খুবই আর্কষণীয়। তবে বিশেষ একটি অর্ণবপোতের অধ্যক্ষের সঙ্গে চিত্রাক্ষের সম্পর্ক খুব গভীর। তার কারণও রয়েছে। সেই মানুষটিকে চিত্রাক্ষ একবার চন্দ্রকেতুর সামনে উপস্থিত করেছেন। চন্দ্রকেতুর খুব ভাল লেগেছিল তার সঙ্গে আলাপ করে। তখন চিত্রাক্ষ মহারাজকে একটি পানীয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল। তিনি তখন সেই পানীয় সম্বন্ধে বিদেশীর সামনে চিত্রাক্ষকে প্রশ্ন করেছিলেন।

চিত্রাক্ষ একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিদেশীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করেছিল। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্ময়ভার কণ্ঠে চিত্রাক্ষকে কিছু বলল।

চিত্রাক্ষ তখন মহারাজকে বলে—এ বলছে আপনাকে স্বচ্ছন্দে বলা যায়। কারণ আপনি এই ভূখণ্ডের অধীশ্বর। কোন কিছু গোপন রাখা কখনো উচিত নয় আপনার কাছ থেকে। তাছাড়া এটা কোন অপরাধ নয়। তাদের দেশে এটা দৈনন্দিন পানীয়ের অন্তর্ভুক্ত। এদেশেও এই ধরনের পানীয় সে চোখ দেখেছে। তবে সে সব অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর। তাই এবারে একটু বেশি করে এনেছে।

চন্দ্রকেতু বলেন— তোমার এত দ্বিধা কেন? তুমি কি গোপনে কোন পাপাচার করছ?

—না মহারাজ, কখনো নয়। তাহলে বলেই ফেলি। বড় বড় অলিঞ্জর ভর্তি করে ওরা ওদেশের উৎকৃষ্ট সুরা নিয়ে আসে। সেই সব বড় বড় কলসের ভেতরের গায়ে কয়লা থেকে নিঃসৃত একপ্রকার তরল পদার্থ মাখিয়ে শুকিয়ে নেয়। তাতে সুরা এক ফোঁটাও চুইয়ে বাইরে আসতে পারে না। তাতে সুরায় এক ধরনের গন্ধ হয়। ওদের কাছে সেই গন্ধ খুব ভাল লাগে। আমারও—

চিত্রাক্ষ কথাটা শেষ করতে পারে না। সে খুব অপ্রস্তুত হয়। তার মাথাটা নুইয়ে যায়।

চন্দ্রকেতু সামান্য হেসে বলেন—সঙ্কোচের কারণ নেই চিত্রাক্ষ। যার নিবাসে নটীর নৃত্য হয় সেখানে অনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু হয় একথা সবাই ধরে নেয়। তাছাড়া আমি নিজে মদ্যপ না হলেও মদিরা আমার এবং আমার বংশে অস্পৃশ্য নয়। সময়ে অসময়ে স্বাদগ্রহণ করতে হয়। স্বাস্থ্যের কারণেও বটে, আনন্দের কারণেও বটে। আমাদের শবর আর ধীবরেরা এই পানীয়ে খুব আসক্ত। আমি তাদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে আস্বাদন করেছি। ওদের

সুরায় মাদকতা থাকলেও স্বাদের উন্নতি করার মত সময় আর সামর্থ্য ওদের নেই।

মহারাজের মন্তব্যে খুবই উৎসাহিত হয়ে চিত্রাক্ষ তার নাবিক বন্ধুকে তাঁর কথা বলে। সে সঙ্গে সঙ্গে নীচু হয়ে মহারাজাকে অভিবাদন জানিয়ে চিত্রাক্ষকে কিছু বলে।

চিত্রাক্ষ বলে—মহারাজা ও বলছে, ওদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য ছাড়াও বাড়তি চার অলিঞ্জর এবারে ওরা নিয়ে এসেছে। তার মধ্যে একটি আপনাকে দিয়ে যাবে। আর আপনি অনুমতি দিলে পরের বার আপনার জন্য তো বটেই, একটু ব্যবসাও করতে চায়। তবে এই দ্রব্য আনতে নাকি যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। সমুদ্রের একঘেয়ে জীবনে নাবিকেরা ও জিনিস একটু বেশি পান করে। এমনও ঘটেছে যে খেতে খেতে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠে মারামারি করে সমুদ্রের অতল তলে তলিয়ে গিয়েছে জলযান সমেত।

—তবে থাক।

—না মহারাজ। ও প্রতিবারই আনে। ওদের সব পোতেই এই পানীয় প্রচুর পরিমাণে থাকে। এটা বলতে গেলে ওদের প্রতিদিনের পানীয়। ওদের দেশে দ্রাক্ষা হয় প্রচুর। সেই দ্রাক্ষার নির্যাস থেকে এর উৎপাদন। আমাদের দেশের মত অন্ন কিংবা ইক্ষুর রস দিয়ে নয়।

—হ্যাঁ, অথচ আমরা দ্রাক্ষা চোখেই দেখি না। যেটুকু দেখি ওদের কল্যাণে। তবে উত্তরে এই ফল উৎপন্ন হয়। খুব অল্পই এদেশে আসে।

চিত্রাক্ষ এবারে বিদায় নিতে চায়। চন্দ্রকেতু তাদের বিদায় দেন। বিদেশী নাবিক তাদের দেশের নিয়মে এবারে সুন্দর ভাবে তার দেহ নুইয়ে বিদায় নিল। খুবই মনোগ্রাহী ওদের চালচলন। ওদের দেখেই তিনি ধনুর্ধরকে বলেছিলেন, অমন চট্‌পটে করে তুলতে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে। কারণ মৌর্যরা যেমন ছিল, গুপ্তরা যেমন রয়েছে তার তুলনায় তাঁর সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই অল্প। তার কারণও রয়েছে। তাঁর রাজ্যের দক্ষিণ দিক থেকে এদেশীয় কোন নরপতির আক্রমণের সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। ওই নিবিড় অরণ্য ভেদ করে তাদের আসতে হলে প্রকৃতিপ্রদত্ত তাঁর রক্ষকদের ডিঙিয়ে আসতে হবে, যা প্রায় অসাধ্য। তবে বাণিজ্যপোত যদি আসতে পারে, সৈন্য বোঝাই জলযানই বা আসবে না কেন? তিনি এ বিষয়ে সেনাপতি ধনুর্ধর, মন্ত্রী শল্য এবং আরও অনেকের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাদের টনক নড়েছে। তারা স্বীকার করেছে মহারাজের দূরদৃষ্টি অসামান্য। আকস্মিক বিপদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ধীবরদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে জলরক্ষীর দল তৈরি করতে হবে। প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহৎ যুদ্ধযান নির্মাণের ভার নিয়েছে চিত্রাক্ষ। ওই দিয়ে তার হাতেখড়ি। এখনো কাজ চলার মত জলরক্ষী রয়েছে বটে। তবে তারা যৎসামান্য। জলযানটিও বড় নয়। নদীবক্ষের দস্যুদের উৎপাত যাতে না হয় সেইজন্য রয়েছে।

চিত্রাক্ষের সঙ্গে নাবিকের বন্ধুত্বের মূল কারণ যে সুরা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে সুফল হল ওদের ভাষা শেখা। চিত্রাক্ষকে বলতে হবে আরও কিছু লোককে নিয়ে ওদের ভাষা শিখতে। শুধু পুরাণ আর বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র পাঠ শেষ করলে যে চলবে না একথা সব বিদ্যান ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দিতে হবে। ভাষাবিদ্ গুণবানকেও বলতে হবে। সংস্কৃত প্রাকৃত আর পালির পুঁথির মধ্যে ঘাড় গুঁজে থাকলে হবে না, ওদের ভাষাও শিখতে হবে। ওরা

অনেক কিছু জানে যা এদেশের আয়ত্তের বাইরে। ওদেশের যুদ্ধবিদ্যার রহস্যাদি শেখারও প্রয়োজন রয়েছে। শান্তি আপাত সুখ দিলেও, কূপমণ্ডুক হয়ে বসে থাকলে ধ্বংস হতে হয় শেষ পর্যন্ত।

কাঞ্চনমালার দিন কাটে না। রজনীর প্রহরগুলো আরও দুঃসহ। এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় বাড়ির চারপাশের কুঞ্জ থেকে একটি দুটি করে পাখি জেগে ওঠে। ঊষায় আলো ফুটে ওঠে ধীরে ধীরে। সে আর শুয়ে থাকতে পারে না। শয্যাত্যাগ করে উঠে পড়ে। ততক্ষণে পাখিরা রীতিমত সুর করে গান গাইতে শুরু করে। তারা এডাল ওডালে লাফিয়ে খেলা করে। নিত্যদিন ওদের উৎসব। ডানা মেললেই ওরা খাদ্যের সন্ধান পায়। মানুষের মত তো নয়। খাদ্য মুখে তোলার আগে মানুষের বেলায় রন্ধন নামে একটি প্রক্রিয়া রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। ওদের তেমন কিছু নেই। প্রকৃতি দেবী ওদের খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন।

সেই কবে মহারাজা দয়া করে পদার্পণ করে দুদণ্ড থেকে চলে গেলেন আর দয়া করে রাজপুরীতে যেতে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। সেখানে গিয়ে সে কত সমাদর পেল, যা ছিল তার স্বপ্নের অতীত। ভাবল, জীবনটা কত সুন্দর। নটী কাঞ্চনমালার দিকে মানুষ অন্যদৃষ্টিতে চাইতে লাগল। শুধু বণিক চিত্রাক্ষ নয়, ধনপতি কনকধ্বজ অবধি তাদের নৃত্যের আসরে তাকে আহ্বান করতে দ্বিধাবোধ করেছিল। মনে মনে কাঞ্চনমালার কত গর্ব হল।

কিন্তু নটীর তো বসে থাকলে চলে না। প্রথমত নৃত্য তাদের রক্তের মধ্যে। নৃত্যের মাধ্যমে নিজের প্রকাশ। না নাচলে মনে হয় জীবন বৃথা। তার ওপর উদরপূর্তির কথাও মনে রাখতে হয়। কারণ কিছুদিনের মধ্যে তার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে আসে।

সেই সময় নৃত্য সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে একপ্রকার উদাসীনতা এসে যায়। ভাল লাগে না। ভাল লাগে না কোন কিছুতে। নিজেই ভাবে, সব কিছুতেই এই উদাসীনতা কেন? একসময় আসে যখন তার খাদ্যের প্রতিও রুচি থাকে না। সখী বলতে শুধু উর্বশী। সদ্য বিবাহিতা। সচ্ছল পরিবারে বিবাহ হলেও স্বামীকে বেশী কাছে পায়নি। স্বামী নানা কাজে এ-নগর সে-নগর ঘুরে বেড়ায়। তার আদর্শ চিত্রাক্ষ। সে চিত্রাক্ষ কিংবা কনকধ্বজের মত বিরাট ধনী হতে চায়। নাম তার দ্বিজন্ম। স্বামীর উপর উর্বশীর অগাধ আস্থা। সে বলে, স্বামী তার অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং চরিত্রবান। সে সফল হবেই।

উর্বশী হেসে বলে—বুদ্ধিমান বুঝলাম। কিন্তু চরিত্রবান কী করে বুঝলি?

—সে তো বোঝা খুব সোজা। পরস্ত্রী দেখলে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। মাথা সামনে ঝুঁকে পড়ে। তুই দেখলে না হেসে পারতিস না।

এই কথাবার্তায় কিছুদিন পরেই উর্বশী একদিন থমথমে মুখে এসে বলেছিল—ও চলে গেল।

—কোথায়?

—বাণিজ্যে। জলযানে। ফিরতে অনেক দেরি হবে। আমি সারারাত ওকে জড়িয়ে ধরে কত অনুনয়-বিনয় করলাম। টলানো গেল না। বলল, আগে চিত্রাক্ষ হই। তখন সব সময়

তোমার সঙ্গে থাকব লক্ষ্মীটি।

উর্বশী বলল যে দ্বিজন্ম খুব নরম প্রকৃতির। কিন্তু সংকল্পে অবিচল। সে সখীর সামনে বসে অশ্রুপাত করছিল। কাঞ্চনমালার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছিল সখীর অশ্রুধারায় দিকে তাকিয়ে। তখনই তার সব বিষয়ে এত ঔদাসীন্যের প্রকৃত কারণ মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে পাপীয়সী। হ্যাঁ তার মত পাপিষ্ঠা ধরাতলে কেউ নেই। এতদিনের অজানা অপরিসীম বেদনা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে। শেষে সেও কেঁদে ওঠে অস্বাভাবিকভাবে। সেই কান্নার শব্দে উর্বশী চমকে ওঠে। অবিশ্রান্ত বারিধারায় ভেসে যায় কাঞ্চনের মুখ, বুক সব কিছু।

উর্বশী প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। তারপর নিজের কষ্ট বিস্মৃত হয়ে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে থাকে সখীর মুখের দিকে। সময় চলে যায়, তবু সে নিঃশব্দে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে কাঞ্চনের অশ্রুধৌত মুখের দিকে। গভীর মর্মবেদনা কীভাবে গলে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে দেখতে থাকে সে। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে তার মনের সঙ্গে দেহও যেন অবশ হয়ে যায়।

শেষে যখন সখী কিছুটা প্রকৃতিস্থ হয় সে তখন বলে—শুনেছি নটীদের হৃদয় থাকতে নেই। তোর তবে মরণ হল কেন? কে সেই পুরুষ যে নটীর মন ভোলায়?

কাঞ্চনমালা ফুঁপিয়ে ওঠে—আমি পাপিনী।

—সে কী করে হয়? কাউকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করা তো পাপ নয়।

—সেই জন্যই আমি পাপিনী। আমার বাইরে এক রূপ, ভেতরে অন্য। ঘটা করে যাঁর হাতে রাখি পরিয়েছি। তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করে বসে আছি।

উর্বশী চিৎকার করে ওঠে—সখী!

—হ্যাঁ। এখন কি করি? আমি জানি যারা আমাকে নৃত্যের আসরে ডাকবে তাদের ওখানে গেলেও আমার নৃত্যের তাল কেটে যেতে পারে। আমি সেদিন মহারাজকে স্পর্শ করার অত্যুগ্র কামনার জন্যই রাখী বন্ধনের ছল করেছিলাম। অথচ তিনি প্রবেশের সময়ে আমার মন ছিল পবিত্র। তাই পট্টবস্ত্র পরিধান করেছিলাম। তাঁর হাত ধরে ভেতরে এনেছিলাম। তারপর হঠাৎ কী যে হল। এখন কী করি?

—এর উত্তর তোরই ভাল জানা উচিত।

—আমি জানি না। সেদিন আমার মন পবিত্র ছিল। তারপর ওঁর সঙ্গে কথা বলার পর থেকে আমার ভেতরের কু আমাকে প্ররোচনা দিতে থাকে। তারপর রাখিবন্ধনের সময় তাঁকে স্পর্শ করতেই তাঁর ভেতর থেকে একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ আমার শরীরে প্রবেশ করে আমাকে বিহ্বল করে তুলল। অনেক কষ্টে সেদিন নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। কিন্তু সেই সংযমে ধস লেমেছিল তখনই। কী করব সই!

উর্বশী বহুক্ষণ নীরব থাকার পরে বলে—বলব?

—বল্।

—রাজপুরীতে তোর অবাধ গতি বলেছিলি না?

—হ্যাঁ।

—তুই সেখানে যা। গিয়ে রাজমাতাকে সব খুলে বল্।

—তিনি আমাকে মরতে বলবেন।

—মরবি। তোর মরণে ভয় নেই। একটু একটু করে না মরে একেবারে মরণ ভাল। একথা বলতে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। তবু তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি বলে বলতে পারলাম। তোর সম্মান অটুট থাকবে। লোকের মুখে মুখে তোর নাম ঘুরে বেড়াবে। সুনাম? অর্থেও তো সুনাম মেলে না। তাছাড়া তুই অনেক বার আমাকে বলেছিস, তোর মৃত্যু আর পাঁচজনের মত স্বাভাবিক হবে না। তোর মৃত্যু হবে সাড়া-জাগানো অস্বাভাবিক মৃত্যু। এও সেইরকম হবে।

কাঞ্চনমালা বলে—তাই যাব। তুই ঠিক বলেছিস।

—তবে একথা বলতে পারি যে তুই কোন পাপ কাজ করিসনি।

—এরপরেও বলছিস?

—হ্যাঁ। তুই মহারাজকে প্রথম থেকেই নিজের মন সঁপে দিয়ে বসেছিলি। এমনকি আমিও একটু একটু অনুমান করতাম। মহারাজের কথা বলার সময় তোর চোখমুখ কেমন হয়ে উঠত। তুই নিজে দেখতে পেতিস না। আমি তো দেখতাম। তাই তুই কোন পাপ করিসনি। তুই শুধু রাজমাতার কাকুতিতে আন্তরিক ভাবে মহারাজের মঙ্গল চেয়েছিলি। কিন্তু তাই কি হয়? তবু তোর এমন দশা হত না। কয়জন কুমারী ভালবাসার পাত্রকে নিজের করে পায়? কিন্তু রাজমাতা যখন বললেন, তোর সম্বন্ধে মহারাজের কী ধারণা তখনই নদীর পাড়ে ভাঙন ধরল।

কীভাবে রাজপুরীতে যাবে ভেবে পায় না কাঞ্চনমালা। সেখানে গিয়ে রাজমাতা অম্বিকাকে কীভাবেই বা তার পাপের কাহিনী বলবে? এদিকে কনকধ্বজ পর পর সাতরাত্রি নৃত্যের আসরের ব্যবস্থা করে কাঞ্চনমালা কে অগ্রিম অর্থ দিতে চেয়েছিল। অর্থের পরিমাপ যথেষ্ট। তবু অসুস্থতার অছিলায় এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে। সে জানত মনের এই অবস্থায় নটী হওয়া যায় না। নৃত্যের সঙ্গে হৃদয়ের কত নিবিড় সম্পর্ক, ওরা কেউ বোঝে না। নৃত্যকে বাঙময় করে তুলতে কত সাধনা, কত আবেগের প্রয়োজন, ওরা জানে না। এখন সেটা সম্ভব নয়।

দুদিন প্রস্তুত হল রাজপুরীতে যাবে বলে। পারল না। তার নিজের হাতে গড়া প্রতিমার দিকে চাইলেও সেইমুখ ধীরে ধীরে চন্দ্রকেতু হয়ে ওঠে। যে কয়েকজন দেখেছে এই মূর্তি তার মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু রাজমাতা প্রথম দর্শনে একটু চমকে উঠেছিলেন একটু বিষণ্ণ হয়েছিলেন যেন। প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু উচ্ছ্বাস দেখাননি। একবার দেখে, সঙ্গে সঙ্গে আর একবার দেখলেন। তারপর এই নিয়ে আর কোন কথা বললেন না।

আজ সেই সদাহাস্য মুখের দিকে চেয়ে করজোড়ে কাঞ্চনমালা অস্ফুট স্বরে বলে—আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন ভীত না হই। রাজপুরীতে গিয়ে অকপটে সব কিছু বলতে পারি।

সেইদিনই অপ্রত্যাশিতভাবে রাজমাতার আমন্ত্রণ পায় সে। বিস্ময়ের সীমা থাকে না। প্রতিমার সামনে লুটিয়ে পড়ে সে বলে—তুমিই আমার সম্বল। আমার সব দোষ তুমি ক্ষমার চোখে দেখ। অপার করুণার প্রতিমূর্তি তুমি, আমার আশ্রয়স্থল।

রাজধানীর সবাই নটী কাঞ্চনমালাকে চেনে। তাই রাজপুরীর প্রধান দ্বাররক্ষকের দ্বিধার কোন কারণ ছিল না। তাকে দেখে সিংহদ্বারের একপাশে সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দেয়। কয়েক পা অগ্রসর হতে রাজমাতার পরিচারিকা দ্রুত এগিয়ে এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। রাজমাতা যেদিন তার কুটিরে পদধূলি দিয়েছিলেন, সেদিন এই স্ত্রীলোকই বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনবার্তা জানিয়েছিল।

রাজমাতা বসেছিলেন একটি অপ্রশস্ত পালঙ্কের ওপর। কাঞ্চনমালা জানে, এটা রাজমাতার শয়নকক্ষ নয়। এই পালঙ্ক শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয় না। এখানে বসে তিনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন।

কাঞ্চনমালা প্রবেশ করতে তিনি তাকে তাঁর পাশে গিয়ে বসতে বলেন। কাঞ্চনমালা সবিনয়ে অস্বীকার করলে ভ্রূকুঞ্চিত করে রাজমাতা প্রশ্ন করেন—কেন?

—আমি পাপিষ্ঠা।

—তাই নাকি? কে নয়? এই ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে কাদা না মেখে উপায় আছে? তারই মধ্যে যে নিজেকে সংযত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় সে প্রকৃত মানুষ। কারণ তার মন বলিষ্ঠ। নিজেকে পাপের কাছে বিকিয়ে দেয় না।

—আপনি জানেন না মা আমার পাপ কতখানি গুরুতর।

—তোমার পাপ রয়েছে জেনেও তোমাকে পাশে বসতে বলছি। এসে বসো। তারপর পাপের কাহিনী শুনব।

কাঞ্চনমালা অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর পাশে বসলে রাজমাতা বলেন—এবারে বল, তোমার কলঙ্কের কাহিনী।

—আমি মহারাজের হাতে রাখি বেঁধেছি অথচ—

—তার কাছে নিজের মন বিকিয়ে দিয়ে বসে আছো, এই তো?

—আপনি জানেন!

—জানি বলেই তো সেই রাতে তোমার কুটিরে ছুটে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, আমার পুত্র তেমার নৃত্য দেখে মুগ্ধ হলেও সেই মুগ্ধতার সীমারেখা থাকে। আমি বুঝতে পেরেছিলাম পরস্পরের দৃষ্টিবিনিময়ের মধ্যে দুজনে অনেক কিছু দিয়ে ফেলেছ। আমার পুত্র একটা রাজ্যের অধীশ্বর। একান্তভাবে কোন কিছু আঁকড়ে ধরে রাখার অবকাশ তার নেই। কিন্তু তুমি নারী। আর নারীর ওইটুকু তো সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাই তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিলাম। জানতাম পাব। কারণ তুমি মহারাজের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চাইবে না। আমি সবই জানতাম। আরও বেশি করে জানলাম তোমার নিজের হাতে গড়া তোমার উপাস্য দেবতার মুখ দেখে। সেটির সঙ্গে আমার পুত্রের মুখের আশ্চর্য সাদৃশ্য। আমি সেইদিনই বুঝেছিলাম চন্দ্রকেতু তোমাকে যেদিন দেখেছিল তুমি তাকে তার বহু আগে থেকে দেখে এসেছ এবং ধীরে ধীরে তোমার হৃদয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছ।

—মা।

—তুমি এসে ভালই করেছ। তোমাকে ডেকেছি, আরও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন তোমাকে হতে হবে বলে। রানী আসছে সুদূর অবন্তী থেকে। আমার দৃঢ় ধারণা কন্যার পিতা আপত্তি করবেন না। কন্যা রূপসী ঠিকই, কিন্তু তার মন তো তোমার মত হবে না।

—কেন হবে না? মহারাজকে তিনি পছন্দ করবেন না?

—প্রথমত ভাষার অসুবিধার জন্য চন্দ্রকেতু তাকে নিবিড়ভাবে নাও পেতে পারে। তাছাড়া রাজপরিবারের মেয়েরা অনেক সময় নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিতে শেখে না। তারা অনেক কিছু পেতে চায়, দিতে চায় না কিছুই। নিজে মহারানী হওয়ার জন্য তার নিশ্চয় আগ্রহ থাকবে। কিন্তু মহারাজের মন জয় করার চেষ্টা করবে বলে মনে হয় না। চন্দ্রকেতু মনের দিক থেকে বুভুক্ষুই থেকে যাবে। আমি জানি তোমার রূপ ওর রূপের কাছে ম্লান দেখাবে। কারণ ওর মা গান্ধার দেশের কন্যা যাদের দেহের সৌষ্ঠব অন্য দেশের অতি বড় রূপসীরও ঈর্ষায় কারণ হয়। তেমনি তাদের চোখ মুখ নাসিকা গ্রীবা ওষ্ঠ চিবুক আর রঙে কোন খুঁত নেই। কিন্তু ওদের অনেকের মন ওই দেশের মাটির মত ঊষর হয়। কন্যার মায়ের মনও তেমনি। তাই আমার আশঙ্কা কন্যাও তেমন হতে পারে।

—জেনে শুনেও—

—হ্যাঁ, আমি চাই এই বংশের রাজপুত্রেরা আরও সুন্দর আরও বলিষ্ঠ দেখতে হোক। যদিও জানি অদৃষ্টকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হয়ত ওর কপালে হবে সরু অস্থি-বিশিষ্ট কোন নারী।

—তা হবে কেন? ওঁর জন্যে কন্যার অভাব? মনের মত না হলে নেবেন না। কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে কী চান?

—যদি রানী সত্যই মমতাহীন হয়, চন্দ্রকেতু আঘাতে পেয়ে তোমার কাছে সান্ত্বনা পেতে ছুটে যেতে পারে। তখন তোমাকে কাঠোর হতে হবে। তখন অভিনয় করতে হবে তোমাকে। ওর সঙ্গে নিজের সহোদরার মত আচরণ করবে। ওর কাতর চাহনি দেখে ভেঙে পড়লে চলবে না। তুমি তো ওর মঙ্গল চাও।

কাঞ্চনমালা বহুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। তারপরে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে—আমি আপনার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।

কথাটা বলেই সে কেঁদে ওঠে।

রাজমাতা অম্বিকা তার পিঠে হাত রাখেন।

মন্দার একদিন সকাল থেকেই অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। মাহুত শিতিকণ্ঠও তাকে শান্ত করতে পারে না। তার ভয় হয় হস্তীটি উন্মাদ হয়ে না যায়। মন্দারের পিতাও বৃদ্ধ বয়সে উন্মাদ হয়ে যায় এবং সেই অবস্থাতে তার মৃত্যু হয়। মন্দার তো বলতে গেলে কৈশোর অতিক্রম করেছে মাত্র। তার সঙ্গিনী রয়েছে তিনজন। এসব হওয়ার কারণ নেই। শিতিকণ্ঠ তাকে শান্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেও বিফল হয়। তখন সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে মহারাজকে সংবাদটি দেয়।

প্রিয় হস্তীর কথা শুনে চন্দ্রকেতু সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। শিতিকণ্ঠ তাঁকে মন্দারের কাছে যেতে নিষেধ করে। তিনি মাহুতের সতর্কবাণী শুনে একটু থমকে দাঁড়ান। মন্দারের চোখের দিকে তাকান। মন্দারের চাহনির মধ্যে একটা আকুতি ফুঠে উঠতে দেখেন। তিনি দৃঢ় পদে তার দিকে এগিয়ে যান। শিতিকণ্ঠ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—যাবেন না প্রভু।

চন্দ্রকেতু শুনলেন না তার কথা। সোজা গিয়ে মন্দারের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে তার শুঁড়ে হাত দিয়ে বলেন—বেড়াতে যাবি?

মন্দার শুঁড় উঁচু করে ডেকে ওঠে। সেই বৃংহণ শুনে রাজপুরীর অনেকে ছুটে আসে। তারা মন্দারের অস্বাভাবিকতার কথা শুনেছিল। কিন্তু এই বৃংহণ ধ্বনি শুনে শিতিকণ্ঠ দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। খুব স্বাভাবিক ডাক। সে অবাক হয়। ভাবে, মহারাজা কি ইন্দ্রজাল জানেন? বংশপরম্পরায় তারা মাহুত। তবু মন্দার তার শত চেষ্টাতেও শান্ত হল না। অথচ মহারাজের হস্তস্পর্শেই সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। রাজা কি বশীকরণ বিদ্যাও জানেন?

সেই সময় মহারাজের দেহরক্ষী অচঞ্চল ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হয়। সে শুনেছে মন্দার উন্মাদ হয়ে গিয়েছে, আর মহারাজ তাকে শান্ত করতে গিয়েছেন। শুনে, ভাবে এতক্ষণ অঘটন কিছু ঘটে গিয়েছে। সে মনে মনে স্থির করে আসে, তেমন কিছু ঘটলে সে আত্মহত্যা করবে। এসে সব কিছু দেখে তার মুখে হাসি ফোটে। কারণ মন্দার মহারাজের হাত থেকে খাদ্য গ্রহণ করছে।

মহারাজ চন্দ্রকেতু অচঞ্চলকে কাছে যেতে বলেন। সে গিয়ে দাঁড়ালে তিনি বলেন—চিত্রককে ডেকে আন। আজ মধ্যাহ্নের পরে মন্দারকে নিয়ে ঘুরতে যাব। চিত্রকও আমার সঙ্গে যাবে।

—তাহলে আমি কালিনীকে নিয়ে আপনাকে অনুসরণ করব।

কথাটা বোধহয় অদূরে দণ্ডায়মান হস্তিনী কালিনীর কানে যায়। তার শুঁড় একটু বেশিরকম দুলে ওঠে। সে বোধহয় বুঝতে পারে তার সম্বন্ধে কোন আলোচনা হচ্ছে।

চন্দ্রকেতু একটু ভেবে বলেন—ঠিক আছে। সঙ্গে তোমার মনের মত আর কাউকে নিতে পার।

অচঞ্চল সাহসে ভর করে বলে—বল্লভকে নেব?

—বল্লভ? শিল্পী বল্লভ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—সে তোমাকে চেনে?

—আমার পরম সৌভাগ্য উনি আমাকে পছন্দ করেন।

—কিন্তু ওকি যেতে চাইবে? মাটি রঙ তুলি, হাতির দাঁত—এইসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ওর জগত স্বতন্ত্র।

—আমি ওঁকে একদিন বলেছিলাম, আপনার বয়স এত অল্প বলে এইভাবে একটানা পরিশ্রম করতে পারছেন। এটা কিন্তু ঠিক নয়। মাঝে মাঝে একটু ঘুরে আসতে পারেন। নইলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাবে। উনি শুনে হেসে বলেছিলেন, ইচ্ছে করে না। যদি হাতি পেতাম, ঘুরতে পারতাম।

চন্দ্রকেতু বলেন—তাই নাকি? ওকে তোমার সঙ্গে নাও তবে। আর কাউকে নয়। আমি

মন্দারের আনন্দের জন্য ঘুরতে যাচ্ছি। ওর অবস্থাও বোধহয় শিল্পী বল্লভের মত। নড়াচড়া না করে অথর্ব হয়ে যাওয়ার ভয়ে বোধহয় অমন অস্থির হয়ে উঠেছিল।

অচঞ্চল বিদায় নেয়। ততক্ষণে মন্দার সবটুকু খাদ্য শেষ করেছে। শিতিকণ্ঠ তার গাত্রমর্দন করতে শুরু করে দিয়েছে। মহারাজ তাকে যথাযথ নির্দেশ দিয়ে কালিনীকে প্রস্তুত রাখতে বলে চলে গেলেন।

মধ্যাহ্নের অনেক অগেই চিত্রক প্রাসাদে এসে উপস্থিত হয়। সে চন্দ্রকেতুর সুহৃদ হলেও রাজার আজ্ঞা সে একজন সাধারণ প্রজার চেয়েও নিখুঁতভাবে পালন করার চেষ্টা করে। একটু পরে অচঞ্চল এসে তাকে দেখে বলে—মহারাজা কোনদিকে যাবেন কিছু বলেছেন?

—তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

—বল্লভও যাবেন আমাদের সঙ্গে।

—বল্লভ? কেমন করে? মন্দার কতজনকে নেবে?

—কালিনীও যাচ্ছে।

—তাই নাকি। তাহলে এখনি বল্লভের বাড়িতে কাউকে পাঠাও।

—কেন?

—তার কি কিছু মনে আছে? এতক্ষণে সে নানা গুল্মের পাতা নিয়ে বাটতে বসেছে, নতুন ধরনের রঙ তৈরির জন্য। কিংবা ফলক তৈরিতে ব্যস্ত।

চিত্রকের কথা শুনে সে ঘাবড়ে যায়। তাড়াতাড়ি প্রসাদের একজন কর্মচারীকে ডেকে বল্লভের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিতে বলে। চিত্রক কর্মচারীকে বলে— সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে প্রসাদ প্রাঙ্গণে হস্তী দুটিকে নিয়ে আসে তাদের মাহুতদ্বয়। কিছুক্ষণ পরে মহারাজা স্বয়ং এসে উপস্থিত হন। সুহৃদ চিত্রককে দেখে হৃষ্ট হন তিনি। অচঞ্চলকে প্রশ্ন করেন —শিল্পী কোথায়?

অচঞ্চল অপ্রস্তুত। ভেবে পায় না কী বলবে। চিত্রক কিছু বলতে চাইছিল। সেই সময় প্রাসাদের কর্মচারীটির সঙ্গে হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত হয় বল্লভ।

মহারাজা রসিকতা করে বলেন—তোমার বোধহয় একটু দেরি হয়েছে, তাই না বল্লভ?

—অপরাধ নেবেন না মহারাজ। আমার বারবার মনে হচ্ছিল একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু কিছুতে মনে করতে পারাছিলাম না। শেষে প্রাসাদ থেকে উনি গিয়ে বলতেই ছুটে এসেছি। এমন হতো না মহারাজা। সকালে অর্জুন এসেছিল হাতিপোতা গ্রাম থেকে।

—স্বর্ণকার অর্জুন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ও একটা স্বর্ণসিংহাসন তৈরি করবে মৎস্য ব্যবসায়ী বৃহদ্রথের জন্য। সিংহাসনের আকৃতি কেমন হবে, তাই জানতে আমি তিনদিন পরে আসতে বলেছি।

—তাই ভুলে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি অনেক কিছু কর দেখছি।

—তা করি। পট তো রয়েছেই।

—তুমি তাহলে পটুয়াও। এখন কারও পট আঁকছ?

—হ্যাঁ, এবারে যে সাদা নাবিকেরা এসেছিল তাদের কর্তার। খুব তেজী চেহারা। আমার মন টেনেছিল।

—দেখিও তো?

—আপনি নেবেন?

—বিনিময়ে অর্থ নিতে হবে।

—আপনি নিলেই ধন্য হব। অর্থ নেওয়া অপরাধ। তবে একই পটে তার সঙ্গে একজন কৃষ্ণাঙ্গিনীকেও যে এঁকে ফেলেছি। যদিও সম্পূর্ণ হয়নি।

—কৃষ্ণাঙ্গিনী? তার অর্থ?

—এই নগরীর এক কন্যার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। নদীর তীরে দুজনকে আমি একান্তে বসে থাকতে দেখেছি।

চিত্রক আর অচঞ্চল দুজনাই সঙ্কুচিত হয়। বল্লভের লঘু গুরু জ্ঞান নেই দেখে চিত্রক মজা পায় সুহৃদয়ের কথা ভেবে। আর অচঞ্চল ভীত হয়, বল্লভের জন্য তিরস্কৃত না হতে হয়।

মহারাজ চিত্রককে প্রশ্ন করেন—কী বলছে বল্লভ?

চিত্রক তাড়াতাড়ি বলে—অমন হতেই পারে। কত দূরদেশ থেকে পরিবার-পরিজন ফেলে রেখে এদেশে এসেছে। আগেও অমন হয়েছে। তাদের বংশধরেরা অনেকে রয়েছে আর একটু সাগরের দিকে। দু-চারজন শ্বেতকায় ব্যক্তি এদেশে থেকেও গিয়েছিল বলে শুনেছি।

—ঠিক আছে। এ নিয়ে পরে কথা হবে। বল্লভ, তোমাকে মাঝে মাঝে হাতি পাঠিয়ে দেব। ঘুরতে যেও। তোমাকে অবাধ অনুমতি দেওয়া রইল।

—এ কি কথা—

—তোমার তো তাই সখ। যাও অচঞ্চলের সঙ্গে কালিনীতে গিয়ে বস।

মহারাজা চন্দ্রকেতু সুহৃদ চিত্রককে বলেন—কোন্ দিকে যেতে চাও?

—তুমি হলে মহারাজা। তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা।

—না, বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা সবচেয়ে আগে। তাছাড়া বলতে গেলে এই বন্ধুত্ব বংশপরম্পরায়। তোমার পিতাও আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা দক্ষিণের ভয়াবহ অরণ্যে আমার পিতাকে হিংস্র ব্যাঘ্রের কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তোমার পিতাকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই বন্ধুত্ব রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ।

চিত্রক গম্ভীর হয়ে বলে—কেন শুধু শুধু এই প্রসঙ্গ তোলো। সেদিন আমার পিতা প্রাণ না দিলে কি বন্ধুত্বের গভীরতা গাঢ় বলে প্রমাণিত হত না?

—না, চিত্রক। কখনই তা নয়। আমি জানি তুমিও আমার জন্য ওভাবে প্রাণ দিতে পার।

—তুমিও আমার জন্য। আমাকে রক্ষা করতে তুমি রাজত্বের মোহে পিছিয়ে যাবে নাকি?

হেসে চন্দ্রকেতু বলেন—সেটা অবশ্য ঠিক। চল তবে দক্ষিণের দিকেই যাই। ফিরতে রাত হয়ে যাবে হয়ত।

গ্রাম্য পথ। কোথাও কদলীবৃক্ষের সারি, কোথাও আম্রকানন। প্রতি বৃক্ষই প্রায় মুকুল শোভিত। কোথাও মুকুলে কুশি বের হয়েছে। কোকিল ডাকছে মিষ্ট স্বরে। তাদের কুহুরব গৃহে বসে সবাই শুনতে পায়। কিন্তু পথ চলতি সেই স্বর আরও মধুর শোনায়।

মন্দার যেন বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। ছুটে চলেছে। পেছনে কালিনী তার কাণ্ড দেখে কৌতূহলান্বিত। সেও প্রাণপণ চেষ্টা করছে মন্দারের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলতে। একবার মন্দারকে ধমক দিল বলে মনে হল। তাকে কদলীবৃক্ষের গা ঘেঁষে নিয়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ নেই। স্বজাতীয় অন্য কেউ হলে যে কোন গাছ সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলত। মন্দার অবশ্য সেই শ্রেণীর নয়। কালিনীও নয়। তাদের আত্মসম্ভ্রম বোধ রয়েছে। মন্দার ভালভাবেই জানে যে সে মহারাজের আদরের বাহন। কালিনী জানে সেও মহারাজের প্রিয়। তবে মন্দারের পর্যায়ের নয়। তাই মাঝে মাঝে এদিক ওদিকে চেয়ে দেখার প্রবণতা রয়েছে।

সামনের ঝোপ ঝাড়ের পরে কাঁঠাল গাছের সারি। গাছগুলোর সর্বাঙ্গে কুশি বের হয়েছে। আড়াই তিন মাসের মধ্যে এগুলি বড় হয়ে পেকে যাবে। তখন এই পথ পাকা কাঁঠালের সুঘ্রাণে ম-ম করবে। আমও পাকবে আগে পরে। বাদুড় আসবে, শেয়াল আসবে, আরও কত পাখি কত জীব আসবে।

চন্দ্রকেতু বলেন—এত ফল হয়, কোন কাজে লাগে না।

—কেন? লোকে পেট ভরে খায়।

—তা খায়। কিন্তু বেশি খেয়ে লাভ কী? তার চেয়ে এর বিনিময়ে কিছু বাণিজ্য করার উপায় থাকলে কত ভাল হত। এ-জিনিস বেশিদিন রাখা যায় না। রাখা গেলে সমুদ্রপথে বিদেশে পাঠানো যেত। বরং নারকেল বেশি উৎপাদন করলে হয়ত ভাল হত। এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। চিত্রাক্ষ বরং বলতে পারবে।

—শুনেছি উত্তরদিকের আম্রফল অনেক সুস্বাদু।

—হ্যাঁ। আমাদের ফল অনেক নিকৃষ্ট। ভাবছি ওদেশ থেকে চারাগাছ আনা যেতে পারে।

চিত্রক হেসে বলে—উজ্জয়িনীর সম্বন্ধ কাজে লাগলে সুবিধা হয়ে যাবে। যাওয়া-আসা বাড়বে।

চন্দ্রকেতু একথার উত্তর দেন না।

চিত্রক একটু উস্‌কে দিয়ে বলে—ভাবছি আমিও ওদেশের কন্যাকে ঘরে আনব।

—সামলাতে পারবে না।

—কেন?

—বলা যায় না। মাথায় তোমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তাছাড়া ওদের বেশির ভাগ মেয়ের রঙ নাকি কাঁচা সোনার মত। আমাদের মেয়েরা তো অমন নয়। তাই প্রথম থেকেই একটা দম্ভ থাকবে। আমাদের মেয়েদের মত বাধ্যও হবে না, কোমলও হবে না।

—তাহলে তুমি যক্ষকে পাঠালে কেন উজ্জয়িনীতে?

—আমি তো পাঠাইনি, মা পাঠিয়েছেন। আমায় মত ছিল না। তবে আমি যথেষ্ট দীর্ঘদেহী। আমার পিতার মতই। যে মেয়েই আসুক, উচ্চতায় আমাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। তুমিও খর্বকায় কখনই নও। তোমার উচ্চতাও সাধারণের চেয়ে যথেষ্ট বেশি। যাকগে, ওসব নিয়ে চিন্তা করার অর্থ সময়ের অপচয়। তবে তুমি যদি সত্যিই ওদেশের রূপসীকে ঘরে আনতে চাও তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

—আগে তোমার অবস্থা দেখে নিই।

চন্দ্রকেতু হাসেন। এত হালকা চালে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়ে ওঠে না তাঁর। এই ধরনের কথোপকথনের মধ্যে একটা আনন্দ রয়েছে। তিনি জানেন, সম্মুখে উপবিষ্ট শিতিকণ্ঠ তাঁদের নিম্নস্বরের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে না। তাছাড়া কানেও একটু খাটো। তিনি জানেন, রাজপুরীর রাজা থেকে তাঁর পরিবারের প্রতিজনের সম্বন্ধে তীব্র কৌতূহল থাকে বাইরের মানুষের। প্রতিটি ব্যক্তির আচার আচরণ কথাবার্তার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে তাদের। তাই যথেষ্ট সাবধানে সংযত আচরণ করে চলতে হয়, যা কখনই স্বাভাবিক নয়। সুহৃদের সঙ্গেও প্রাণখুলে রঙ্গরসিকতা করা যায় না।

মন্দারের পিঠে বসে চলতে চলতে একসময় মহারাজের মনে হয় অশ্ব কত দ্রুত। তার গতিবেগ, তার ছন্দ সব কিছু আরোহীর আয়ত্তে থাকে। অশ্বপৃষ্ঠের গড়নও যেন আরোহীর বসার জন্য। বসলেই একটা আপন আপন ভাব। মন্দারের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশে তিনি তাকে ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু এবারে অশ্বকেও প্রাধান্য দিতে হবে। একদল অশ্বারোহী সৈন্য গড়ার ইচ্ছা তাঁর বহুদিনের। অচঞ্চল, চিত্রক এবং আরও কয়েকজন মাত্র তাঁর মত অশ্বারোহণে পারদর্শী। এবারে অশ্বব্যবসায়ীরা এলে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওরা অশ্ববিক্রয়ের অর্থ দিয়ে এখান থেকে নানা সামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে যায়। খাদ্যদ্রব্যও নিয়ে যায়। মূলা তাদের খুব প্রিয়। গঙ্গারিদিতে প্রচুর পরিমাণে মূলার উৎপাদন হয়। তবে বছরের বিশেষ একসময় না এলে পাওয়া যায় না। অশ্ববিক্রেতা এবারে জেনে গিয়েছে কোন সময় মূলা পাওয়া যায়। পরের বছর তাই আসবে।

মহারাজা চিত্রককে বলেন—তোমাকে একটা অশ্ব দিয়ে দেব। তোমার কাছে রেখো।

—হঠাৎ।

—নইলে রাজপুরীর অশ্বশালা থেকে নিয়ে আর কত চড়বে?

—আমার আপত্তি নেই। ভালই হবে। কত আর রাজার অশ্বশালা থেকে ধার করা যায়।

—বলবে তো?

—সব কিছু মুখে বলা যায় না।

—জানি।

একসময় চন্দ্রকেতু পেছনে ফিরে দেখেন কালিনীর ওপরে উপবিষ্ট বল্লভ তন্ময় দৃষ্টিতে দুই পাশের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে চলেছে। মনে হচ্ছে, তার বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি শিতিকণ্ঠকে থামতে বলেন। তাই দেখে কালিনীর মাহুতও থেমে যায়। চিত্রক তাকে এগিয়ে আসতে বলে।

সে পাশাপাশি এলে মহারাজ বল্লভকে জিজ্ঞাসা করেন।—কেমন লাগছে বল্লভ?

—অসাধারণ মহারাজ। তুলনা হয় না।

—কিসের?

—এই সব দৃশ্যের।

—কেন নতুন কিছু দেখছ নাকি?

—সবই তো নতুন। গাছপালা, মানুষ পশু—সব।

—তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পৃথিবীর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছ। নিজের দেশে যেন এসব দেখনি।

বল্লভ গুরুত্ব সহকারে বলে—হ্যাঁ মহারাজ সত্যিই তাই। কিন্তু পৃথিবীর প্রান্ত কোথায়? তারপরে কি মানুষ এগোলে গভীর শূন্যে পড়ে যায়? সেই শূন্যের কি শেষ নেই?

মহারাজা চন্দ্রকেতু অপ্রস্তুত হন। একথা সত্যই তিনি ভাবেননি। বলেন—তেমন কথা তো কখনো শুনিনি। নিশ্চয় তেমন প্রান্ত নেই। প্রান্তহীন এই পৃথিবী।

—তাই কি হয়?

—পণ্ডিতেরা যখন এবিষয়ে কিছু বলেননি তখন নিশ্চয় হয়। আমি না হয় জানার চেষ্টা করব। গুণবান বলতে পারে। তাকে চেনো?

—সে আমার প্রতিবেশী। আমার বন্ধু।

—তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখতো? সে বলতে পারবে।

—হ্যাঁ মহারাজ, পুঁথি তার প্রাণ।

মন্দার আবার এগিয়ে চলে। কালিনী তাকে অনুসরণ করে। চন্দ্রকেতু অন্যমনস্ক হয়ে যান। বল্লভের প্রশ্ন তাঁর মনে ঝড় তুলেছে।

চিত্রক মহারাজের ভাবান্তর লক্ষ্য করে। সে বলে—বল্লভ উদ্ভট সব প্রশ্ন করে। মূর্তি গড়ে আর মূর্তির ছাঁচ তৈরি করে ওর মাথাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

—তুমি ওর প্রশ্নের উত্তর জান?

—ওটা একটা প্রশ্ন নাকি? ওই নিয়ে কেউ ভাবে?

—ভাবে বৈকি। শুধু পৃথিবী কেন, পৃথিবীর বাইরের গ্রহ নক্ষত্রের কথাও ভাবে। চিন্তার গভীরতা থাকলেই ভাবে। আর্যভট্টের নাম শুনেছ?

—শুনেছিলাম। বরাহমিহিরও নাকি ওই ধরনের চিন্তা করেন।

—হ্যাঁ করেন। চিন্তাশক্তি যাঁদের বেশি তাঁরাই চিন্তা করেন। শিল্পী আর পণ্ডিতেরা সাধারণের চেয়ে বেশি চিন্তা করেন। বল্লভও সেই শ্রেণীর।

কথাটা চিত্রকের মনঃপূত হল না। তবু সে প্রতিবাদ করল না। সুহৃদ হলেও কথায় কথায় মহারাজের সঙ্গে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়া শোভনীয় নয়।

সেদিন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করতে রাত হয়েছিল। মহারাজা বল্লভকে বলেছিলেন—ইচ্ছা হলেই সে কালিনীকে নিয়ে যেতে পারে। বল্লভ সম্মত হয়েছিল। যদিও সে জানে তার ইচ্ছা আর কাজের মধ্যে অনেক পার্থক্য। তবে মহারাজের আচরণে সে খুব তৃপ্তি পেয়েছিল।

গ্রীষ্ম গেল বর্ষা গেল শরৎ ও একসময় চলে গেল। রাজমাতার উৎকণ্ঠা তিতিক্ষার প্রান্তসীমায় এসে উপস্থিত হয়। বৃদ্ধ যক্ষের জন্য তিনি চিন্তান্বিত হয়ে ওঠেন। বিদেশে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো? কিংবা তার চেয়েও সাংঘাতিক কিছু।

ভুল হয়েছে তাঁর। অল্পবয়সী কাউকে পাঠালে ভাল হত। কিন্তু এখন সেকথা ভেবে লাভ নেই। তিনি মন্ত্রী শল্যের সঙ্গে পরামর্শ করেন। শল্য বলে, আর কিছু দিন অপেক্ষা করা শ্রেয়। মনে মনে ভাবে যদি যক্ষের সঙ্গে কয়েকজন অশ্বারোহী থাকত তাহলে দ্রুত এসে সংবাদ দিতে পারত।

এ দেশে অশ্বের সংখ্যা অপ্রচুর। মহারাজের অশ্বশালা আর কনকধ্বজের অশ্বশালায় কিছু রয়েছে। মহারাজা দূরে কোথাও যেতে হলে অশ্ব ব্যবহার করেন। শোনা যাচ্ছে, তিনি নাকি অশ্বরোহী সেনাদল গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। চিত্রকের কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। উত্তরে এবং অন্যান্য দেশে অশ্বই প্রধান বাহন। বিশেষ করে শ্বেতকায় বণিকেরা গঙ্গারিদিতে অশ্বের স্বল্পতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। তাদের দেশে অশ্বের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেই ব্যবস্থাও রয়েছে। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে ওরা এদেশে আসার পূর্বে হস্তী কখনো দেখেনি। ওদেশে হস্তী নেই। যুদ্ধযাত্রায় এবং দৈনন্দিন জীবনে অশ্বের গুরুত্ব অপরিসীম। তারা হস্তীর বিশাল আকার দেখে মুগ্ধ হয় বটে কিন্তু তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মানুষের প্রয়োজনের জন্য সবচেয়ে ক্ষিপ্রগতির জীব হল অশ্ব।

কিছুদিন পরে একজন সংবাদবাহক ছুটতে ছুটতে এসে রাজপুরীর প্রধান রক্ষক সুহস্তকে বলে—আমাদের বজরা ফিরে আসছে।

—তোমাদের বজরা আবার কোন্‌টা?

—যে বজরায় দূত যক্ষ মহারাজের রানী আনতে অবন্তী দেশে গিয়েছিলেন।

সুহস্ত উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—কোথায়? কোথায় দেখলে?

—এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে একটা ঘাটে বাঁধা হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের সর্বত্র সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ে। লোকটিকে রাজমাতার সামনে উপস্থিত করা হয়। সে বলে—শুধু আমাদের বজরা নয়, সঙ্গে আরও একটা বজরা এসেছে। শুধু বজরা নয়, আমাদের সৈন্য নিয়ে যতগুলো নৌকো গিয়েছিল, আরও ততগুলো নৌকো নিয়ে ওদের সৈন্য এসেছে। কী সব চেহারা।

রাজমাতা একটু ধাক্কা খান মনে মনে। তবে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কন্যা এসেছে সঙ্গে যে তাঁর পুত্রবধূ হবে। নইলে অত সৈন্য অত জলযান আসবে কেন?

—আর কী দেখলে?

—ভেবেছিলাম আমাদের মহারানীকে একটু দেখব। কিন্তু বৃদ্ধ যক্ষ কড়া গলায় বললেন—এই মুহূর্তে গিয়ে রাজমাতাকে সংবাদ দাও। তাই ছুটে এসেছি।

রাজমাতা দাসী বিমলাকে বললেন—শল্যকে বলে লোকটিকে পুরস্কৃত করতে। কারণ তাঁর দুশ্চিন্তার অবসান হল আজ। নিশ্চয় রাজধানীর ঘাটে এসে বজরা ভিড়বে আগামী-কালের মধ্যে।

মহারাজা চন্দ্রকেতু কিংবা রাজমাতা অম্বিকা তো নদীর ঘাটে এসে ভাবী মহারাণীকে অভ্যর্থনা জানাতে পারেন না। তাঁরা প্রাসাদে অপেক্ষায় রইলেন। যক্ষ ইতিমধ্যে তার সঙ্গে উজ্জয়িনীতে যাওয়া একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে রাজপুরীতে পাঠিয়েছে। তার কাছ থেকে মহারাজা এবং রাজমাতা জেনেছেন যে ভাবী মহারানী দেবযানীর সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমার শতানীক এসেছেন। তিনি কিছুদিন এখানে থাকবেন। আর এসেছে দেবযানীর পরিচর্যার জন্য দুজন পরিচারিকা। যে সৈন্যদল এসেছে তারা কুমার শতানীকের সঙ্গে ফিরে যাবে। উজ্জয়িনী থেকে সোজা জলপথে আসার কোন ব্যবস্থা নেই। সেখানে এই ধরনের বজরাও

নির্মিত হয় না। তাঁরা বারাণসীতে পৌঁছোলে শতানীক বলেছিল একটিমাত্র বজরায় যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বারাণসী থেকে একটি বজরা আর অন্য জলযানও ক্রয় করা হল। সেই সঙ্গে মাঝি আর দাঁড়ী। বারাণসী পর্যন্ত তারা এসেছে অশ্ব আর স্থলযানে। যক্ষ অশ্বের গুণের উচ্চ প্রশংসা করে। কুমার শতানীক বারাণসীতে ফিরে গেলে সেখানে জলযানগুলো বিক্রয় করে দেওয়া হবে। সেখানে তাদের অশ্ব অপেক্ষা করবে।

উজ্জয়িনীর কন্যা ও কুমারকে সমাদরে প্রাসাদে নিয়ে আসার জন্য হস্তী সজ্জিত করা হয়েছিল। সেই হস্তীদল এবং কয়েকটি শিবিকা নিয়ে সৈনাপতি ধনুর্ধব এবং মহারাজের সুহৃদ চিত্রক মন্ত্রী শল্যকে নিয়ে নদীর তীরে উপস্থিত হয়। সেনাপতি ধনুর্ধর সঙ্গে নিয়ে আসা সৈনদলকে স্থানটি ঘিরে রাখতে বলে। কারণ ইতিমধ্যে নদীর ঘাটে যথেষ্ট জনসমাগম হয়েছে। তারা দেখতে এসেছে তাদের ভাবী মহারানীকে। কিন্তু চিত্রকের নির্দেশে বাহকেরা দুটি শিবিকা নিয়ে অত্যন্ত সাবধানে বজরায় উঠে গেল। প্রজাদের উজ্জ্বল মুখে অন্ধকার নেমে এল। তারা বুঝল, মহারানীর দর্শন মিলবে না। ভেবেছিল, বজরা থেকে ঘাটে নামার সময় ক্ষণিকের জন্য দর্শনের সৌভাগ্য হবে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে তারা।

সেই সময় সবার আগে অত্যন্ত সপ্রতিভ ভঙ্গিতে পাশের বজরা থেকে এক সুবেশ তরুণ ঘাটের মাটিতে পা ফেলে। সবাই দেখেছিল যক্ষ তাকে মানা করেছিল। কিন্তু সেই মানা সে মানল না। প্রজারা কেউ বুঝল না যুবকটি কে। তবে ধনুর্ধর শল্য এবং চিত্রক সঠিক অনুমান করল। তরুণটি ভাবীরানীর সহোদর শতানীক। তার হাবভাব খুব সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখল না ওরা তিনজন। ভাবভঙ্গিতে একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তবু মনকে তারা প্রবোধ দিল যে প্রথম দর্শনে মানুষের প্রকৃত পরিচয় সব সময় বোধগম্য হয় না। সময় লাগে। তবে তার পরেই বজরা থেকে আর একজন অবতরণ করল, যে তার সমবয়সী। তার আচরণ শতানীকের মত নয়। সে অনেক ধীর-স্থির। তার দুই চোখে নতুন মানুষ দেখায় অপার বিস্ময়। সে সবার চোখের সামনে শতানীকের পাশে এসে দাঁড়াল। অথচ কারও দৃষ্টিতে পড়ল না। সে শতানীকের সখা অপ্রতিম।

শতানীক ভগিনীর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু শিবিকার বাহকের তখনো বজরায়। তারা কোন নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। শতানীক চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চলে। যারা ওখানে ভিড় করেছিল তারা সবাই পুরুষ। তাদের মধ্যে দু'চারজন ব্যতীত কেউই দীর্ঘদেহী নয়। বরং খর্বাকৃতি বলা যেতে পারে অন্তত শতানীকের তুলনায়। ঝড়ে জলে তাদের বাদামী রঙ প্রায় কৃষ্ণবর্ণ। শতানীক তাদের তুলনায় তো গৌরবর্ণের। ভগিনীর ভাবী রাজ্যের মানুষদের দেখে তার নয়নে যত না ঘৃণা প্রকাশ পায়, তার চেয়ে তাকে দেখে অনেক বেশি প্রশংসা ফুটে ওঠে ভিড় করা মানুষদের দৃষ্টিতে। তাদের মন নেচে ওঠে ভাবী রানীর রূপ-লাবণ্যের কল্পনায়।

চিত্রক এগিয়ে এসে ভাঙা ভাঙা সংস্কৃত ভাষায় শতানীকে আহ্বান জানায় হস্তীতে আরোহণ করার জন্য। শতানীক প্রথকে বুঝতে পারে না। চিত্রক ভাবে ভাষাবিদ গুণবানকে সঙ্গে করে নিয়ে আসার কথা তাদের কারও মনে হয়নি। সে তখন আরও একটু গুছিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে। এবার শতানীক বোঝে। সে প্রশ্ন করে—হাতি কেন? অশ্ব নেই?

চিত্রক লক্ষ্য করে নবাগতের উচ্চারণ ভঙ্গি একটু অন্য ধরনের। সেই ভঙ্গি অনুকরণ করে সে বলে—এখানে এটাই রীতি। রাজপ্রাসাদ বেশি দূরে নয়। শতানীকের সঙ্গে তার সখা অপ্রতিম তখন এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে দুটি শিবিকা বজরা থেকে অতি সাবধানে নামানো হয়। সবাই বোঝে ভাবী রানী এবং তাঁর পরিচারিকাবৃন্দকে বহন করবে শিবিকা দুটি। কিন্তু ও কে? ছিপ্‌ছিপে এক ষোড়শী পায়ে হেঁটে শিবিকার পেছনে পেছনে অবতরণ করল? ওড়নার অবগুণ্ঠন পেছনের দিকে সরিয়ে দিয়েছে। তার সুন্দর মুখশ্রী সবাইকে আকৃষ্ট করে। একি তবে সমমর্যাদার কেউ নয়? ওরা উৎসুক হয়ে থাকে। সবাই যখন প্রাসাদের দিকে যাত্রা শুরু করে সে তখন একটা হস্তীতে সোৎসাহে উঠে পড়ে। এমন নারী তারা জন্মে দেখেনি। অথচ তার মধ্যে এতটুকু ঔদ্ধত্য নেই, রয়েছে অসীম ঔৎসুক্য।

প্রজারা বুঝতে পারে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করলে মহারাজের অসুবিধা হবে। নতুন আত্মীয়দের রাজকীয়ভাবে আপ্যায়ন করা বিধেয়। তারা সবাই দলবেঁধে গেলে সেই আপ্যায়ন বিঘ্নিত হবে।

পথের দুই পাশের কুটিরগুলো শতানীককে কিছুমাত্র আকৃষ্ট করতে না পারলেও তার বন্ধু অপ্রতিম মুগ্ধ হয়। সে বন্ধুর দৃষ্টিতে উপেক্ষার ভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারে, উজ্জয়িনীর তুলনায় এই রাজ্যের রাজধানী বৈচিত্র্যহীন বলে তার এই প্রতিক্রিয়া। কুটিরগুলোর গঠন-শৈলী তার চোখে পড়ে না, যা মনোমুগ্ধকর। তাদের গায়ে কত সুন্দর সব আলিম্পন। প্রায় সব কুটিরই মাটির। কিছু কিছু কুটির ছেঁচা বাঁশের কিছু কাষ্ঠনির্মিত। উজ্জয়িনীতে অনেক কাষ্ঠনির্মিত বাড়ি রয়েছে।

সেই হস্তীপৃষ্ঠের ষোড়শীর নয়নের দৃষ্টিতে কিন্তু ফুটে উঠেছে অপার বিস্ময়। সব কিছুই তার কাছে অভাবনীয় এবং মনোমুগ্ধকর। বিশেষ করে কুটির শ্রেণীর মাটির প্রাচীরের গায়ে নানা বর্ণের চিত্রের মধ্যে অধিবাসীদের শিল্পীমন যে বিকশিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু রাজপুরীর সামনে এসে শুধু অপ্রতিম নয় শতানীকও বিস্মিত হয়। প্রাসাদটি কাষ্ঠনির্মিত এবং তার গঠনশৈলীতে জাত-শিল্পীর স্পর্শ। এত উচ্চশ্রেণীর প্রাসাদ উজ্জয়িনীতে নেই। শতানীক এতক্ষণে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খায়।

অপ্রতিম তাকে জানান্তিকে প্রশ্ন করে—কেমন দেখছ?

—কোথা থেকে আনল বাস্তুকারকে?

—আনতে হয়নি। এরাই। কুটিরগুলো দেখে বুঝতে পারলে না?

—দেখতে তো একেবারে—

অপ্রতিম নিজের মাথা তর্জনী দিয়ে ঠুকে দেখিয়ে বলে—দেখতে-টেখতে নয়, মানুষের পরিচয় এইখানে।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শতানীক বলে—হুঁঃ। মানুষের প্রকৃত পরিচয় রণাঙ্গণে। এরা পিঁপড়ের মত নিহত হবে।

অপ্রতিম বলে—জানি না। তবু তোমার কথা সত্য হলেও মনের এই উন্নত দিক একটা জাতিকে গর্বিত করে।

—তুমি অল্পেতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠো। জাহ্নবীর সঙ্গে তোমার মিল রয়েছে। ও এত

বেশি নির্লজ্জ যে অবগুণ্ঠন খুলে হস্তীপৃষ্ঠে চলে এল। তুমি এত ভিড়ের মধ্যে একজনও রমণীকে দেখলে?

—এত তো আর এক প্রমাণ। এদের সমাজ দৃঢ়বদ্ধ।

জাহ্নবীর সঙ্গে অপ্রতিমের পরিচয় নেই। তবে তাকে অনেক দেখেছে শতানীকের বাড়িতে। দেবযানীর সখী সে। এসেছে তার পরিচারিকা সেজে। শতানীকের মুখে তার কথা বহু শুনেছে। শুধু বন্ধুর মুখে নয় নগরীর আরও কয়েকজনের মুখে। শুনে বুঝেছে মেয়েটি সাধারণ পর্যায়ে পড়ে না। একটা আকর্ষণও অনুভব করে। অন্তত তার সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলার আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু উপায় নেই। সেও গঙ্গারিদিতে আসছে শুনে মনে মনে উৎসাহিত হয়েছিল। এমন কি কল্পনাও করে ফেলেছিল এখানে সুযোগ মিলতেও মিলতে পারে কথা বলার। সে জানে না তার ইচ্ছা পূর্ণ হবে কি না।

রাজপুরীতে তাদের সংবর্ধনার জন্য মন্ত্রী শূন্য অপেক্ষা করছিল। সে তাঁদের নিয়ে গেল মহারাজা চন্দ্রকেতু যে কক্ষে অপেক্ষা করছিলেন সেখানে। আর শিবিকা দুটি আরোহিণীদের নিয়ে আরও ভেতরে চলে গেল। সেখানে কয়েকজন পরিচারিকা সযত্নে দেবযানীকে নামিয়ে নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচারিকাদের সঙ্গে করে নিয়ে চলল রাজমাতা অম্বিকার নিকট।

এদিকে জাহ্নবী হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে শিবিকাদ্বয়কে অনুসরণ করে দেবযানীর দলের সঙ্গে মিশে গেল। শিবিকার ফাঁক দিয়ে এ পর্যন্ত যা দেবযানী দেখেছেন তাতে তাঁর মুখও ভ্রাতার মুখের মত বিকৃত হয়ে উঠেছিল। প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ভাবছিলেন যে তাঁর পিতা স্বেচ্ছায় নিজের দুহিতাকে স্বহস্তে বিসর্জন দিয়েছেন। তবে প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর তাঁর এই হতাশ ভাব অনেকাংশ অন্তর্হিত হয়। তাঁরা উজ্জয়িনীর রাজপুরীতে থাকতেন না। নিকটে তাঁদের নিজেদের বাসগৃহ রয়েছে। এই প্রাসাদের তুলনায় সেটিকে কুটির বলে মনে হয়। কিন্তু এসবই তো বাহ্যিক। প্রকৃত মানুষটি দেখতে কেমন? তিনিও কি নদীর পাড়ের মানুষগুলোর মত খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণের? অবশ্য উজ্জয়িনীর রাজবংশেও খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণবর্ণের মানুষ অমিল নয়। তবে সংখ্যায় তারা নগণ্য। এখানকার অধিবাসীদের দেখলে বোঝা যায় অধিকাংশই তেমন। সুতরাং মহারাজার রূপ কল্পনা করে নিতে অসুবিধা হয় না।

রাজমাতা অম্বিকা সাদরে দেবযানীর চিবুক ধরে মুখটি তুলে তাঁকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করেন। তাঁর ব্যবহারে দেবযানী আকৃষ্ট হন। বুঝতে পারেন অম্বিকা দেবী স্নেহময়ী এবং তাঁকে দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট। তাঁদের মধ্যে কথোপকথন স্বচ্ছন্দ গতিতে না হতে পারলেও জাহ্নবী এবং স্থানীয় একজন পরিচারিকার কল্যাণে খুব অসুবিধা হল না। উভয় পক্ষই বুঝলেন যে এই বাধা কাটিয়ে উঠতে বেশিদিন সময় লাগবে না।

জাহ্নবী রাজমাতার আচরণে মুগ্ধ হয়। বুঝতে পারে তিনি যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অথচ মমতাময়ী। শুধু ভাবী পুত্রবধূর সঙ্গে নয়, তাদের সঙ্গেও সমান ব্যবহার করছেন।

সে তার মনের দ্বিধা কাটিয়ে অতি বিনীতভাবে বলে—মহারানী আপনার রাজ্যে উন্নত মনের মানুষ বাস করে।

দেবযানী একটু বক্রদৃষ্টিতে তাকায় জাহ্নবীর দিকে। কারণ দেবযানীর সখী হলেও সে এখানে এসেছে তার পরিচারিকা রূপে। কথা আছে পৃথা নামে যাকে আনা হয়েছে সে ছাড়াও এখানে থেকেও দু একজন দাসী দিয়ে দেওয়া হবে। পৃথা জানে না যে জাহ্নবী দেবযানীর বান্ধবী।

অম্বিকা দেবী মৃদু হেসে বলেন—আমি মহারানী নই বৎসে। আমি রাজমাতা। তুমি যাঁর সঙ্গে এসেছ তিনিই হবেন এখানকার মহারানী। তিনিই তোমাদের কর্ত্রী।

জাহ্নবী নীরব হয়ে যায়। ভাবল, বিনা কারণে কথাটা বলে ফেলা অনুচিত হয়েছে। প্রশ্নের উত্তরও মিলবে না হয়ে। কিন্তু তার অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করে রাজমাতা বলেন—তুমি জেনে কিংবা না জেনে সঠিক কথা বলেছ। এরা উন্নত মনের। তবে তোমাদের দেশ সম্বন্ধে যতটা জেনেছি তাতে মনে হয় তোমাদের রাজ্যের মত এই দেশের পরাক্রম নেই। প্রয়োজন হয়নি বলেই হয়ত নেই। বহিরাক্রমণের আশঙ্কা এদের নেই। স্মরণকালের মধ্যে তেমন কিছু ঘটেছে বলে কেউ জানে না। অভাবিতভাবে কখনো তেমন হলে বীরত্ব এবং ব্যক্তিগত শক্তি থাকলেও পরাজিত হতে বেশি সময় লাগবে না এদের। অখণ্ড শান্তি রয়েছে বলেই এদের মন সূক্ষ্ম সৃষ্টির দিকে ঝুঁকেছে। তুমি যদি সেটা পর্যবেক্ষণ করে কথাটা বলে থাক, তাহলে বুঝব তুমি সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে নও।

জাহ্নবী বিহ্বল হয়। এমন সুন্দর উত্তর সে কল্পনাও করেনি। তার মস্তক শ্রদ্ধাবনত হয়। সঙ্কোচ কাটিয়ে সে রাজমাতার পদধূলি গ্রহণ করে।

দেবযানী আবার জাহ্নবীর দিকে চায়। জাহ্নবী ভারসাম্য রাখতে তাড়াতাড়ি দেবযানীর কাছেও নত হয়। তার পরিচিতি এই গঙ্গারিদিতে পরিচারিকা রূপে। রাজধানী গঙ্গের যেটুকু গড় দিয়ে বেষ্টিত তার নাম চন্দ্রকেতুগড়। বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের জন্ম গ্রহণের পর এই নাম রাখা হয়েছিল। এখনো গড়ের কিছু অংশ বাকি রয়েছে। গড়ের বাইরেও রাজধানীর সীমানা বিস্তৃত। তবে গড়ের ভেতরে খুব সাজানো গোছানো এবং পরিষ্কৃত। এখানে পথ সুপ্রশস্ত। পথের পাশে সমদূরত্বে মাঝে মাঝে আবর্জনা ফেলার স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে। এখানে পোড়ামাটির চওড়া পয়ঃপ্রণালী পথের পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে বিদ্যাধরী নদী পর্যন্ত জলনিকাশের জন্য। প্রবল বর্ষণেও গড়ের ভেতরে কোথাও জল সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এই সুব্যবস্থা জাহ্নবী বা অপ্রতিম কারও দৃষ্টিতে পড়েনি প্রথম দিনের কয়েক মুহূর্তের অভিজ্ঞতায়।

ওদিকে শতানীকের আর এক অভিজ্ঞতা। সে লক্ষ্য করে সুদৃশ্য একটি আসনে উপবিষ্ট এক তরুণ তাকে দেখে সাগ্রহে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করেন। সে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করে তরুণটির উচ্চতা তার সমান তো বটেই বরং সামান্য একটু বেশি হবে। গায়ের রঙ তাঁর মত গৌরবর্ণের না হলেও কৃষ্ণবর্ণ কখনই নয়।

চন্দ্রকেতু বলেন—আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের দেশে। এই দেশ অবন্তীর মত পরাক্রমশালী বা ঐশ্বর্যশালী না হলেও আপনাদের যাতে কোনরকম অসুবিধা না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে। অতিথিকে আমরা যত্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

সন্তুষ্ট হয়ে শতানীক অদূরে একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে বলে—আমি অতিথি সন্দেহ

নেই, কিন্তু আমার ভগিনী অতিথি হয়ে এতদূরে আসেনি। তাকেও কি প্রাণ দিয়ে যত্ন করা হবে চিরকাল?

একটু হেসে চন্দ্রকেতু বলেন—তিনি আমাদেরই একজন হতে এসেছেন। অতিথি সৎকারের কিছু ভার হয়ত তাঁকেও বহন করতে হবে। তবে আপাতত নয়। আর মহারানীর মর্যাদা যিনি পাবেন, তাঁর যত্নের প্রশ্ন ওঠে না।

—নিশ্চিন্ত হলাম। আমাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে। মৃগয়ার আয়োজন করা যাবে কি?

—কোন অসুবিধা নেই। এই নগরীর পরে দক্ষিণে কিছুদূর এগিয়ে গেলে গভীর বনাঞ্চলের প্রান্তে পৌঁছে যাওয়া যায়। সেই অরণ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

—সমুদ্র এত নিকটে?

—প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে লক্ষ্য করবেন প্রবল বেগে বায়ু বইছে। সেই বায়ু সমুদ্রের বায়ু। আপনি এখানে যতদিন থাকবেন তার মধ্যে কোন বিদেশী পোত এখানে এলে অনেক শ্বেতাঙ্গকে দেখতে পাবেন।

—তারাও আসে?

—হ্যাঁ তাদের সঙ্গে আমাদের বাণিজিক সম্পর্ক রয়েছে সুদূর অতীত কাল থেকে। আপনি সুরা পান করেন?

শতানীক একটু দ্বিধাভরে বলে—করি কালেভদ্রে।

—আপনি আজই সন্ধ্যায় ওদের দেশের সুরার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। এখন আপনি গিয়ে স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন।

মহারাজের আদেশে একজন এসে শতানীককে সসম্ভ্রমে নিয়ে গেল।

বাইরে তার সখা অপ্রতিম অপেক্ষা করছিল। প্রশ্ন করে—কেমন দেখলে?

—মন্দ নয়। বেশ ভালই।

—সেইজন্য তোমাকে বলি, ভাল করে না দেখে, না বুঝে কোন সিদ্ধান্তে এসো না।

—বিদেশে এসে অন্তত আমাকে বুদ্ধিবৃদ্ধির পরামর্শ দিও না।

অপ্রতিম মৃদু হেসে এগিয়ে যায়।

আগামী পূর্ণিমায় বিবাহের দিন ধার্য হয়েছে। বযীয়ান দূত যক্ষ, যাকে উজ্জয়িনীতে প্রেরণ করা হয়েছিল সে জ্যোতির্বিদ বরাহের নিকট বুদ্ধি করে বিবাহের জন্য কিছু শুভ দিন ও ক্ষণ জানতে চেয়েছিল। তিনি একটা তালিকা করে দিয়েছিলেন। তখনই আগামী পাঁচ মাসের শুভদিনের নির্ঘণ্ট তৈরি করে এনেছিল। কবে উজ্জয়িনী থেকে ফিরবে সঠিক জানা ছিল না তখন। অবশ্য তার মাথায় এটা ছিল না। এর মূলে বলতে গেলে মহারাজা চন্দ্রকেতু স্বয়ং। তিনিই মিহির এবং তাঁর স্ত্রী সম্বন্ধে কৌতূহলান্বিত ছিলেন। কৃষি বিষয় পরামর্শের জন্য। দেখা করতে গিয়ে তার মাথায় শুভদিনের তালিকা নেওয়ার কথা মনে হয়ে যায়। বৃদ্ধও খুশি হলেন। ফলে মিহিরের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুবিধা হয়ে গেল। কারণ ওখানে কিছু দিন থাকার পর সে জানতে পেরেছিল বৃদ্ধ বরাহ অত্যন্ত কোপন স্বভাবের। এমনকি

জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে কেউ যদি তাঁর সামনে তাঁর পুত্রেরও প্রশংসা করে তিনি জ্বলে ওঠেন। তাই তাঁর নিকটে শুভদিনের নির্ঘণ্ট চেয়ে নিয়ে দুঃখ করে বলেছিল—আপনার পুত্র যদি আপনার প্রতিভার সামান্য অংশও পেতেন তাহলে প্রভূত উপকার হত।

বৃদ্ধ বলে ওঠেন—ওকে নগণ্য ভাবেন নাকি? আপনি দূর দেশে থাকেন বলে ওর খ্যাতি আপনার কর্ণগোচর হয়নি।

যক্ষ খুঁচিয়ে দিয়ে বলে—মানুষের গুণ কখনো চাপা থাকে না। আপনার গুণ কি চাপা রয়েছে? ঠিক আমাদের দেশে পৌঁছে গিয়েছে। সেই তুলনায় আপনার পুত্র নিশ্চয় গুণহীন।

—না। তারও যথেষ্ট গুণ রয়েছে। আমার মত না হলেও অন্য যে কোন জ্যোতিষাচার্যের তুলনায় অনেক বেশি গুণবান। আপনি তার জীবনের ইতিহাস জানেন না। জানলে চমকিত হতেন।

—তাহলে তাঁর সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারলে ভাল হত। সন্দেহেরও অবসান হত।

বৃদ্ধ সেই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে করে দেন। যক্ষ মিহিরের সঙ্গে দুচারটে কথা বলে বুঝতে পারে কতবড় ব্যক্তি তিনি। সবিনয়ে তখন মহারাজ চন্দ্রকেতুর অনুরোধটি তাঁকে জানান।

—খনার মতামত চান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মিহির আঙিনার একটি কুটিরে প্রবেশ করেন। কুটিরটি এক কোণে অবস্থিত। সেখান থেকে কিছুক্ষণ পরে বের হয়ে তাঁর কাছে এসে বলেন—আপনার দেশের মাটি আর আবহাওয়া সম্বন্ধে তাঁর জানা নেই। তাই মোটামুটিভাবে তিনি বললেন আপনারা শুধু দেখবেন কলাগাছের গোড়ায় যেন কখনো জল জমতে না দেওয়া হয়। আর কলাগাছ কিংবা তার আশেপাশের গাছে কোন সন্দেহজনক কীট দেখতে পেলে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা হয় যেন। এর বেশি তিনি বলতে পারছেন না। তবে ভাদ্রমাসে কখনো কলাগাছ রোপণ করবেন না একথা বারবার বলে দিলেন। এর বেশি তিনি বলতে পারছেন না বলে দুঃখিত।

—না না তাতে কী হল? এতেই মহারাজা আনন্দিত হবেন। আপনাদের পক্ষে তো তাঁর রাজ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব হলে আজই মহারাজের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যেতাম। আমি নিশ্চিত মহারাজা তাঁর রাজ্যে আপনার মত ব্যক্তিকে পেলে সসম্মানে রাখবেন।

—আপনার এই সৌজন্যের কথা আমরা উভয়ে মনে রাখব। তবে একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই। কথাটা বলা হয়ত অনুচিত। তবু আপনাদের মহারাজের মনে মনে প্রস্তুতির জন্য তাঁকে বিবাহের পাঁচদিন পরে বলবেন, আমার নাম করেই বলবেন, তিনি যেন তাঁর এই রানীর নিকট থেকে বেশিকিছু প্রত্যাশা না করেন। তাঁকে তাঁর রূপের গর্ব নিয়ে ভুলে থাকতে দিতে বলবেন। নইলে সংঘর্ষ বাধবে। তাতে তিনি প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাবেন। এমনিতেই পাবেন। অভাবনীয় কিছু না ঘটলে এর থেকে তাঁর পরিত্রাণ নেই। কোষ্ঠী বিচারে তেমন দেখা যায়। আরও কিছু বলতে পারতাম কিন্তু বলব না। তাহলে আপনাদের এত আনন্দ এত উৎসাহ বিনষ্ট হবে। এর মধ্যে একটি মাত্র আশার আলো দেখা যায়, সেটি হল রানী যদি সন্তানবতী হন তাহলে একটা পরিবর্তন হতে পারে। তবু খুব কঠিন। কোন দেবদেবীর আশীর্বাদ বর্ষিত হলে যদি হয়।

বৃদ্ধ যক্ষের চিত্ত হতাশায় ভরে ওঠে। কিন্তু যা সত্য তাকে সহ্য করতে হয়, মেনে নিতে হয়। রাজমাতা রূপসী পুত্রবধূ চান। এই কন্যার রূপের তুলনা নেই। এখন এই সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া যায় না। সে স্থির করে বিবাহের ঠিক পাঁচদিন পরে মহারাজের কাছে অবশ্যই মিহিরের বার্তা পৌঁছে দেবে। তার তবু দুঃখ হয় এই ভেবে যে তরুণ মহারাজা হয়ত স্বপ্ন দেখেন নতুন ভার্যা এসে তাঁর জীবন অপরিমেয় ভালবাসায় রঙিন করে তুলবেন।

বিবাহের পূর্বে গড়বেষ্টিত নগরী যথাযোগ্য সজ্জিত করা হল। সংবাদ শুনে বনাঞ্চলের শবরেরা দলে দলে কণামাত্র পরিধেয় কটিতে জড়িয়ে অনাবৃত সবল দেহ নিয়ে ভিড় করল রাজধানীতে। অন্যান্য প্রজারাও এল। তাদের পরিধেয় আর একটু উন্নত। তবু শতানীক সব কিছু দেখে একটা মন্তব্য করতে যাছিল।

অপ্রতিম বলে ওঠে—উঁহুঁ, এত তাড়াতাড়ি নয়। ভেবো না আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ এদের চেয়ে বেশি উন্নত।

—তারা এতটা নগ্ন নয়।

—এখানকার জলবায়ু তার প্রধান কারণ। একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি সখা এদের কারও খাদ্যাভাব নেই। দারিদ্র্য এদের পীড়ন করে না, যা আমাদের দেশে সব সময় দেখতে পাওয়া যায়। এরা প্রচুর ফল এবং নদীর মৎস্য পায়। আমাদের অধিকাংশের তো মৎস্য অস্পৃশ্য। ফলও সহজলভ্য নয়।

শতানীক চুপ করে যায়। সে মনে মনে ভালভাবে জানে, দেশে তার প্রতিপত্তির তুলনায় অপ্রতিম নগণ্য। কারণ অপ্রতিম অতি সাধারণ গৃহের সন্তান। কিন্তু সে যে অনেক বেশি বুদ্ধিমান এবং অনেক জ্ঞানবান একথা মনে মনে জানে। অপ্রতিম তাকে সত্যই ভালবাসে এবং সর্বদা তার হিত কামনা করে। ফলে বন্ধুর ওপর তার একটা আকর্ষণ রয়েছে। সে না থাকলে তার অভাব খুবই অনুভব করে শতানীক।

রাজমাতা অম্বিকা অনেক কৌশলে এই কদিন দেবযানীকে মহারাজের দৃষ্টির আড়ালে রেখেছিলেন। ফলে দেবযানীরও তাঁর ভাবী স্বামীকে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। সুযোগ হল ঠিক শুভদৃষ্টি বিনিময়ের সময়ে। উভয়েই উভয়কে দেখে চমৎকৃত। তাঁদের দৃষ্টির মধ্যে যা ফুটে উঠল তা দেখে রাজমাতা আনন্দে আত্মহারা। দেবযানী স্বপ্নেও ভাবেননি মহরাজা এতটা সুপুরুষ হবেন। শতানীক তাঁর সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু তাকে চন্দ্রকেতু সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়েছে। শতানীকও কখনো বলেনি এতটা সুপুরুষ এই মহারাজা। বোধহয় প্রয়োজনবোধ করেনি। চিরকাল নিজের কথাই সে বেশি ভাবে। চন্দ্রকেতুরও রূপ সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা যেন ছাপিয়ে গেল দেবযানীর সৌন্দর্য দর্শনের পরে। বিবাহ বাসরে কাঞ্চনমালার কথা একবারও মনে হল না। কাঞ্চনমালাকে রাজমাতা নিমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন বিবাহের সময় উপস্থিত থাকার জন্য। কিন্তু কাঞ্চনমালা তাঁকে বুঝিয়ে দিল যে এই সময়ে তার থাকা ঠিক হবে না। নানা প্রশ্ন উঠবে।

অম্বিকা তাকে বলেছিলেন—ভুলে যেও না কাঞ্চন রাজকীয় অনুষ্ঠানে নর্তকীরও একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তাছাড়া তুমি আমার রাজার কল্যাণ চাও।

—তবু মা। ভাই-এর মঙ্গলের কথা ভেবে আমি থাকতে চাই না। আমাকে ক্ষমা করবেন।

কাঞ্চনমালা আসেনি। তার অভাব রাজমাতা কিংবা মহারাজ কেউই অনুভব করেন না। অনুভব যে করবেন না, একথা কাঞ্চনমালা জানত। এই বয়সেই জীবন সম্বন্ধে তার অগাধ অভিজ্ঞতা হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতার কি পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় কখনো? বোধহয় না। নইলে নর্তকী কাঞ্চনমালাকে আমন্ত্রণ জানাতে স্বয়ং মন্ত্রী শল্য তাঁর দুয়ারে এসে দাঁড়াবেন কেন?

তাঁকে দেখে বিস্মিত হয় কাঞ্চনমালা। দ্রুত এগিয়ে এসে আনত হয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলে—আপনি?

—হ্যাঁ মা, আমাকেই আসতে হল। নইলে রাজমাতার আশঙ্কা তুমি হয়ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে।

—আমন্ত্রণ? কিসের আমন্ত্রণ?

—গতকাল বিবাহ বাসরে নৃত্যের আয়োজন নেই দেখে আমাদের মহারানীর ভ্রাতা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি বলেছেন, উজ্জয়িনীতে যে কোন রাজকীয় আনন্দ উৎসবে নৃত্য একটি প্রধান অঙ্গ। সে জন্য রাজনর্তকীও রয়েছে সেখানে। অথচ এ দেশের মহারাজের বিবাহে সেই ধরনের কোন আয়োজন নেই। এ যেন সাধারণ কারও বিবাহ। নিজের ভগিনীর এই অদৃষ্টের কথা ভেবে তিনি খুব ক্ষুণ্ণ।

কাঞ্চনমালা বলে—তাই বুঝি মহারাজা আপনাকে পাঠালেন?

—না মা। তিনি কিছু বলেননি। তিনি প্রথমে নীরব থাকলেও, চাপে পড়ে একটু রাগান্বিত হয়েই বলেন, সব দেশের রীতিনীতি একরকম হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রাজমাতা অনেক চেষ্টায় মহারাজকে সম্মত করান দেশের সম্মান রক্ষার্থে।

কাঞ্চনমালার কিছুক্ষর চুপ করে থেকে বলে—কখন যেতে হবে?

—আজ সন্ধ্যার একটু আগে।

—আমি যাব।

নিশ্চিন্ত হয়ে শল্য বিদায় গ্রহণ করেন।

সেই দিনই নৃত্যের আসর বসে রাজপুরীর বহিরাঙ্গণের একটি বৃহৎ গৃহে, যাকে গঙ্গারিদির মানুষেরা জানে রাজসভা গৃহ বলে। রাজধানী গঙ্গের প্রাণকেন্দ্র, যেটুকু বাস্তুকার কৃতবিদ্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গড় বেষ্টিত হয়ে উঠছে, যাকে বর্তমান মহারাজের পিতা পুত্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

চন্দ্রকেতুগড়ে কাঞ্চনমালা একমাত্র নর্তকী নয়। আরও ছয়-সাত জন রয়েছে। তবে কাঞ্চনমালার তুলনায় তারা বলতে গেলে প্রায় সাধারণ পর্যায়ের। সাধারণ রসিক জনদের মনোরঞ্জনে তারা যথেষ্ট হলেও উচ্চতর রুচি এবং সূক্ষ্মতাসম্পন্ন মানুষের আশা পূরণে তারা ব্যর্থ। বাণিজ্যের কল্যাণে দেশে ধনীব্যক্তির অভাব নেই। তাই নর্তকীরা সবাই খেয়ে-পরে থাকতে পারে।

কিন্তু কাঞ্চনমালা সাড়া দেয় শুধু চিত্রাক্ষ বা কনকধজের মত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণে। আরও দু-একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির আহ্বানে সে গিয়েছে। কিন্তু সেই সব স্থানে দু'একটি ক্ষেত্র ব্যতীত নৃত্য শেষে শিল্পী মনের অনাবিল আনন্দ নিয়ে গৃহে ফিরতে পারেনি। অন্তত তিনটি

ক্ষেত্রে নিজের দেহ অনাঘ্রাত রাখতে পারেনি। একমাত্র চিত্রাক্ষ আর কনকধ্বজ এবং সেই সঙ্গে সুবর্ণ ও বৃহদ্রথ নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে নর্তকীকেও শিল্পীর মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে না। কনকধ্বজ রূঢ় এবং ঈর্ষাপরায়ণ হলেও সে শিল্পীকে সম্মান দিতে জানে। তবু কি সে সব সময়ে অন্যের স্পর্শ থেকে রক্ষা পেয়েছে? ওরা তাকে মর্যাদা দিলেও নৃত্যের আসরে ওদের বন্ধুবান্ধবেরা সবাই সমান হয় না। প্রথমে তারা সংযত থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাদের লালসা জাগ্রত হয়! যারা বাণিজ্য করে তারা সবাই কেন সুরাসক্ত হয় কে জানে। এই সব আনন্দ আসরে সুরা পান অতিরিক্ত হয়ে যায়। ফলে শেষ পর্যন্ত বন্ধু-বান্ধবদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। ক্রোধে ঘৃণায় কাঞ্চনমালা ক্ষিপ্ত হয়। তারপর ভাবে, এই পথে নেমে এইটুকু লাঞ্ছনা সহ্য না করে উপায় নেই। রাজমাতা আম্বিকা দেবীরও একথা জানা রয়েছে। তবু তিনি তাকে সাদরে রাজপুরীতে আহ্বান জানিয়েছেন। ঘৃণা না করে স্পর্শ করেছেন, তাকে পাশে বসিয়েছেন। তার অক্ষম ক্রন্দনধ্বনি নিশ্চয় তিনি শুনতে পেয়েছেন।

কাঞ্চনমালা রাজপুরীতে যাবে। মহারাজা নিজে থেকে তাকে আমন্ত্রণ করতে চাননি বলেই আরও যাবে। রাজ্যের সম্মানহানির আশঙ্কা সত্ত্বেও তিনি তাকে আমন্ত্রণ জানাতে চাননি! যে পুরুষের কাছে তার এতখানি মূল্য তাকে ভাল না বেসে পারা যায়? তবু সেই ভালবাসাকে ভ্রাতৃপ্রেমে রূপান্তরিত করার অনুরোধ এসেছে রাজমাতার কাছ থেকে। অন্তরঙ্গভাবে সেটি সম্ভব না হলেও বহিরঙ্গে তেমন দেখাতে ক্ষতি কি? মহারাজার শ্যালকের সম্মুখে রাজ্যের মহিমা বর্ধন করতে হবে। বেশ তাই হবে। কিন্তু শ্যালকটি কোন্ শ্রেণীর? তিনি কি নৃত্যের শিল্পরূপ অনুভব এবং উপভোগ করতে পারেন? নাকি এটি তাঁর নিকট ধন ও প্রতিপত্তি প্রকাশের অঙ্গ? যাইহোক, বিদ্যাধরী আর গঙ্গাবিধৌত গঙ্গারিদির মর্যাদা আজ রাখতে হবে সেটাই সবচেয়ে বড় কথা।

প্রাসাদের তো বটেই, বাইরের বহু মানুষ মহারানীর রূপ একঝলক হলেও দেখেছে। যাতে তাঁর দর্শন পায় সেজন্য এই সভাগৃহে একটি সিংহাসনে বসেছিলেন রাজ্যের মহারানী। সবাই বিস্ময়-বিমুগ্ধ। এত রূপ একই মানবীর অঙ্গে থাকতে পারে? সবাই গর্বিত হয়ে ওঠে। ভাবে, রাজমাতার তুলনা নেই। এতবড় দেশ ভারতবর্ষ। এই দেশের সবচেয়ে রূপবতী কন্যাকে তিনি নির্বাচন করে এনেছেন। তারা ভাবে, অন্য রাজ্যের রাজন্যবর্গের ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠবেন না তো তাদের মহারাজা? হলেই বা কী? কে এই দেশ আক্রমণ করবে? তেমন কখনো ঘটেনি। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সঙ্গে সদ্ভাব রয়েছে বলে সবার ধারণা। এখন আবার প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সখ্য স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সাধারণ লোকে কোন খোঁজ না রাখলেও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা সবাই সব জানেন। তাঁদের মুখেই সবাই শোনে। না বুঝলে বুঝে নেয়। তাঁদের মুখে নগরবাসী শুনেছে আজ সন্ধ্যায় মহারাণীর ভ্রাতার ইচ্ছায় রাজসভা গৃহে নৃত্যের আয়োজন করা হয়েছে। কাঞ্চনমালা একা নাচবে। অনেকদিন সে নাচ বন্ধ রেখেছিল। রাজার প্রাসাদের নাচ তারা দেখতে পারবে না। তাছাড়া নাচ দেখার সখও তাদের নেই। তারা রামলীলা শোনে, পালাগান শোনে। রামের কাহিনীতে তাদের

প্রাণ টানে। শিবের গাজনও রয়েছে। ঠাকুর দেবতার কি আকাল হয়েছে? নাচ-গানও হয়। কাঞ্চনামালার মত অত সুন্দর নাচের পোশাক না থাকলেও তাদের নর্তক-নর্তকীরাও রঙচঙে সাজ করে। লতাগুল্মের রস, রাঙামাটি সাদামাটি দিয়ে এরাও নিজেদের সজ্জিত করে। কিভাবে সজ্জিত হলে দেখতে ভাল লাগবে সেজন্য উপদেশ নিতে তারা বল্লভের দুয়ারে গিয়েও উপস্থিত হয়। বল্লভের বয়স বেশি না হলে কী হবে, তার যথেষ্ট বুদ্ধি রয়েছে। দেখতে ভালমানুষ আর আপন-ভোলা হলে কি হবে ওর হাতের গড়া যক্ষ-যক্ষিনী, শিবঠাকুর বিষ্ণু মূর্তি কত দূর দেশে চলে যায়। ওর হাতে তৈরি মিথুনের ছাঁচে কত ফলক হয়। ঘরে ঘরে শোভা পায় সেই ফলক। খুব নাম। বণিকেরা জলপথে কিংবা স্থলপথে বাণিজ্যে গেলে ওই মিথুন সঙ্গে করে নিয়ে যায়। দাম্পত্য জীবনের মত বাণিজ্যেও ওর সুপ্রভাব রয়েছে। এছাড়াও বল্লভ আর ওর শিষ্যরা ডানাবিশিষ্ট পুরুষমূর্তি গড়ে। কিসের মূর্তি জিজ্ঞাসা করলে নাকি হাসে। শিষ্যরা ভক্তিভরে বলে গুরুর কল্পনার কি থই আছে? শিষ্যেরা বল্লভের বাড়িতে থাকে না। ডাকলে আসে, কিংবা প্রয়োজনে থাকে।

সেই বল্লভও আমান্ত্রিত হয়েছে আজকের নৃত্যের সান্ধ্য আসরে। স্বয়ং মহারাজ অচঞ্চলকে পাঠিয়ে ছিলেন তার কাছে। যেতেই হবে। তবু তার মধ্যে দ্বিধা ছিল। রাজপুরীতে সে যায় না বেশি। নিজের মত থাকতে ভালবাসে। হাতীতে চড়ার সখ প্রকাশ হয়ে পড়ায় বিপদ হয়েছে। সেই থেকে মহারাজ তার দিকে মনোনিবেশ করেছেন বলে তার ধারণা। অচঞ্চল অবশ্য বলে এটা তার ভুল ধারণা। মহারাজ তাকে ভালভাবে চেনেন বরাবর। এক হতে পারে এতদিন তিনি তাকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন। বল্লভ ভাবে ভুল না বুঝলেই ভাল হত। নৃত্যের আসর সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই। কাঞ্চনমালার পরিচয় তার জানা আছে। চাক্ষুষ সেভাবে না দেখলেও তার কুটির চেনে। আগে একটা কুলগাছ ছিল। এক একসময় মনেও হয়েছে তার নাচ দেখলে ভাল হত। সেই নাচের ভঙ্গি মাটি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারত। নিজের কল্পনার মাধ্যমে তার অঙ্গসজ্জা আবিষ্কার করে। কিন্তু এতো নিতান্ত তার মনের ইচ্ছা। দাওয়ায় বসে সে অমন অনেক কিছু ভাবে।

সেই সময় সে দেখে তার প্রতিবেশী গুণবান হোঁচট খেতে খেতে এদিকে আসছে। গুণবান সত্যই গুণবান। সে অনেক ভাষা জানে। রাজপুরীতে তার ডাক পড়ে মাঝে মধ্যে। বিশেষ করে কোন বিদেশী এলে কিংবা এই দেশেরই কোন দূর প্রান্তের মানুষ এলে। বল্লভ ভাবে নৃত্যের অনুষ্ঠানে যাওয়া বিষয়ে গুণবানের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে। প্রায় সমবয়সী বলে দুজনার মধ্যে বন্ধুত্বও প্রগাঢ়।

বল্লভ ডাকে—কোথায় চললে?

গুণবান থমকে দাঁড়িয়ে বলে—কোথাও না তো?

—এই তো চলছিলে।

—না, ভাবছিলাম।

—চলতে চলতে?

—তাই হবে। নইলে হাঁটছিলাম কেন? কী করি বল তো?

—কেন? কী হল?

—মহারাজা আজ সন্ধ্যায় নৃত্যের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছেন।

বল্লভ অকুল পাথারে যেন ডাঙার সন্ধান পেল। সে প্রায় আর্তস্বরে বলে ওঠে—আমাকেও তো। তোমার কাছে পরামর্শ নিতে যাব বলে ভাবছিলাম। আমি জানি, উনি ডাকতে লোক পাঠাবেন। কী যে করি।

গুণবান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বলে—তুমিও যখন আছ, আমি যাব। একা যেতে ভয় হচ্ছিল।

—ঠিক আছে। আমার পাশে বসবে কিন্তু।

মহারাজ চন্দ্রকেতু শতানীককে সঙ্গে নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পূর্বে শতানীকের মুখমণ্ডলে তাচ্ছিল্য মাখানো ছিল। কিন্তু মঞ্চসজ্জা দেখেই সে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভাবে তার দেশের কেউ এরকম মঞ্চসজ্জা কখনো করতে পারবে না।

সে মহারাজকে প্রশ্ন করে—কে এভাবে সাজিয়েছে?

মহারাজ গুরুত্ব না দিয়ে বলেন—বিশেষ কেউ নয়। এমনভাবে সাজানো হয়ে থাকে। বণিক চিত্রাক্ষের ভূমিকা এতে থাকলেও থাকতে পারে। আমি ঠিক জানি না। কেন, কোন ত্রুটি রয়েছে?

—না। আমি বিস্মিত হয়েছি।

—চিত্রাক্ষ প্রায়ই নৃত্যের আসরের আয়োজন করে।

—আপনার বিবাহের সময় তো এমন কিছু দেখলাম না।

চন্দ্রকেতু ভরাটকণ্ঠে বলেন—বেশি আড়ম্বর আমার রুচি বহির্ভূত। আপনার মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় তাই এই আসর।

—নর্তকীও কি মঞ্চের উপযুক্ত হবে?

—আপনি স্বচক্ষে দেখবেন।

বাদ্যযন্ত্র বেজে ওঠে। তার একটু পরেই সম্পূর্ণ পুষ্পসজ্জায় সজ্জিতা কাঞ্চনমালার প্রবেশ। তার মাথার মুকুট থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গে পুষ্পের অলঙ্কার। তার পায়ের নূপুর ঝঙ্কৃত হয়। তার হিন্দোলিত দেহলতার সঙ্গে সেই নূপুরও যেন গান গেয়ে ওঠে। সভাগৃহ স্তব্ধ। বল্লভ ভাবে এই অঙ্গসজ্জার কথা চিত্রাক্ষকে তো সে বলে দিয়েছিল। চিত্রাক্ষ তখন প্রকাশ করেনি যে কাঞ্চনমালার জন্য চেয়েছে। জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল যে কোন নর্তকীকে কীভাবে সাজালে ভাল লাগবে। একটি আলেখ্যও এঁকে দিয়েছিল। আগে জানলে আরও ভালভাবে বলে দিত। তবে কাঞ্চনমালা না সাজলেও চলে। কী সুন্দর লাগছে দেখতে। ও যেন ঠিক এক দেবদাসী যে ঈশ্বরের মন্দিরে নৃত্যরতা। ও নিশ্চয় সাধিকা। ভাষাবিদ্ গুণবান ভাবে এই নৃত্য তো সব ভাষার অতীত। সব ভাষার গূঢ় অর্থ যেন এই নৃত্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সব ভাষাভাষী এই নৃত্যের অর্থ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। বল্লভকে সে নিম্নকণ্ঠে বলে—কাঞ্চনমালাকে প্রণাম করা যায়। বল্লভ সঙ্গে সঙ্গে বলে—ঠিক বলেছ। আমিও তাই ভাবছিলাম।

কাঞ্চনমালা দর্শকবৃন্দকে অন্য জগতে নিয়ে যায়। মহারাজা স্তব্ধ। তাঁর হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে। অসামান্যা প্রতিভাময়ী এই তরুণী। এর তুলনা কোথাও কি মিলবে? মা বলেছেন, ও তাঁর ভগিনী। বেশ, তাই মেনে নেবেন। তবু তো এই গড়েই থাকবে। এর সুখদুঃখের ভাগী হতে হবে। অবশ্য সোজাসুজি ভাবে নয়। সেটা খুব দৃষ্টিকটু হবে। মায়ের কাছে শুনেছে, এর তন্ময়তা আর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে অনেকে এর দেহ কলুষিত করেছে। এবার থেকে হতে দেবেন না। প্রতিটি আসরে তিনি উপস্থিত থাকবেন। কাঞ্চনমালাকে সেকথা জানিয়ে দেবেন। তাতে সে নিশ্চিন্তে সব জায়গায় যেতে পারবে।

শতানীক ভাবে, একে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাওয়া যায় না? কাঞ্চনমালাকে স্ত্রীরূপে লাভের বাসনা প্রবল হয়ে ওঠে তার মধ্যে। এই অপরূপ সৌন্দর্য আর শিল্প নিয়ে অর্থের বিনিময়ে নৃত্য প্রদর্শন করা এর জন্য নয়। নর্তকী সম্বন্ধে তার আজন্মলালিত ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

এক সময় নৃত্য শেষ হয়। বিমুগ্ধ দর্শকবৃন্দ এতক্ষণে নিজেদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। তাদের মনও খারাপ হয়ে যায়। যেন সুরলোক থেকে আচম্বিতে মর্ত্যে পতন।

সেই রাত্রে শতানীক বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে। তার একমাত্র চিন্তা কীভাবে কাঞ্চনমালাকে উজ্জয়িনীতে নিয়ে যাওয়া যায়। দেবযানীকে বলতে পারে। কিন্তু ভগিনী যতই রূপসী হোক, আদৌ কৌশলী নয়। তার কূটবুদ্ধি নেই। হয়ত চেঁচামেচি করে উঠবে। তার মনে অবশ্য হিংসার বীজ বপন করে দিতে পারে। বলতে পারে, কাঞ্চনমালার প্রতি মহারাজ চন্দ্রকেতুর আসক্তি রয়েছে। কিন্তু এভাবে বলাও নিরাপদ নয়। ভগিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। শেষে সে স্থির করে জাহ্নবীর সাহায্য নিতে হবে। তার তুলনা নেই। সে শুধু বিদুষী নয়, বুদ্ধি তার ক্ষুরধার এই বয়সেই। তাকে সর্বজ্ঞ বলে মনে হয়। হাঁ, তাকেই বলতে হবে।

শতানীকের মধ্যে একটা পরিবর্তন মহারাজ চন্দ্রকেতুও বুঝতে পারেন। কিন্তু সহসা এই পরিবর্তনের হেতু খুঁজে পান না। কেমন যেন গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে ঠিকভাবে কথা বলে না। এমনকি মৃগয়ায় যাওয়ার কথা বললেও উৎসাহিত হয় না। মহারাজ ইতিমধ্যে বুঝেছেন যে শতানীক অমায়িক স্বভাবের কখনই নয়। তার মধ্যে একটা মিথ্যা দম্ভ রয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতি কখনও রূঢ় হওয়ার মত অসৌজন্য প্রকাশ করেনি। অথচ এর মধ্যে একদিন বিশ্রী আচরণ করে বসল বিনা কারণে। এই ধরনের ব্যবহার জন্ম থেকে পেতে অনভ্যস্ত চন্দ্রকেতু। মনে হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তাকে উজ্জয়িনীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন। কিন্তু শত হলেও মহারানীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সে। রানীর মর্যাদা হানিকর কিছু করা ঠিক হবে না ভেবে তিনি অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করেন। কিন্তু তাঁর ক্রোধ থেকে গেল।

সেই দিনই তিনি যক্ষকে ডেকে পাঠালেন। যক্ষ মহারানীর পিতার সঙ্গে কোন্ কোন্ প্রসঙ্গে কথা বলেছিল জানতে চান তিনি। সেই সঙ্গে জেনে নেবেন কতদিনের জন্য শতানীককে পাঠানো হয়েছে। মহারানীর সেবার জন্য যারা এসেছে, তারাই বা কতদিন থাকবে।

মহারাজের বার্তা পেয়ে বৃদ্ধ বুঝল, কোন রকম গণ্ডগোল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিহিরের

ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু বিবাহের পঞ্চম দিনে সে তো মিহিরের কথামত মহারাজকে আভাস দিয়েছিল। মিহিরের আশঙ্কা কি এত দ্রুত ফলতে শুরু করেছে?

রাজবাটীতে পৌঁছোনর সঙ্গে সঙ্গে প্রধান রক্ষী সুহস্ত তাকে মহারাজের উপবেশন কক্ষ দেখিয়ে দেয়। যক্ষ সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে নমস্কার করে।

—বসো যক্ষ। তোমাদের মহারানীর পিতার সঙ্গে তো তুমি সব বিষয়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ। আমি খোলাখুলিভাবে সব বিষয়ে আলোচনা করেছি। কোন কিছু তুচ্ছ মনে করে অবহেলা করিনি। কারণ তাঁরা সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশের অধিবাসী। তাঁদের সঙ্গে আমাদের অনেক বিষয়ে অমিল রয়েছে। খুঁটিনাটি সবকিছু মনে করে দিনের পর দিন জিজ্ঞাসা করেছি।

—আমিও সেকথা জানাতাম। আচ্ছা, তোমাদের রানীর পিতা তাঁর পুত্রকে কতদিনের জন্য ভগিনীর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন?

—ব্যক্তিগতভাবে তিনি পুত্রকে এখানে বেশিদিন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু এতদূরের পথ বলে পরে বলেছিলেন তাঁর কন্যা একটু অভ্যস্ত হলে পুত্র যেন ফিরে যান। তবে দেড় মাসের বেশি কখনো নয়। কারণ ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অধীনে কাজ করেন। বেশিদিন সেখানে অনুপস্থিত থাকা শোভনীয় নয় বলে ভেবেছিলেন। একমাস তো হতে চলল।

—আর রানীব দেখাশোনার জন্য যারা এসেছে?

—তাদের জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। এমনকি তারা যদি এদেশে বরাবরের জন্য থেকে যেতে চায় স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

—তাবা কি তবে চিরকুমারী থাকবে?

—থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে। এদেশের কারও সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। সেটা সম্পূর্ণরূপে তাদের অভিরুচি।

—সবাই যদি বানীর ভ্রাতার সঙ্গে চলে যেতে চায়?

—না। তাদের সঙ্গে ভালভাবে কথা বলা হয়েছে। এখন মত পরিবর্তন করলে গ্রাহ্য করা হবে না। তবে ভবিষ্যতে কেউ যদি ফিরে যেতে চায়, আপনি তাদের পাঠিয়ে দিতে পারেন।

চন্দ্রকেতু নিশ্চিন্ত হন। আর দিন দশেক পরে শতানীককে তিনি স্মরণ করিয়ে বলে দেবেন যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময় এসে গেল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিকে তিনি আর সহ্য করবেন না। যতই মহারানীর ভ্রাতা হোক এই ধরনের উগ্র স্বভাবের মানুষ যতশীঘ্র বিদায় নেয়-ততই মঙ্গল। মহারানীর মধ্যেও একই প্রতিচ্ছবি। মহারাজা মরুভূমির কথা শুনলেও, চোখে দেখেননি কখনো। সেখানকার শুষ্ক উত্তপ্ত পরিবেশে সজীবতার স্পর্শ মাত্র নেই। মহারানীকে দেখে মহারাজের তেমন মনে হয়। রূপের প্রতি তাঁরও মোহ রয়েছে, কিন্তু তবু রানীর অঙ্গ স্পর্শ করতে দ্বিধাবোধ করেছেন। মনে হয়েছে, ওই দেহে হৃদয় বলে বোধহয় কিছু নেই। শতানীক তাই আরও অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে থাকলে মহারানীকে আরও বিপথে

চালিত করতে পারে। যক্ষের মাধ্যমে মিহিরের যে গণনার কথা তিনি জেনেছিলেন, তাই সত্য হতে চলেছে।

ওদিকে শতানীক কিছুদিন ধরে ভগিনীর সঙ্গে নির্জনে কথা বলার সুযোগ খোঁজে। মহারাজা তাঁর মাকে বলেছেন, রানী দেবযানী যেন কোন সময়ে সম্পূর্ণ একা না থাকেন। ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়েও নয়। সব সময় কোন পরিচারিকা যেন তাঁর সঙ্গে থাকে। মায়ের নিকট এর কারণও ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। রাজমাতা অম্বিকা তাঁর নিজস্ব দাসী দ্বারা এই নির্দেশ জাহ্নবীর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। জাহ্নবীকে তিনি ইতিমধ্যেই পছন্দ করে ফেলেছেন। তিনি জানেন, তাকে কোন কিছু বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সে নিশ্চয় অপর পরিচারিকা পৃথাকে জানিয়ে দেবে।

শতানীক বারবার চেষ্টা করেও ভগিনীকে একান্তে না পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে ওঠে। একদিন বলেই ফেলে—তোমার সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথাও বলা যাবে না?

সে যখন ভগিনীকে একথা বলে, তখন জাহ্নবী ছিল সেখানে। দেবযানী কিছু বলার পূর্বেই সে শতানীককে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলে—কুমার, এই রাজ্যে এটা চিরকালের নিয়ম। সহসা সেই নিয়মের পরিবর্তন হলে অনেকের মধ্যে অসন্তুষ্টি দেখা দেবে। প্রজারা শুনলে আনন্দ পাবে না।

মুখ বিকৃত করে শতানীক বলে—যা সব প্রজা—

ভ্রাতার এই মন্তব্যে দেবযানী মনে মনে আনন্দিত হন। তাঁর নিজের মনের মধ্যেও কতকগুলো বিষয়ে দিন দিন অশান্তি দানা বেঁধে উঠছিল। তিনিও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে প্রাণখুলে দুদণ্ড কথা বলতে চান। কিন্তু পারেন না।

শতানীক তখন জাহ্নবীকে বলেন—তাহলে তুমি আমার সঙ্গে একদিন কথা বল। এখানে আমি ছাড়া আপনার জন কেউ নেই দেবযানীর।

—কেন কুমার? মহারাজা চন্দ্রকেতুই তো ওঁর সবচেয়ে আপন জন।

—ওসব কথা ছাড়। কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে?

—কোথায়?

—আমার কক্ষে।

—এ কি কথা বলছেন আপনি? আমার কলঙ্কের ভয় নেই? এই রকম কিছু করলে উজ্জয়িনীর দুর্নাম হবে।

—তবে কোথায় দেখা হতে পারে।

—কেন? এইখানে? ভগিনীর সঙ্গে আপনার কথা শেষ হওয়ার পরে উনি যখন ওঁর কক্ষে ফিরে যাবেন সেই সময়। এখানে তো অন্য কেউ থাকবে না।

শতানীক দেখল, প্রস্তাবটা তবু মন্দের ভাল। সে রাজি হয়। কিন্তু দেবযানী বলে ওঠেন—কী এমন কথা যে আমার সামনে বলা যাবে না?

—তোমার মঙ্গলের জন্য তোমার সামনে বলা যাবে না।

—বেশ, আমি যাচ্ছি। কথা শেষ হলে বলো।

তিনি ক্ষুণ্ণ হয়ে দ্রুতপদে নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন।

জাহ্নবীর চাহনিতে একটা অনিশ্চয়তার ছায়া। সে বুঝতে পারে না কী এমন কথা যা নিজেব ভগিনীর সামনে বলা যায় না? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে শতানীকের চোখের দিকে চায়।

—তুমি খুব বুদ্ধিমতী একথা আমি জানি জাহ্নবী। অপ্রতিম একথা আমাকে বলেছে। সে তোমার গুণমুগ্ধ।

জাহ্নবী মনে মনে ক্রোধান্বিত হয়। সে অপ্রতিমের মনোভাব অনেকদিন পূর্বে আঁচ করেছিল। কিন্তু তাকে কেন যেন পছন্দ হয় না তার। বিদ্যা বুদ্ধিতে শতানীকের চেয়ে অনেকগুণ ভাল হলেও তার চেহারার মধ্যে বড় বেশি কমনীয়তা। অমন পুরুষকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষ ভাবা যায় না। তাছাড়া সে সুদর্শন হলেও সব দিকে দৃষ্টি। কোন কিছু তার দৃষ্টি এড়ায় না। কি রকম যেন।

যথাসম্ভব বিনয়ের সঙ্গে জাহ্নবী বলে—আপনি আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ। তোমাকেই প্রথম বলছি কথাটা। কাঞ্চনমালার রূপ আর নৃত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ওকে আমি উজ্জয়িনীতে নিয়ে যেতে চাই।

স্তম্ভিত জাহ্নবী বলে ওঠে—সে কি কুমার। এ যে অসম্ভব।

—তুমি সাহায্য করলে অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

—আমি? কী ভাবে?

—সে মহারাজ চন্দ্রকেতুর রাজধানীতে বাস করে। অমন একজন নারীর প্রতি কি মহারাজেব কোন বকম দুর্বলতা না থেকে পারে? তার ওপব সে নর্তকী। তুমিই বল।

—ক্ষমা করবেন, আমি বলতে পারব না। তবে এই কদিনে এটুকু বুঝেছি যে তিনি অত্যন্ত সংযত এবং উন্নত শ্রেণীর পুরুষ। তাঁকে ভালবাসা যায় এবং পূজাও করা যায়। আপনার ভগিনী ভাগ্যবতী।

—তাই নাকি? এতদূর।

—হ্যাঁ কুমার।

—বেশ মানলাম। কিন্তু আমার ভগিনী নারী। তার মনে সন্দেহেব বীজ উপ্ত করা যায়।

—কী করে?

—তুমি বলবে যে সে যতই মহারানী হোক না কেন মহারাজার মন বাঁধা পড়ে রয়েছে ওই সুন্দরী নর্তকীর কাছে।

—কেন বলব?

—তাহলে কাঞ্চনমালা দেবযানীর চোখের বিষ হয়ে উঠবে। অনন্যোপায় হয়ে মহারাজা আমার অনুরোধে কাঞ্চনমালাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

জাহ্নবীর মন শতানীকের প্রতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়। এত জঘন্য চরিত্রের মানুষও হয়? সে কি বলবে বুঝতে পারে না।

শতানীক বলে—কিছু বলছ না কেন? সম্মত আছ?

—ভাবছি।

—কী ভাবছ?

—ভাবছি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়ে নিজের ভগিনীর এতবড় সর্বনাশ কেন করতে চাইছেন আপনি। পরম শত্রুও তো এমন করে না।

—তুমি বুঝছ না।

—সব কিছু জলের মত বুঝেছি কুমার। আমি প্রাসাদে বসে থাকি না। বাইরে ঘুরে বেড়াই। বাইরে এর মধ্যেই আপনার বিষয়ে আলোচনা হতে শুরু করেছে। সেটা প্রশংসাসূচক নয়।

—তাই নাকি? কী বলে তারা?

—সব কথা কি বলা যায় কুমার? ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবে তারা এটকু বুঝেছে যে আপনি তাদের মহারাজের যোগ্য শ্যালক নন।

—তোমার স্পর্ধা অনেক বেড়েছে জাহ্নবী। ভুলে যেও না তোমার দেশ অবন্তী।

—ভুলব কেন? কিন্তু আপনাকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই আমার। কারণ আমি ইচ্ছা করলে এই দেশেও থেকে যেতে পারি।

—ইচ্ছা আর বাস্তবে সব সময় মেলে না।

– তবে আপনাকে বলেই দি। আমি ঠিক করেছি চিরকাল গঙ্গারিদিতে থাকব।

বিস্মিত শতানীক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে উজ্জয়িনীর এই স্পর্ধীণী তরুণীর দিকে। সে কিছুক্ষণ রুদ্ধবাক হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—বিস্মৃত হয়ো না জাহ্নবী, তুমি বিদুষী আর বুদ্ধিমতী বলে দেবযানী তোমার প্রতি ভদ্র ব্যবহাব করে। তুমি এককালে দেবযানীর বাল্যসখী থাকলেও এখানে তোমার পরিচয় দাসী ব্যতীত অন্য কিছু নয়। আমি ইচ্ছা করলে এখান থেকে তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে পারি।

কথাটা শুনে ক্ষণিকের জন্য জাহ্নবীর বুক কেঁপে ওঠে। তারপর তার মনে পড়ে যায়, দেবযানীর পিতা বিদায়ের সময় তাদের কি বলেছিলেন। বলেছিলেন—আজ থেকে তোমাদের ওপর উজ্জয়িনীর আর কোন অধিকার রইল না। মহারাজার বিক্রমাদিত্য স্বয়ং একথা বলে দিয়েছেন। কারণ কার্যত তোমরা এখন অন্য দেশের রাণীর অধীনে হবে। তবে বিশেষ কোন গুরুতর কারণ ঘটলে ও দেশের মহারাজা তোমাদের কাউকে ফিরিয়ে দিতে পাবেন। আর তোমরা যদি ওদেশের মহারাজকে অনুরোধ কর দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, তিনি সেই অনুরোধে সম্মত হলে ফিরে আসতে পারবে।

সে শতানীকের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বলে—এমন অপচেষ্টা করে নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না। উজ্জয়িনীর সম্মান রাখতেই আপনাকে এই অনুরোধ করছি। কারণ আমি জানি এখানে আপনি কত অসহায়। বিশেষ করে কদিন পূর্বে মৃগয়ায় গিয়ে সামনে সহসা ব্যাঘ্রেব আবির্ভাবে আপনার প্রতিক্রিয়ার কথা সারা দেশে ছড়িয়ে গিয়েছে। যে সেনাদলকে সঙ্গে এনেছেন তারা ওদেশেও জানিয়ে দেবে। কারণ তাদের কয়েকজন আপনার সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

শতানীকের গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। সে তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করে।

এক পক্ষকালের মধ্যে শতানীক তার সঙ্গে আনা সেনাদল নিয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করে। যাওয়ার সময় তাকে যথোচিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিদায় জানানো হয়। নদীব

তীরে মহারাজা চন্দ্রকেতু তাঁর মন্ত্রী ও সেনাপতিসহ উপস্থিত ছিলেন। রানী দেবযানী নদীতীরে আসতে পারেন না। তিনি রাজপুরীতে তাঁর ভ্রাতাকে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় দিলেন। এবার থেকে এখানে তাঁব আপন বলতে কেউ রইল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ দেশে সুনাম অর্জন করতে পারেনি জেনেও তিনি যেন কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। জাহ্নবী বলে, স্বামীর চেয়ে আপন কে হয়? তুমি বুঝতে পার না?

জাহ্নবীর কথা শুনে দেবযানী জ্বলে ওঠেন—না পারি না। দেহের ওপর অধিকার থাকলেই মনের ওপর থাকবে? তাছাড়া মহারাজা তো আমার এ-দেহ তেমন ভাবে স্পর্শই করেননি।

জাহ্নবী চমকে ওঠে। এমন কথা তার মাথাতেও আসেনি। সে বলে—মহারাজকে তুমি আকৃষ্ট করতে পারনি!

—আমার ভাল লাগলে তো আকৃষ্ট করব? মহারাজা বিক্রমাদিত্যের তুলনায় এই সব রাজা অনার্য।

চন্দ্রকেতু জাহ্নবীর অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। তাই দেবযানীর এই বিকৃত মনোভাব তাকে প্রবল ধাক্কা দেয় মানসিকভাবে। তার প্রভাব প্রশমিত হতে অনেকক্ষণ সময় লাগে।

দেবযানী তার এই অবস্থা দেখে, বিস্মিত হন। দেখেন জাহ্নবীর মুখমণ্ডল রক্তশূন্য। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত। পাশে বাতায়নের কাষ্ঠনির্মিত একটি অংশ আঁকড়ে ধরে রয়েছে সে। কিছুক্ষণ পরে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। সে চোখ মেলে মহারানীর দিকে চায়।

—কী হল? মহারাজা তোমার কাছে এতই শ্রদ্ধার? মনে হচ্ছিল, তুমি বুঝি মরতে বসেছিলে।

খুব ধীরে ধীরে জাহ্নবী বলে—অনার্য আপনি কাকে বলেন মহারানী?

দেবযানী জাহ্নবীর এই ধরনের সম্বোধনে অবাক হয়। তবে বাহ্যিক কোন প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে তিনি বলেন—যাকে 'আর্য' বলে সম্বোধন করতে মন চায় না, সে-ই অনার্য।

—তাহলে আর্য হওয়া না হওয়া, আপনার পছন্দের ওপর নির্ভরশীল।

—কতকটা তাই। তাছাড়া এদেশের কী আছে? আদুড় গায়ের কৃষ্ণবর্ণের প্রজাকুল, আর আঁশটে গন্ধের পরিবেশ। এই তো?

—আমাদের দেশের মত এখানে শীতের প্রকোপ নেই। নদীভিত্তিক এদের উপার্জন। মৎস্য এখানকার একটি মূল উৎপাদন এবং খাদ্য। ঝড়ে জলে শৈশব থেকে এরা বড় হয়ে ওঠে। তাই এদের বর্ণ রোদে-পোড়া। তাই এখানকার প্রকৃতি ভিন্ন ধরনের। মৎস্যগন্ধা কে ছিলেন মহারানী?

—কে ছিলেন?

—আমি মহাভারতের কথা বলছি। লোকের মুখে মুখে ঘোরে সেই কাহিনী।

—জানি না।

—জেনে নেবেন মহারাজের কাছ থেকে। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, তিনি জানেন।

—তোমার সঙ্গে বাদানুবাদ করার জন্য এখানে তোমাকে আনা হয়নি। পরিচারিকার ভূমিকায় থেকে তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দেবে এই কথা ছিল। তুমি আমার সখী। অথচ সখীর মাধুর্য হারিয়ে ফেলছ দিনে দিনে। কেন?

—কারণ সখীর চেয়ে পরিচারিকার ভূমিকায় আপনি আমাকে বেশি পছন্দ করেন। পরিচারিকা মন বুঝে কথা বলে। সখী তা বলে না। সে বান্ধবীর মঙ্গলের জন্য সত্য কথা অপ্রিয় হলেও সোজা তাকে বলে অনেক সময়।

—আমার ভুল হয়েছে। তুমি আমার নাম ধরে ডেকো। তাই বলে সব সময় মহারাজের গুণকীর্তন করো না।

—তুমি সুখী হও, তোমার ভাল হোক, আমি শুধু এই চাই। সেজন্য নিজের জীবন দিতে পারি। আমাকে সেই পথ থেকে তুমি বিচ্যুত করতে পারবে না। তুমি আমাকে বিতাড়িত করলেও নয়। কারণ তোমার উগ্র স্বভাব সত্ত্বেও তোমাকে আমি প্রাণভরে ভালবাসি। এই ভালবাসা কোন বিশেষ কারণের ওপর নির্ভরশীল নয়।

--যা ইচ্ছা কর। তাই বলে মহারাজকে ভালবাসতে পারব না।

—তুমি দুর্ভাগিনী। তবু আমি ভালবাসতে বলছি না। কারণ ভালবাসা স্বতঃস্ফূর্ত। কারও উপদেশে তা জাগ্রত হয় না। ঈশ্বরের অবদানের মত ভালবাসা আপনা হতে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাঁকে শ্রদ্ধা করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে তোমার।

—যেমন?

—তার কি শেষ রয়েছে? তুমি সবচেয়ে আগে পুরুষের যা চাও, সেই সৌন্দর্য তাঁর সর্ব অবয়বেত যথেষ্ট রয়েছে। এছাড়া তুমি আর কি চাও আমার জানা নেই। তবে প্রচুর ঐশ্বর্য চাও। জানি, তুমি রাজকন্যা হয়ে জন্মাওনি বলে তোমার মনে ক্ষোভ ছিল। এখানে মহারানী হয়ে সেই ক্ষোভ দূর হওয়া উচিত। তুমি পুরুষের পুরুষাকার পছন্দ কর কি না জানি না। তবে সেই পুরুষকার মহারাজের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা তিনি জ্ঞানী ও গুণী। আর কী চাও?

—জানি না। তবে মহারাজের জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকুও স্থান করে দিতে পারি না। সব সময় আমার মনে হয় আমি যেন এদের চেয়ে অনেক বেশি উঁচুতে। আভিজাত্যে এরা অনেক নিকৃষ্ট।

বিস্মিত জাহ্নবী বলে ওঠে—তুমি কি উন্মাদ?

—হয়ত তাই।

—মহারাজকে তোমার ভালবাসতে হবে না। কিন্তু কখনো তাঁকে অবমাননা করার চেষ্টা করো না। অভিজাত বলতে তুমি কি বোঝাতে চাইছ জানি না। তবে যে জাতি শিল্পীরূপে এত উন্নত তাদের আভিজাত্যের প্রমাণ দিতে হয় না। আভিজাত্যের প্রমাণ মানুষের কথাবার্তায় আচার আচরণে ফুটে ওঠে। তার দাম্ভিকতায় নয়। মহারাজকে যদি কখনো তুমি কটুকথা বলে ফেল তাহলে তিনি বুঝবেন তোমার মধ্যে আভিজাত্যের ছিটেফোঁটাও নেই।

—কটু কথা এর মধ্যে আমি অনেক বলেছি জাহ্নবী।

জাহ্নবীর মুখে অব্যক্ত বেদনার প্রকাশ। সে কোন কথা খুঁজে পায় না। অপরিসীম লজ্জায় তার মরে যেতে ইচ্ছা হয়। মহারাজকে সে প্রতিদিনই দেখে। তাঁর মুখের দিকে সংগোপনে চেয়েও থেকেছে। কোনরকম পরিবর্তন লক্ষ্য করে না। তাঁর মুখে হাসি খুব অল্পই দেখা যায়। সর্বদা একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য তাঁর মনের সব কিছু আড়াল করে রাখে। দেবযানীর ঔদ্ধত্য আর কটুভাষের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন তাঁর মুখে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হৃদয় নিশ্চয় নিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে। ছি ছি, দেবযানীর নিজের ভাগ্যকে এভাবে বিড়ম্বিত করছে কেন? এখনো চেষ্টা করলে মহারাজের ভালবাসা সে পেতে পারে। মহারাজের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

—দেবযানী তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি, মহারাজের কাছে ক্ষমা চাও। তিনি নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

কথাটা শুনে দেবযানী কেমন করে হেসে ওঠে যেন। সেই হাসির শব্দে জাহ্নবীর গা ছম্‌ছম্‌ করে। মনে হয় অশরীরী কিছু তার সখীর ওপর ভর করেছে। একটা কৌতূহল তার মনে জেগে ওঠে। জানতে ইচ্ছা হয় মহারাজের সঙ্গে তার দৈহিক সম্পর্ক কতটা রয়েছে।

সখীকে সে জিজ্ঞাসা করে—তোমার এত রূপ। সেই রূপের মোহে মহারাজা নিশ্চয় আছন্ন।

—হ্যাঁ, প্রথম দিনে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু এত বেশি পুরুষের চোখে ওই চাহনি দেখেছি যে এখন আর আমার মনে সাড়া জাগায় না।

—মহারাজের চোখের সেই চাহনি নিশ্চয় রয়েছে।

দেবযানী একটু ইতস্তত করে বলে—না। ওই একদিনই শুধু। তারপর সেই চাহনি নিভে গিয়েছে।

—বল কি? এই অপরূপ রূপের আধারকে তিনি কাছে টেনে নিতে চান না বলতে চাও?

—হ্যাঁ, তাই বলতে চাই।

—তাঁর চোখে প্রথম রাতে বিহ্বলতা দেখার পরেও নয়?

—সেই একদিনই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। বলেছিলেন, 'এই রূপকে সর্বদা দেখতে পাব? কাছে পাব ভাবতে আমায় হৃদয় ভরে উঠছে।'

জাহ্নবী প্রশ্ন করেছিল—তুমি তখন কী বলেছিলে?

—আমি বলেছিলাম, 'আপনার মন ভরলেও আমার বিন্দুমাত্রও ভরেনি।' তিনি বলেছিলেন, 'কেন দেবাযানী?' আমি বলেছিলাম, 'আমার স্বপ্নের রাজার ধারে কাছেও আপনি নন। আমার রাজার প্রজাকুল আর্ধোলঙ্গ অবস্থায় কাঁধে মাছের জাল নিয়ে রাজধানীর পথে পথে ঘুরে বেড়ায় না। কিংবা বাঘ ভালুকের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত উলঙ্গ দেহ নিয়ে রাজধানীতে বৈদ্যের কাছে নিরাময়ের আশায় ছুটে আসে না।'

জাহ্নবীর মাথা ঘুরতে থাকে। বড় আশা জেগেছিল মনে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। ভেবেছিল এখানকার শিল্পীদের কাছ থেকে সে অনেক কিছু শিখবে। সম্ভব হলে উপযুক্ত কোন শিল্পীর সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। এদের অভাববোধ খুব সামান্য। তার নিজেরও তেমন কিছু নেই। সে শুধু নতুন কিছু জানতে চায়, জ্ঞান আহরণ করতে চায়। তেমন ব্যক্তির অভাব নেই এদেশে। কিন্তু তেমন কিছু বোধহয় আর হবে না।

দেবযানী জাহ্নবীকে নীরব দেখে বলে—চুপ করে রইলে কেন? সবটকু শোনো। রূপের প্রতি মোহ মহারাজের কেটে গিয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন, তবু তিনি দিনে বা রাতে একবার করে আসবেন। নইলে তাঁর মা আঘাত পাবেন। রাজ্যে নানা কিছু রটবে। তবে শুধু রটনার ভয়ে নয়, তিনি প্রতিদিনই জানতে চান, আমার কোন অসুবিধা রয়েছে কি না। বলেছেন, কোন অসুবিধা হলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জানানো হয়। রূপের আধার নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার উচ্ছ্বাস তাঁর বিন্দুমাত্রও নেই। স্পর্শই করেন না।

জাহ্নবী ঘৃণার সঙ্গে বলে—তুমি তো তাহলে মহাভাগ্যবতী। তোমার মত ভাগ্যবতী জগতে দ্বিতীয় কেউ নেই।

দেবযানী কঠিন স্বরে বলে—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ জানি। তবে এটা তোমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না। ভুলে যেও না আমি তোমার সখী হলেও এদেশের রানী।

—যাঁর অধিকারে তুমি রানী তাঁকেই তো তুমি স্বীকার করো না। যা হোক পৃথাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—না, আমি এখন একা থাকতে চাই। একা থাকার কি উপায় আছে? রাজমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা বোধহয় আঁচ করতে পেরেছেন।

—তাতে কি এসে যায়? প্রজাকুল তোমার রূপ দেখে মুগ্ধ। রাজ-অন্তঃপুরে কি ঘটছে তারা জানবে না।

দেবযানী সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে বলে—তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—রাজমাতা অম্বিকাদেবীর কক্ষে।

—পৃথা হলে বোধহয় ভাল হত।

—না, তুমি থাকবে।

মহারানীর আদেশ শিরোধার্য করে দেবযানীর সঙ্গে সেদিন মধ্যাহ্নের পরে সে প্রাসাদ সংলগ্ন রাজমাতার গৃহে গেল।

রাজমাতার পরিচারিকা শুধু দেবযানীকে সসম্মানে ভেতরে নিয়ে গেল। জাহ্নবী বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। এই সময়ে রাজমাতার ব্যক্তিগত দাসী বিমলা উপস্থিত থাকলে জাহ্নবীকেও ভেতরে নিয়ে যেত। তাই বাধ্য হয়ে সে বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে যতটুকু সম্ভব কথোপকথন শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল। কিন্তু অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ব্যতীত কিছুই কর্ণগোচর হল না। শুধু দেবযানীর কণ্ঠস্বরকে বড় বেশি ঔদ্ধত্যপূর্ণ বলে মনে হল। অম্বিকাদেবী মার্জিত রুচির নারী বলে, তাঁর কথা শুনতে পেল না জাহ্নবী।

একসময় দেবযানী রাজমাতার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। জাহ্নবী লক্ষ্য করে সখীর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ। মনে হল মুখের সমস্ত সূক্ষ্ম শিরা উপশিরার রক্ত স্রোত ফেটে বাইরে গড়িয়ে পড়বে। দেবযানী তাঁর কক্ষের দিকে এগিয়ে যান। জাহ্নবীর কথাও বিস্মৃত হন তিনি। জাহ্নবী তাঁকে অনুসরণ করে।

ইতিমধ্যে পৃথা এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর কক্ষের সামনে। তার ওষ্ঠদ্বয় চকচক করছিল। নিশ্চয় কিছু খেয়েছে। দেবযানী তাকে লক্ষ্য করেন না। তিনি হঠাৎ পেছনে ফিরে ইশারায় জাহ্নবীকে তাঁর কক্ষে ডাকেন। পৃথা ওষ্ঠদ্বয় চেটে নিয়ে মুখবিকৃত করে। জাহ্নবীর প্রাধান্য তার কাছে অসহ্য বলে মনে হয়। একবার ভেবেছিল ফিরে যাবে উজ্জয়িনীতে। কিন্তু বেশি ভাল লেগে গিয়েছে প্রাসাদরক্ষী সুহস্তকে। সুহস্ত অবশ্য কখনো তাকে কোনরকম ইঙ্গিত দেয়নি। কিন্তু কী করবে পৃথা। দূর থেকে সুহস্তের চলা ফেরার ভঙ্গি, তার ব্যস্ততা এমনকি তার কথা বলার ধরন বড় ভাল লাগে তার। ও দেশে গিয়ে ওখানকার প্রাসাদের আশেপাশে যাওয়ারও উপায় নেই তার। তাছাড়া সব প্রাসাদেই কি সুহস্তের মত তরুণ থাকে? ওখানে গেলে তাকে হয়ত বিবাহ করবে উজ্জয়িনী থেকে দূরের কোন গ্রাম্য ব্যক্তি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ সে পিতৃমাতৃহীনা। খুল্লতাতের নিকট বড় হয়েছে। কিন্তু সুহস্তকে কীভাবে বলবে তার

মনের বাসনার কথা? হাবভাবে? ভয় হয়, যদি সুহস্ত তাকে মন্দ ভাবে? তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে পৃথা অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সেই সময় পেছনের উদ্যানের পোষা ময়ূরের কর্কশ ডাকে তার চমক ভাঙে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, রাণীর কক্ষে এখনো জাহ্নবী রয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে যায় তার। পৃথাকে পরিচারিকা রূপে নিয়োগ করা হয়েছিল দেবযানীর এদেশে আসার কিছুকাল পূর্বে। তার আপনজন কেউ নেই বলেই নিয়োগ করা হয়েছে। দেবযানীর সঙ্গে জাহ্নবীর সখ্যতার কথা তার অজানা। ভাবে জাহ্নবী তারই মত একজন পরিচারিকা মাত্র। তাই ভেতরে ভেতরে সে জ্বলে-পুড়ে মরে ঈর্ষায়। স্বপ্ন দেখে, সুহস্তের মন যদি জয় করতে পারে তাহলে জাহ্নবীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারবে। তার মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধি কিছুটা রয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে রাজকর্মচারীকে বিবাহ করার মত ক্ষমতা তার হবে না। তাছাড়া তার রূপও নেই এমন কিছু। নাক মুখ কাটা কাটা। পেলব ভাবই নেই। অথচ রাণীর আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে সে। বলতে নেই, নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। রূপ মেলে ধরে সুহস্তকে ভোলাতে বাধো বাধো লাগে। তাতে সুহস্ত ছোট হয়ে যাবে। সুহস্ত ছোট হয়ে গেলে কিসের গর্ব নিয়ে বাঁচবে সে? জাহ্নবীর বিদ্যাবুদ্ধি তার নারীত্বকে অনেক খাটো করে দিয়েছে। নারীদের অত বুদ্ধি থাকা ভাল নয়। তাদের হতে হবে নরম মাটির মত। পুরুষ যে ভাবে গড়বে সেইভাবে গড়ে উঠবে। ওর এক সম্পর্কে দিদি ওকে বলেছিল, তাতেই নাকি পুরুষের আনন্দ।

কক্ষের অভ্যন্তরে দেবযানী তখন তাঁর শয্যায় পা ঝুলিয়ে বসে ছিলেন, আর জাহ্নবী তাঁরই পায়ের কাছে নীচেতে বসে রানীর এই কয়েকমাসের দাম্পত্য জীবনের কাহিনী শুনছিল আর চমকে চমকে উঠছিল। এ-কাহিনী মহারাজের প্রতি দিনের পর দিন চরম দুর্ব্যবহারের নির্মম কাহিনী। দেবযানীর প্রতি জাহ্নবীর অপরিসীম ভালবাসা রয়েছে ঠিক, কিন্তু আজ প্রথম উপলব্ধি করছে যে এতদিন সে না বুঝে শুধু সুন্দর মুখ দেখে এক পিশাচীকে ভালবেসে এসেছে। এর হৃদয় বলে কিছু নেই। এঁর স্বল্প-বুদ্ধির কথা জানা থাকলেও এই হৃদয়হীনতার কথা জানা ছিল না। সত্যই অদ্ভুত বলে মনে হয় যে দিনের পর দিন এত কাছে থেকেও এঁকে চিনতে পারেনি সে। সে বুঝতে পারে রূপ যদি সত্যই তুলনাহীন হয়, তাহলে শুধু পুরুষকে নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নারীকেও ভুলিয়ে দেয়। এই আকর্ষণ পুরুষের মত কামজ না হলেও সত্য।

শয্যায় বসে দেবযানী অনেক কথা বলে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনকিছুই তার কর্ণগোচর হচ্ছে না। মহারাজের জন্য সে তখন শোকে মুহ্যমান। তার নয়নদ্বয় অশ্রুপ্লাবিত।

বেশ কিছুক্ষণ জাহ্নবীর সাড়া না পেয়ে দেবযানী একটু উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন—কী হল? বোবা হয়ে গেলে নাকি?

জাহ্নবী তাড়াতাড়ি চোখ মুছে ভাঙা গলায় বলে ওঠে—আমি শুনছি তো।

দেবযানী পালঙ্ক থেকে নেমে হাত দিয়ে জাহ্নবী মুখ ঘুরিয়ে বলেন—একি, তুমি কাঁদছ!

—না।

দেবযানী একটু হেসে বলেন—বুঝেছি। আমার জন্য কষ্ট হচ্ছে। ভয় নেই আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হয়নি। আজ মহারাজের মাকে সব কথা বলে দিয়ে বরং মনের ভার লাঘব করেছি। তবে রাজমাতার একটি কথায় আমি অপমানিত বোধ করছি।

—ও।

—তুমি শুনতে চাও না, কি বলেছেন তিনি?

—বল।

—কী হয়েছে তোমার? কোন আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি না কেন?

—আগ্রহ রয়েছে রানী। তুমি যখন সুখী, আমার আগ্রহ না থাকার কারণ নেই।

—রাজমাতা বললেন, তোমার সব কথা শুনে বুঝতে পাবলাম, চন্দ্রকেতুর মনে কিসের ঝড় উঠেছে। মা হয়ে আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, এক নিদারুণ যন্ত্রণায় ভুগছে সে। তাই আমি আগে থেকেই একটা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। আজ তুমি অকপটে সব কথা বলায় আমি এই ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করব। চোখের সামনে ওর হৃদয়কে মরে যেতে দেব না। তোমাকে দোষারোপ করব না। কাবণ তুমি নিজে মহারানী হওনি, আমিই তোমাকে এনেছি। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। শুনছ তো জাহ্নবী?

—শুনছি।

—আমি জানতে চাইলাম তিনি কোন্ ব্যবস্থা নেবেন। উনি বললেন—তাম্রলিপ্তের রাজকন্যার সঙ্গে ওর বিবাহ পাকা করব। তোমার মত সেই কন্যার চোখ-ধাঁধানো রূপ নেই। কিন্তু তার মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধতা, মমতা, ক্ষমা, তিতিক্ষা—আরও অনেকগুণ। আমি বললাম, এটা আমার অপমান। উনি হেসে বললেন—আমার পুত্রকে আমি সুখী দেখতে চাই। তার পরিবর্তে একশত দেবযানীকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হবে না। সারা জীবন তোমাকে শান্ত হয়ে থাকতে হবে এই বাজপুরীতেই। অবন্তীতে ফিরে যাওয়ার ক্ষীণতম আশাও করো না।

দেবযানীর কথা শুনে এতক্ষণে জাহ্নবীর আনন্দ হয়। মনে মনে প্রার্থনা করে, এবারে যেন মহারাজা সুখী হন। মুখে বলে—কী আর করবে? তোমার প্রাচুর্যও থাকবে, সম্মানও থাকবে। নীরব থাকাই ভাল।

—আমিও সেই কথা ভাবছি। মহারাজেরা কত বিবাহ করেন কারণে অকারণে। কেউ মাথা ঘামায় না। উজ্জয়িনীতে ফিরে গেলে সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাছাড়া এদের তুলনায় আমার পিতার সম্মান আর ঐশ্বর্য অতি নগণ্য। এরা আমার পিতার মত লক্ষাধিক ব্যক্তিকে কিনে নিতে পারে।

—এতদিনে বুঝেছ তাহলে।

—বুঝলেই বা কি? ওদের সম্বন্ধে প্রথম থেকেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, কিছুতেই নিষ্কৃতি পাই না।

—আর পেতে হবে না। ভালই হয়েছে, মহারাজা নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

—কী বললে?

—না, বলছিলাম, উনিও বোধহয় তোমার মত একজন উচ্চশ্রেণীর নারীর কাছে আসতে ভরসা পেতেন না।

মহারাজের অশ্বশালা রয়েছে। সেখানে অনেক অশ্বের মধ্যে দুটিকে তাঁর পছন্দ। কালেভদ্রে সেই দুটি ব্যবহার করলেও মন্দারের প্রতি তাঁর ঝোঁক বেশী। কিন্তু রানী দেবযানীকে বিবাহের পর থেকে মন্দারকে ছেড়ে সেই অশ্বদুটি ব্যবহার করতে শুরু করেছেন তিনি। মাহুত শিতিকণ্ঠ বিস্মিত

হয়। একদিন সাহসে ভর করে প্রশ্ন করে ফেলেছিল। মহারাজা বলেছিলেন—ওরা বিশ্রাম নিক। এক কাজ কর। মন্দার আর কালিনীকে মাঝে মাঝে বল্লভের গৃহে পাঠাও। ওর খুব সখ।

শিতিকণ্ঠ মহারাজের মতিগতি বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে তিনি মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান আর অশ্বে আরোহণ করে সেই অশ্ব উল্কার গতিতে ছুটিয়ে দেন। সঙ্গে দেবরক্ষী অচঞ্চলকেও নেন না কত দিন। অচঞ্চল উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে মহারাজের সুহৃদ, চিত্রককে অনুযোগ করে বলে—কার মনে কি আছে জানা নেই। মহারাজ ঐভাবে একা একা বাইরে গেলে অঘটন ঘটে যেতে পারে।

কথাটা চিত্রক মহারাজের কানে তুললে তিনি মৃদু হেসে সেটিকে উপেক্ষা করেন। চিত্রক এই উপেক্ষা সহ্য করতে পারে না। সে তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে—কার ওপর অভিমান করে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ?

মহারাজ কথাটা শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। কিন্তু কোন উত্তর দেন না।

চিত্রক অচঞ্চলকে সব জানালে সে মনস্থির করে নিজের দায়িত্ব নিজেই পালন করে যাবে সে। অশ্বচালনায় সেও পটু। সে ঠিক করে এবার থেকে রাজপুরীতে বেশিরভাগ সময় থাকবে, যাতে মহারাজ একাকী বাইরে না যেতে পারেন। আজকাল তাই সেও মহারাজের পশ্চাতে দ্বিতীয় অশ্বটি নিয়ে ছোটে। প্রথম দিন মহারাজ অশ্ব থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলেন—তুমি এলে কেন?

সে সবিনয়ে অথচ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল—এটাই তো আমার কাজ।

মহারাজা আর কিছু বলেননি।

ইতিমধ্যে রাজধানী এবং তারপরে সমগ্র গঙ্গারিদি রাজ্যে রটে যায় যে মহারাজের দ্বিতীয় বিবাহের আয়োজন করা হচ্ছে। প্রজাকুল আনন্দিত। অধিকাংশের দৃঢ় অভিমত হল, একাধিক রানী না থাকলে কোন মহারাজকে রাজা-রাজা বলে মনে হয় না। এতদিনে মহারাজ চন্দ্রকেতু রাজার মত রাজা হবেন। তবে তাদের কানে এসেছে, রূপ-লাবণ্যে দ্বিতীয়া রাণী প্রথমার সমকক্ষ কখনই হবেন না। তাম্রলিপ্ত তো দূরের দেশ নয়। সেখান থেকে প্রায়ই পণ্ডিত আর পথিক এদেশে আসে। রাজকন্যা তেমন রূপবতী হলে তাদের মুখে শোনা যেত। তবে হ্যাঁ, তাঁর মত গুণবতী কন্যা এই ধরিত্রীর বুকে দ্বিতীয় কেউ রয়েছেন বলে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। আর আহা! কী স্নিগ্ধ আর মিষ্টি তাঁর মুখ। নাইবা হলেন গৌরবর্ণ, অমন মমতা-মাখানো চাহনি আর কোথায় মিলবে? গঙ্গারিদির মানুষেরাও তাঁর কথা শুনেছে। নামও জানা হয়ে গিয়েছে। উর্মিলা। খুব আপন আপন নাম। অনেকে নাকি এই নাম শুনেছে। কোথায় শুনেছে, বলতে পারে না। তারা ভাবে এবারে বোধহয় রাজ্যে সুদিন আসবে। মহারাজের প্রথম রানী আসার পর থেকে বিদেশী পোত আর আসেনি। কতদিন হয়ে গেল শ্বেতবর্ণের কটা চুল আর কটা চোখের মানুষ আর দেখা যায় না। এলে ভাল লাগে। চন্দ্রকেতু-গড়ের রাস্তায় যখন তারা চলাফেরা করে, পণ্যশালায় দ্রব্যসামাগ্রী কেনাবেচা করে ইশারায় হাত নাড়ে, তখন দেখতে খুব ভাল লাগে। অত দূরের মানুষকে কত পরিচিত বলে মনে হয়। কতশত বছর আগে থেকে এদের আসা-যাওয়া। এদেশের রমণীর গর্ভে কত সন্তান সন্ততি রেখে গিয়েছে তারা। কয়েকজন আর ফিরে যায়নি। এখনো কোন কোন গ্রামে কটা চোখ আর কটা চুলের মানুষ দেখা যায়। তবে তাদের গাত্রবর্ণ অতটা শ্বেত নয়। ক্বচিৎ কখনো রীতিমত গৌরবর্ণও দেখা যায়। নব যৌবনাদের কাছে তাদের মূল্য রয়েছে।

নতুন রাণী এলে আবার হয়ত ওইসব দেশের বহুসংখ্যক পালযুক্ত পোত সাগরপার হয়ে আসবে, যেমন আসত আট-দশ মাস আগেও। সেই অপেক্ষায় থাকে তারা।

মহারাজার সহসা অশ্ব নিয়ে ছোটার ঝোঁক চাপায় মন্দার আর কালিনীর দিনগুলো একঘেয়ে হয়ে যায়। কালিনী পুরুষ নয় বলেই হয় তার সহনশীলতা বেশি। কিন্তু মন্দার আবার অস্থিরতা প্রকাশ করতে থাকে। মাহুত শিতিকণ্ঠ তার হাবভাব দেখে ভীত হয়ে পড়ে। আগের বার খেপে উঠলে মহারাজ তাকে সামলেছিলেন। কিন্তু এবারে কী হবে কে জানে। মহারাজাকেও বোধহয় মানতে চাইবে না। কারণ মন্দারের মনে পর্বতপ্রমাণ অভিমান জমে উঠেছে।

শিতিকণ্ঠের হঠাৎ শিল্পী বল্লভের কথা মনে পড়ল। মহারাজ তো নিজের মুখে ঢালাও নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন বল্লভ চাইলেই হাতি পাঠাতে হবে। শিতিকণ্ঠ মহারাজের সেই আদেশ এতদিনে কার্যকরী করবে মহারাজের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু মন্দারকে নিয়ে বল্লভের গৃহে গিয়ে হয়ত তার দেখা মিলবে না। তাই শিল্পীকে আগে একটা সন্দেশ পাঠাতে হবে। অচঞ্চলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাকেই বলতে হবে এবং আজই।

অচঞ্চল অপরাহ্ণেই ছুটল বল্লভের গৃহে। যদিও সে আজকাল অধিকাংশ সময়ে রাজপুরীতে থাকে। মহারাজ কখন যে অশ্ব নিয়ে ছুটবেন, কিছু বলা যায় না। তবে আজ আর বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ রাজমাতা নর্তকী কাঞ্চনমালাকে ডেকে পাঠিয়েছেন বিশেষ কোন কারণে এবং মহারাজকে সেখানে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। রাজমাতা মাঝে মাঝে কাঞ্চনমালাকে এভাবে ডেকে পাঠান। ফলে সে এখন প্রাসাদের সম্মানীয় অতিথি।

বল্লভকে সব কথা বলতে সে প্রথমে সঙ্কুচিত হয়। বলেন—শুধু শুধু আবার কেন?

অচঞ্চল বেশ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে—শুধু শুধু নয়। মাহুত আর আমার ওপর মহারাজের আদেশ ছিল। যদি কখনো তিনি জানতে পারেন আপনি একদিনও হস্তী ব্যবহার করেননি তখন আমাদের শাস্তি দেবেন। আমাদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেটাও তো একটু দেখবেন। আপনাকে এদেশের সবাই শুধু চিত্রকর আর পুতুল গড়ার পারদর্শী ব্যক্তি বলে জানে না। তারা জানে দেশের মানুষের প্রতি আপনার অগাধ ভালবাসার কথা। তারা জানে ধন আর ধনীর প্রতি আপনি নির্বিকার। কিন্তু মানুষের দারিদ্র্যে আপনার মন কাঁদে। আপনার মন অমন বলেই নাকি আপনার হাতের সৃষ্টি অত সুন্দর।

বল্লভ বলে ওঠে—আমি যাব অচঞ্চল। কবে যেতে হবে?

—কালই। শুধু কাল নয়, শিতিকণ্ঠ যখনই নিতে আসবে, আপনি ব্যস্ত না থাকলে তখনই যাবেন। এতে আপনার মন সতেজ থাকবে। কাজ আরও ভাল হবে। একথা শুধু আমার নয়, স্বয়ং মহারাজের।

—সেটা সম্ভব হবে না। সেদিন হাতিতে চেপে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। দেখছিলাম গ্রামের মানুষরা আমাদের দিকে কীভাবে যেন চেয়ে রয়েছে। ওরা যেন আমাকে স্পর্শ করতে পারছে না। আমি যেন ওদের নিকট থেকে দূরে সরে গিয়েছি। খুব কষ্ট হচ্ছিল। একবার মনে হয়েছিল হাতির ওপর থেকে লাফিয়ে ওদের কাছে ছুটে যাই।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল তো যাবেন?

—দাঁড়াও, আমি গুণবানকে একটু জিজ্ঞাসা করে আসি।

—আবার তাঁকে কেন?

—ও যে আমার বন্ধু। আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ও সঙ্গে থাকলে আমার খুব ভাল লাগে। তুমি তো জান ও কতবড় পণ্ডিত। কত দেশের ভাষা জানে।

—জানি। আমি তাহলে দাঁড়াই, আপনি জেনে আসুন।

বল্লভ তার প্রতিবেশীর আঙিনায় প্রবেশ করলে অচঞ্চলের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়। অচঞ্চল ভাবে ইনি বড় বেশি আনমনা। সব সময় কি যেন ভাবেন। রান্না-বান্না করে দেওয়ার কেউ নেই। মা-বাবা নেই। নিজে বিয়ে করেননি। কখন খাওয়া-দাওয়া করেন, কি খান, কে জানে।

সেই সময় সে মহারানীর পরিচারিকাকে বল্লভের গৃহে প্রবেশ করতে দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়। সে জানে, এর নাম জাহ্নবী। সে একথাও জানে যে অন্য সব রমণীর চেয়ে এই তরুণী স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এ অনেক বেশি স্বাধীনচেতা, যতদূর মনে হয় বিদ্যাবুদ্ধিও রয়েছে। তাই বলে এক অবিবাহিত পুরুষের গৃহে এই সময়ে আসা খুব দৃষ্টিকটু।

জাহ্নবী অচঞ্চলকে দেখে চিনতে পারলেও তার মুখের কোন রেখার পরিবর্তন হয় না। সে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে অচঞ্চলকে জিজ্ঞাসা করে—উনি আছেন?

অচঞ্চল গুণবানের গৃহের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়। মুখে কিছু বলে না।

—আসতে দেরি হবে?

অচঞ্চল কথা না বলে মাথা ঝাঁকায়। মহারানীর পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলে কোন ফেঁকড়ায় পড়তে চায় না সে। স্ত্রী জাতিকে সে বরাবর এড়িয়ে যায়। তার ধারণা ওরা বিনাকারণে অনেক ঝামেলার সৃষ্টি করে।

সেই সময় বল্লভকে আসতে দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়।

বল্লভ জাহ্নবীকে দেখে বলে—আপনি এসে গিয়েছেন? বড্ড দেরি করেছেন আজকে।

—অনেক কষ্টে সময় করে নিতে হয়। তাছাড়া আগে এলে আপনার খাওয়া হয় না। আমি বুঝতে পারি আপনি অনেকদিন না খেয়ে থাকেন।

—আরে না না। আমি ঠিক খেয়ে নি। আমি যথেষ্ট পেটুক। একটু বেশি খাই।

অচঞ্চল বোঝে জাহ্নবীর অগমন আজ প্রথম নয়। বল্লভ অনাহারে থাকে কোন কোন দিন একথাও সে বুঝে ফেলেছে।

বল্লভ অচঞ্চলকে বলে—গুণবান সম্মত হয়েছে। শিতিকণ্ঠকে বলবে কাল সকালে যেন মন্দারকে নিয়ে আসে।

অচঞ্চল বিদায় নিলেও তার মনে একটা কৌতূহল জেগে থাকে। মহারানীর পরিচারিকা প্রায়ই আসে কেন? কোন অসদুদ্দেশে কখনো নয়। প্রকাশ্য দিবালোক এভাবে তাহলে কখনো আসত না। তাহারা রাজপুরীর অন্তঃপুর থেকে বাইরের একজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা খুব দুরূহ। কেন তবে আসে? কে বলতে পারবে?

অচঞ্চল চলে গেলে জাহ্নবী বল্লভকে জিজ্ঞাসা করে—আপনি কাল নগরীর বাইরে যাবেন?

—কি জানি। মহারাজের কানে গিয়েছিল আমি হাতীতে চড়তে ভালবাসি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেছিলেন; যখনই আমার ইচ্ছা হবে আমি যেন জানাই। হাতী চলে আসবে।

আমার মুখের একটা কথা এত গুরুত্ব পাবে কে জানত। আমি কখনো চেয়ে পাঠাইনি। আজ হঠাৎ অচঞ্চল এসে উপস্থিত। ওর জন্যেই সব কিছু ঘটেছে। মহারাজের কানে কথাটা ও তুলেছিল।

জাহ্নবী হেসে বলে—উনি তো ভালই করেছেন। এও এক ধরনের বৈচিত্র্য। মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন রয়েছে। আমি নিজেও সব সময় বৈচিত্রের সন্ধানী।

—সেকথা আমি জানি।

—কী করে?

—অন্য রাজ্যের একজন যুবতী হয়ে অতি সাধারণ একজন মানুষের কুটিরে আপনার পদার্পণ তার প্রমাণ।

—আপনি সাধারণ? সাধারণ মানুষের বাসনা পূর্ণ করতে দেশের মহারাজা তাঁর দুয়ারে হাতি পাঠান?

—আমাদের মহারাজা মহানুভব। তিনি নিজে সবার সঙ্গে মেশেন। দূরে সরে থাকেন না। যাক্ আপনি আজ কি জানতে এসেছেন? তার আগে বলে দি মাটির মূর্তি আর ফলক করাই আমার কাজ। হাতির দাঁতের কাজ খুব সামান্য করি। অধিকাংশ মৃৎশিল্পী বংশপরম্পরায় একই মূর্তি গড়ে চলেছে। আমার তাতে তৃপ্তি হয় না। আমি নতুন কিছু করতে চাই। আর তা চাইলে একটু বেশি জানতে হয়। তাই যাঁরা জ্ঞানবান তাঁদের কাছে দুদণ্ড গিয়ে বসতে হয়, তাঁদের কথা শুনতে হয়। আর একটা পথ রয়েছে। পুস্তক পাঠ। কিন্তু পুস্তক কোথায় পাব? অতি দুর্লভ সামগ্রী সেটি। মহারাজের প্রাসাদে কিংবা দুএকজন পণ্ডিতের গৃহে রয়েছে। যতটা পারি সংগ্রহ করে পড়ি। গুণবান আমাকে খুব সাহায্য করে।

—আপনি আমাকে কয়েকটি মুদ্রা দেখিয়েছেন। আপনি বলেছেন সেগুলো সম্রাট অশোকের সময়ের আগেও হতে পারে।

—তেমনই শুনেছি। আমার নিজের কোন ধারণা নেই।

—এখানে এত হাতির দাঁতের সামগ্রী পাওয়া যায়। কারা তৈরি করে সেগুলো?

—হাতির দাঁতের শিল্প বড় সূক্ষ্ম। কিছু লোক তাই নিয়ে থাকে। বাইরেও যায়। আমি চণ্ড-বিনোদনের জন্য নিজের হাতে করি।

—এত দাঁত কোথায় পাওয়া যায়?

বল্লভ হেসে বলে—এখানে প্রচুর হাতি রয়েছে বনে-জঙ্গলে। এখানকার অরণ্যে কি নেই? আপনি কি হাতীদের অত্যাচারের কথা কখনো শোনেননি? তারা বন থেকে দলে দলে বাইরে এসে শস্যের ক্ষেতের অনেক ক্ষতি করে দিয়ে যায়। তখন গ্রামবাসীরা তাদের মেরে ফেলতে বাধ্য হয়। মহারাজা হস্তীবধ করতে চান না। তাদের মধ্যে নাকি মন্দারকে দেখতে পান।

জাহ্নবী হাসে। সে একটু চুপ করে থেকে বলে—আপনি সেদিন বলেছিলেন। এই সব বাদামী-লাল রঙের পোড়ামাটির ছোট ছোট মূর্তি, পুষ্পাধার, সুরা পাত্র সবকিছুই নাকি সম্রাট অশোকের পূর্ব থেকে এখানে তৈরি হয়। কে বলেছে একথা?

—একথা আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছি। যারা একটু লেখাপড়া জানে তারা শুনেছে যে আলেকজান্দারের সময় থেকে এই গঙ্গারিদির বিভিন্ন দ্রব্য সেই দেশে যেতে শুরু করেছে। সেই দেশের মানুষেরা সুরাপ্রেমী। তাদের কাছ থেকে বোধহয় সুরপাত্র তৈরি করতে শিখেছি আমরা। সবই কিন্তু শোনা কথা। আপনার যেমন রয়েছে, আমারও তেমনি অহেতুক কৌতূহল

রয়েছে, নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাই না।

জাহ্নবী মনে মনে ভাবে—সেইখানেই দুজনার মিল। তবে আপনাকে নিজের সৃষ্টির জন্য বেশি সময় দিতে হয়।

সে মুখে বলে—অনেক পাত্রের গায়ে কিসব লেখা রয়েছে। আপনি পড়তে পারেন?

—না।

—আপনি লেখেন না?

—না। অনর্থক লিখতে যাব কেন?

—কারা এসব লিখেছে?

—অনেক আগের। আমি রেখে দিয়েছি। তবে গুণবান একটা কথা বলেছে। কি ভাবে জানল আমি বলতে পারি না।

—কী বলেছেন তিনি?

—মহাভারতের গান্ধারীর নাম শুনেছেন?

—শুনব না কেন? দুর্যোধনের গর্ভধারিণী।

—তিনি গান্ধার দেশের রমণী। খুবই সুন্দরী। আপনি যাঁর সঙ্গে এদেশে এসেছেন, যিনি এখন এ-দেশের মহারাণী, গান্ধারী তাঁর মতই সুন্দরী ছিলেন। তবে তাঁর উচ্চতাও ছিল। সেই গান্ধার দেশ থেকে একদল মানুষ কোন কারণে আমাদের এই গঙ্গারিদিতে সপরিবারে চলে এসেছিল এবং এদেশেই থেকে গিয়েছিল। তারা এই ভাষায় লিখত। তাদের কাছ থেকে এদেশের কিছু কিছু মানুষও শিখেছিল এই ভাষা। কিন্তু এই ভাষা বেশিদিন তার অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেনি। ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। সেই সময়ের তৈরি কিছু পাত্রে এই ভাষা দেখতে পাওয়া যায়।

জাহ্নবীর জানার আগ্রহের শেষ নেই। সে অনেক ফলক বা মূর্তি এখানে দেখেছে, যেগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে বল্লভকে প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আজ মনস্থির করে এসেছে যে সব কিছু জেনে নেবে।

সে বলে—আপনার আর অন্যের তৈরি ফলকের মাথার দিকে একটা করে ছিদ্র থাকে। আমি তাতে সুতো বেঁধে দেওয়ালে টাঙাতে চেষ্টা করে পারিনি। অনেক ফলক এত ভারী যে ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। আবার অনেক ফলকের ছিদ্র একেবারে প্রান্তদেশে। এমন কেন?

বল্লভ বলে—সংস্কারের বশবর্তী হয়েই অনেকটা এই রীতি চালু হয়েছে। ফলক নির্মাণের শেষে একটা ছিদ্র করে দেওয়া হয়। আগে হয়ত টাঙানোর জন্য করা হত। কিন্তু অনেক ফলক এত ভারী হয় যে এই ছিদ্রের কোন অর্থ থাকে না। তবু বংশ-পরম্পরায় এই অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। ওটা করে দিলে বোঝা গেল যে কাজ শেষ হল।

—সুন্দর সব মৃন্ময় দ্রব্য। ওই যে চক্রযুক্ত মেষ, ডানা সমেত হস্তী, মেষ-বাহিত রথ, পুরুষ আর নারীর কত সুন্দর আর বৈচিত্র্যময় শীর্ষভূষণ, সবই কী আপনার কল্পনা?

বল্লভ হেসে বলে—কল্পনা তো বটেই। তবে একেবারে সম্পর্কহীন নয়। কিছুটা পৌরাণিক আর কিছুটা বাস্তবও রয়েছে। পৌরাণিক গল্প যদি শোনেন, আমরা যেমন শুনতাম সে সবে তখন চোখের সামনে এইরকমই ফুটে উঠত। যাঁরা বলতেন তাঁরা এইভাবেই বলতেন, এখনো বলেন। আমাদের মহারাজের শিরোভূষণ দেখেছেন?

—না।

—মহারানীকে বলে দেখে নেবেন। তাছাড়া দেব-দেবীর সর্বাঙ্গের অলঙ্কার অন্যরকম হবেই। তাঁরা তো পৃথিবীর প্রাণী নন।

—এই মূর্তিগুলির প্রয়োজন কি গৃহসজ্জাতেই শেষ হয়ে যায়?

না, অনেক মূর্তি, অনেক ফলক রয়েছে যা দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে মানুষে তার কাছে রাখে। তাছাড়া ইষ্টক দিয়ে অট্টালিকা নির্মাণ যখন শুরু হবে তখন ছাঁচ দিয়ে এই ধরনের মূর্তি গড়ে পুড়িয়ে নিয়ে অট্টালিকার বহিরঙ্গের শোভাবর্ধনের ইচ্ছা রয়েছে আমার। বণিক চিত্রাক্ষ আমার সহায় হলে আমি অবশ্যই পারব। কত ইচ্ছাই রয়েছে। আপনি ভাবছেন, আমার পাগলামি।

জাহ্নবীর স্নিগ্ধ চাহনিতে ভালবাসার আবেগ। সে বলে—আমি আপনাকে আপনার চেয়েও বিশ্বাস বেশি করি।

কথাটা বলেই সে চুপ করে যায়। বুঝতে পারে মনের এক দুর্বল মুহূর্তে কথাটা বলে ফেলেছে। বল্লভ তার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাতে জাহ্নবী বলে—আচ্ছা এই নারীমূর্তিটি কার?

—যক্ষের স্ত্রী হরিতির।

—আর এই মূর্তিটি পুরুষের, অথচ উদর এত স্ফীত।

—হ্যাঁ, পুরুষের বলতে পারেন। এক গণ্ডুষে অনেকখানি পান করার ক্ষমতা রয়েছে এঁর। অনেক ক্ষেত্রে উদরের চেয়ে গর্ভও বলা যেতে পারে। কারণ এর মধ্যে উৎপাদনশীলতার অর্থও নিহিত রয়েছে। যক্ষ সবার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দেবতা। তিনিই সব কিছু দেন। আর এই যে নারীমূর্তি দেখছেন, মুদ্রা বিতরণ করছেন, ইনি বরদা-লক্ষ্মী। শ্রী দেবীরই আর এক রূপ।

বেলা পড়ে আসে। জাহ্নবী জানে বল্লভের খেয়াল নেই। কারণ সে সচেতন থাকলে এতক্ষণ কখনই থাকতে দিত না। সে একজন অতি আগ্রহী শ্রোতা পেয়ে আনন্দবিহ্বল। কিন্তু শুধু কি তাই? জাহ্নবী বলতে পারে না। শুধু এক এক সময় মনে হয় বল্লভের ওই ঘর্মাক্ত মুখখানি মুছিয়ে দেয়।

কিন্তু আর অপেক্ষা করা চলবে না। তাই যে ফলকটি এতক্ষণ সযত্নে একপাশে সরিয়ে রেখেছিল সেটি বল্লভের সামনে এগিয়ে দেয় কোন কথা না বলে।

বল্লভ সেটি দেখে একটু দ্বিধাবোধ করে। বলে—আপনি আমার কাছে শিখতে এসেছেন তো?

—হুঁ।

—আমি তাহলে আপনার আচার্য।

—অবশ্যই। আচার্যের চেয়েও যদি বেশি কিছু থেকে থাকে পৃথিবীতে, তাহলে আপনি তাই।

বল্লভ বলে—আপনি এই ফলকটি নিশ্চয় ভাল করে দেখে নিয়েছেন।

—হ্যাঁ।

—এই ফলকটি একজন অতি সুন্দরী নারীমূর্তির। ইনি শায়িত অবস্থায় রয়েছেন। আর পদদ্বয় দুই পাশে প্রসারিত। স্বাভাবিক শয়নের অবস্থায় নয়। পদদ্বয়ের মধ্যে এত ব্যবধান

থাকে না। প্রসবের পূর্ব-মুহূর্তের রমণী ইনি। লক্ষ্য করে থাকবেন ফলকটি ক্ষুদ্র। গর্ভবতী রমণীরা এই ফলক সঙ্গে রাখে প্রসব বেদনা যাতে সহনীয় হয়। এই দেবীর নাম "অদিতি উত্থানপদ" বা "লজ্জা গৌরী।"

সন্ধ্যা হয়ে আসে। এতক্ষণ বল্লভ সচেতন হয়। সে বলে ওঠে— সূর্য ডুবে গিয়েছে যে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

জাহ্নবীর তন্ময়তা কাটে। সে বলে—হ্যাঁ, আমি উঠি। আবার আসব।

—এলে অনেক আগে আসবেন। তবে আর তো কিছু জানার নেই আপনার।

একটু হেসে জাহ্নবী বলে—আছে, আপনি জানেন না।

সে দ্রুতপদে চলতে থাকে। মহারানী তাকে অসময়ে বাইরে থেকে আসতে দেখে সখী বলে ক্ষমা করবেন না। কথা শুনিয়ে দেবেন। সে অবশ্য নীরব থাকবে। এই মুহূর্তে বল্লভ তার মন জুড়ে রয়েছে। সেই আনন্দ আর একটু সময় সে একা একা অনুভব করতে চায়। এমন একজন মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অন্তত সে এই প্রথম দেখল। সামনে একজন তরুণীকে দীর্ঘসময় দেখেও তার মনে কোন চাঞ্চল্য নেই। আপন মনে যতটুকু জানে খুবই আন্তরিকভাবে বলে দেয়।

পরদিন মাহুত শিতিকণ্ঠ সাতসকালে মন্দারকে নিয়ে উপস্থিত হয়। বল্লভ প্রতিদিনই প্রত্যুষে ওঠে। তাতে কাজের অনেক বেশি সময় পাওয়া যায়। মাহুতকে দেখে যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তার প্রাতরাশ করা হয়নি। আগের রাতের জল দিয়ে রাখা ভাত ছিল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় গুণবানের কথা। সে আবার একটু ঢিলেঢালা প্রকৃতির মানুষ। তবে পুস্তক নিয়ে বসলে তার সময়ের জ্ঞান থাকে না। স্নানাহার বিস্মৃত হয়।

তাড়াতাড়ি গুণবানের গৃহের দিকে যায় সে। যাওয়ার সময় দেখে মন্দার একটি কণ্টকাকীর্ণ বাবলাগাছের শাখাকে ধরাশায়ী করেছে। ওরা কি কাঁটা গাছ খায়? নাকি অভ্যাস? ভাবতে ভাবতে গিয়ে দেখে গুণবান প্রস্তুত।

—একি, তুমি প্রস্তুত?

গুণবান হেসে বলে—হ্যাঁ।

গুণবানের কিশোরী বধূ রয়েছে। নাম তার দোপাটি। সদ্য বিবাহিত দম্পতি এরা। সেই কিশোরী পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলে না। বলতে চায় না। তবে সে বল্লভকে সেই শ্রেণীতে ফেলে না। মানুষটাকে সে এই অল্প সময়ের মধ্যে চিনে ফেলেছে। তার স্বামীর সমবয়সী হলেও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান দেয়। প্রয়োজন হলে বল্লভের সাহায্য প্রার্থনা করে। বল্লভও তাকে স্নেহ করে। ওদের গ্রাম অনেক দূরে। হেঁটে যেতে একদিন শেষ হয়ে যায়। দোপাটির মা-বাবা বৃদ্ধ। এত দীর্ঘ হাঁটাপথে মেয়েকে দেখতে আসতে পারে না। কোন ভাই নেই। একটি ছোট বোন রয়েছে। তাই গুণবানের ভরসায় থাকতে হয় পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য। মন উতলা হলেও গুণবান এক এক সময় যেতে চায় না। তখন বল্লভের শরণাপন্ন হয় নববধূ। সে জানে বল্লভের কথা ফেলতে পারে না তার স্বামী। বল্লভ তাকে একটা নতুন ধরনের যক্ষিণী, এটা কুবের আর একটা মিথুন মূর্তি তৈরি করে দিয়েছে। কী সুন্দর। সে কত সময় সেগুলোর দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থেকেছে। এমন সৃষ্টি এই মানুষটাই তো করে। তাকে সে শ্রদ্ধা করে।

আজ গুণবানকে প্রস্তুত দেখে বল্লভ বিস্মিত হয়। সে বলে ওঠে—আশ্চর্য।

গুণবান কৃতিত্বের হাসি হাসে। তখন দোপাটি বলে ওঠে—আপনার সঙ্গে হাতীতে বেড়াতে যাবে বলে ও সারারাত ঘুমোয়নি। একটু পরে পরে আমাকে ঠেলা দিয়ে বলে উঠেছে—মন্দার এলো না? শব্দ শুনলাম।

বল্লভ গম্ভীর হয়ে বলে—এর বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে।

গুণবান বউ-এর ওপর চটে গিয়ে বলে—ওর কথা শুনো না তো? আমি আর ওকে বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে পারব না।

—ঠিক আছে। আমি নিয়ে যাব তাহলে। এখন চলতো।

গুণবানের কুটির থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে গিয়ে কিশোরীকে দ্বারে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বল্লভের মনের ভেতরে কেমন করে ওঠে। সে গুণবানকে বলে—তোমার শ্বশুরবাড়ি কতদূর?

—অনেক দূর।

বল্লভ তখন কিশোরীর দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে—তোমার মা-বাবাকে কোন সংবাদ পাঠাতে চাও?

কিশোরীর মুখ মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে বলে—মাকে বলতে হবে, তার জন্য একটা কাঁথা করছি, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবারে যখন যাব নিয়ে যাব।

—বলব। জেনে আসব ওঁরা কেমন আছেন।

কৃতজ্ঞতায় কিশোরীর নয়নদ্বয় সজল হয়ে ওঠে।

গুণবান বল্লভের কথা শুনল। দোপাটির ঝলমলে মুখ দেখল। বাইরে এসে বিমর্ষ কণ্ঠে বলে—আমি বোধহয় স্বামী হওয়ার উপযুক্ত নই।

—তুমি উপযুক্ত না হলে কে হবে? গঙ্গারিদিতে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখাও তো? ওকে দেখে বুঝতে পারনা তোমাকে কত ভালবাসে?

মন্দার মহাখুশি। প্রথমে সে ভেবেছিল বুঝি নগরীর ভেতরে ঘুরে বেড়াবে। তারপর যখন দেখল নগরীর বেষ্টনী পার হয়ে তাকে অন্যপথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন চলার তালে তালে ওর শুঁড় দোলাতে থাকে।

শিতিকণ্ঠ গুণবানের শ্বশুরবাড়ির পথ না চিনলেও গুণবান চিনিয়ে নিয়ে চলে। নদীর ধার দিয়ে কিছুক্ষণ চলার পরে একটা বিশাল অনুর্বর প্রান্তর অতিক্রম করল তারা। সারা মাঠ ধূধূ করছে। গাছপালার নাম-গন্ধ নেই। যেটুকু সবুজের স্পর্শ রয়েছে তাও লালচে রঙের।

বল্লভ বলে ওঠে—প্রকৃতির আর এক রূপ। রুক্ষ সুন্দর। প্রান্তহীন প্রান্তর।

গুণবান বলে ওঠে—ভাল বলেছ। আমারও ভাল লাগছে। তবে গ্রীষ্মকালে বড় কষ্ট দেয়। অথচ সামনে আর পেছনে ঘন বন। এখান থেকে চারদিকে চেয়ে দেখ একটাও গাছ দেখতে পাবে না কোনদিকে। কেন এমন হল কে জানে। যেবারে ধান হল না, গমের ফলনও হল না, কলাগাছ নষ্ট হয়ে গেল, সেবারে এই প্রান্তরে পথিকদের কাছ থেকে অনেক কিছু ছিনিয়ে নিত দুর্বৃত্তেরা। তাছাড়া অপদেবতা? কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে এই পথে চলতে পথিকদের গা ছম্‌ছম্ করে। অনেক কিছু দেখতে পায় অনেকে। আবার ফটফটে চাঁদের আলোতেও নাকি দেখা যায় সেইসব।

বল্লভ প্রশ্ন করে—কী দেখতে পায়?

—আমি কী করে বলব? আমি তো দেখিনি। লোকে বলে, তাই শুনে যাই।

—এই সব নির্জন স্থানে লোকে দেবদেবীর দেখা পায় না কেন গুণবান? যেমন ধর শিব, কুবের, শ্রী এইসব দেবদেবী?

গুণবান বন্ধুর কথা শুনে যেন উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে—ঠিক, ঠিক বলেছ বল্লভ। কখনো তো শুনিনি যে শিবঠাকুর, কিংবা ব্রহ্মা শ্রী যক্ষিণীকে দেখেছে কোন লোক? তুমি ঠিক বলেছ।

চলতে চলতে দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ওরা গুণবানের শ্বশুরালয়ে পৌঁছে যায়। গ্রামের লোকেরা ছুটে আসে। রাজার বাড়ির হস্তীর যে বিশেষ সাজ রয়েছে অনেকে তা জানে। মন্দারকে গুণবানের শ্বশুরবাড়ির সামনে থামতে দেখে ওরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়। বৃদ্ধবৃদ্ধা অবিবাহিত কন্যাকে নিয়ে থাকে এখানে। গ্রামবাসী সময়ে অসময়ে তাদের দেখাশোনা করে। এখানে রাজবাড়ির হাতি?

তারপরে তারা ওই বাড়ির জামাতাকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করতে দেখে নির্বাক হয়ে যায়। গুণবানের শ্বশুরও হস্তীটিকে দেখেছে। বুঝেছে রাজবাড়ির হাতী। ভেবেছিল কোন কারণে সেটিকে থামানো হয়েছে। কিন্তু নিজের জামাতাকে নামতে দেখে সে কী করবে বুঝে উঠতে পারে না। দিশেহারা হয়ে যায়।

গুণবান শ্বশুর মহাশয়ের পদধূলি নিয়ে সবার কুশল জানতে চায়। শ্বশুর সেকথায় কান না দিয়ে প্রশ্ন করে—রাজার হাতি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তোমাকে নিয়ে এল?

—ওই যে আমার বন্ধু দাঁড়িয়ে রয়েছে ওর কাছে মহারাজ পাঠিয়েছেন। আমি ওর সঙ্গে এসেছি। আপনার মেয়ে আপনাদের সংবাদ না পেয়ে চিন্তিত। তাই এসেছি।

—আমার মেয়ের কথায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আহা! আমার মেয়ের কী সৌভাগ্য। কিন্তু তোমাদের খাওয়া-দাওয়া?

—হবে কোনরকমে। ভাববেন না।

—তাই কি হয়? সবাইকে নিয়ে ভেতরে এসো। আজ আমার মহা আনন্দের দিন। শুধু আমার নয়, সমস্ত গ্রামবাসীর বড় গর্বের দিন আজ।

—এই অবেলায় আপনি কী আয়োজন করবেন!

—সবই হবে।

কয়েকজন গ্রামবাসী ওদের কথোপকথন শুনছিল। তারা এগিয়ে এসে বলে—আপনাদের কোন চিন্তা নেই। আমরা সবাই মিলে আপনাদের আহারের আয়োজন করে দিচ্ছি। আপনারা দাওয়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিন।

ওরা নিজেরা একটা শীতলপাটি এনে বিছিয়ে দেয়।

বল্লভ এগিয়ে আসে। শিতিকণ্ঠও আসে গুণবানের ডাকে।

শিতিকণ্ঠ বলে—মন্দার?

গ্রামবাসীরা সব শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে বড় বড় পাত্রে জল নিয়ে আসে। দুটো ছোট কলাগাছ আসে। একজন হাসতে হাসতে এক কাঁদি কলা নিয়ে আসে। মন্দারের সমস্যা মুহূর্তেই মিটে গেল। শিতিকণ্ঠ নিশ্চিন্ত।

দোপাটির ছোটবোন সঙ্কোচে আড়ালে ছিল। সে এবং তার মা কোন কথা বলছিল না। কিন্তু সবই উপভোগ করছিল। বল্লভ বালিকাটিকে কাছে ডাকে। সে এগিয়ে এলে বল্লভ বলে—তোমার দিদি একা একা থাকে। তুমি গেলে তার খুব আনন্দ হবে।

মেয়েটি তার বাবার দিকে তাকায়। বৃদ্ধ বলে—এবারে যখন যাব ওদের নিয়ে যাব।

বল্লভ বুঝতে পারে না বৃদ্ধের মেয়ে দুটি এত কম বয়সের কেন। ওদের মাকে দেখে তো মনে হয় না দ্বিতীয় পক্ষ।

তিনজন পাশপাশি খেতে বসে। গ্রামের যারা এসেছে তারা বাইরে অপেক্ষা করে। গুণবানের শাশুড়ী অদূরে বসে দেখাশোনা করে। তখন গুণবাণ তাকে বলে—আপনার কন্যা বলেছে আপনার জন্য একটা কাঁথা সেলাই করছে। এবারে যখন আসবে নিয়ে আসবে। সে ভালই আছে। আপনারা কেমন আছেন জানতে চেয়েছে।

—আমরা ভাল আছি। আমাদের গ্রামের সবাই ভাল আছে। এবারে শস্য খুব ভাল হয়েছে। ও যেন আমাদের জন্য না ভাবে।

আহারের পরে বিশ্রাম নেয় ওরা। গ্রামবাসীরা ঘিরে ধরে নানা প্রশ্ন করে। রাজপুরী সম্বন্ধে তাদের অদম্য কৌতূহল। রাজার দ্বিতীয় রানী কবে আসবেন। প্রথম রানীর সন্তান হচ্ছে না বলেই কি দ্বিতীয় বিবাহ? সহস্র প্রশ্ন। এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সাধ্যাতীত। অথচ কারও মনে আঘাত না দিয়ে সব প্রশ্নের কিছু না কিছু উত্তর দিতেই হয়।

এরপরে ওরা সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার মন্দারের পিঠে বসে। গ্রামবাসীরা ভেঙে পড়ে। গুণবান না দেখলেও বল্লভ লক্ষ করেছে বালিকাটি অশ্রুবিসর্জন করছে। তার মায়ের নয়নও শুষ্ক ছিল না। গুণবান আসাতে একজন ভগিনীর সান্নিধ্য, অপরজন কন্যার স্পর্শ অনুভব করছিল এতক্ষণ। এখন আবার বিচ্ছেদ-বেদনা।

প্রত্যাবর্তনের পথ চলতে চলতে আবার সেই প্রান্তর। তখন সূর্য রক্তবর্ণ। মাহুত কপালের উপর হাত রেখে দিকচক্রবালের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—মাহারাজা বলে মনে হচ্ছে না?

বল্লভ আর গুণবান একসঙ্গে বলে ওঠেই কোথায় তিনি?

মাহুত ভীত কণ্ঠে বলে ওঠে—এদিকেই আসছেন। হ্যাঁ, তাঁর পেছনে অচঞ্চল।

শিতিকণ্ঠের ভয়, সে যে মন্দারের ছটফটানি দেখে নিজের দায়ে বল্লভকে নিয়ে এসেছে একথা বলেনি। তবে অচঞ্চল নিশ্চয় বলেছে। তবু কর্তব্য পালন ঠিকভাবে করা হয়নি।

ওরাও মহারাজকে দেখল। মন্দারের ভাবভঙ্গি দেখে আরও স্পষ্ট হল। সে থেমে গিয়ে একবার ডেকে উঠল। মহারাজ এসে অশ্ব থেকে অবতরণ করে কারও সঙ্গে কথা না বলে প্রথমেই মন্দারের কাছে গিয়ে তার শুঁড়ে হাত বোলাতে থাকেন। মন্দার মহারাজের স্পর্শে এতটুকুও সাড়া দেয় না। সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে অশ্বটির দিকে। একটা বিদ্বেষপূর্ণ চাহনি। শিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি সেখানে মন্দারকে বসায়।

মহারাজ বল্লভের দিকে চেয়ে হেসে বলেন—তুমি তাহলে মাঝে মাঝে হাতীতে চেপে বেড়াও। খুব ভাল।

—আমি এই নিয়ে দুদিন এলাম। প্রথমবার আপনি সঙ্গে ছিলেন।

—তাই নাকি! এটা ঠিক হয়নি। তোমার আরও ঘোরা উচিত।

শিতিকণ্ঠ বলে—উনি ঘুরতে চান না মহারাজ। আমি মন্দারের মতিগতি দেখে এই আয়োজন করেছি। মন্দার আপনাকে দেখতে না পেয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমি ভীত হয়েছিলাম। তাই বাধ্য হয়ে এঁকে নিয়ে আসার আয়োজন করেছি। আমি তো জানি আপনার অনুমতি রয়েছে।

—খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি। তুমি যা ভাল বুঝবে করবে। অচঞ্চল অবশ্য আমাকে বলেছিল, বল্লভের কাছে মন্দারকে পাঠানো হবে। আমার ধারণা ছিল কালিনীকে বোধহয় পাঠানো হয়। গুণমানও রয়েছে। রাজধানীর দুই রত্ন এখানে। রাজধানী তাহলে অন্ধকার হয়ে রয়েছে।

গুণবান বিষম খেয়ে বলে—আমি অত উঁচুদরের নই মহারাজ। আমি সৃষ্টি করি না। বল্লভের কথা স্বতন্ত্র।

—তুমি ভাষা বিশারদ। তুমি জ্ঞানী।

গুণবান আর কিছু বলে না। ভাবে, বাচালতা প্রকাশ পাবে।

—তোমাদের দেখে সত্যি খুব ভাল লাগল। ভাবছি এবার থেকে মাঝে মাঝে বসে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আবার একথাও জানি তোমরা ব্যস্ত থাক। আমার কাছে আসার বাধ্যবাধকতায় তোমাদের অসুবিধা হবে। তবে একথা জানিয়ে রাখছি, যেকোন সময়ে প্রয়োজন হলে তোমরা আমার কাছে আসতে পার।

বল্লভ বলে—প্রয়োজন হলে আমরা অবশ্যই যাব।

সূর্য পশ্চিম গগনে আরও নীচের দিকে নেমে যায়। অচঞ্চল এতক্ষণ মহারাজের অশ্বের পাশে নিজের অশ্বটি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে তাঁদের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিল না। তার চিন্তা অন্য। ফিরতে সন্ধ্যা ঘোর হয়ে যাবে।

সেই সময় মহারাজা মন্দারের শুঁড়ে এবং গায়ে হাত বুলিয়ে অশ্বের কাছে এসে তাতে আরোহণ করেন। মন্দার সেদিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। শিতিকণ্ঠ আবার যখন তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে তখন সে ছুটতে থাকে। শিতিকণ্ঠের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বসে। মন্দার বোধহয় প্রমাণ করতে চায় সে অশ্বের চেয়েও দ্রুতগামী।

প্রান্তরটি প্রকাণ্ড বলেই কোন গ্রামের মধ্যে প্রবেশের পূর্বেই মন্দারকে সংযত করা সম্ভব হল। নইলে অঘটন ঘটতে পারত।

তাম্রলিপ্তরাজের দ্বিতীয়া কন্যা উর্মিলার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ পাকা করতে রাজমাতা অম্বিকা সচেষ্ট হলেন। এবার তো দূরের পথ নয়। ঘরের কাছের রাজ্য।

তাম্রলিপ্ত থেকে নদীপথেও আসা যায়। কিন্তু অনেক ঘোরাপথে, অন্য নদীর শাখা প্রশাখা দিয়ে আসতে হয়। বৃহদাকার জলযানে নববিবাহিতা বধূকে নিয়ে এভাবে আসা সম্ভব হবে না। অনেকক্ষেত্রে যাত্রাপথ নিরাপদও নয়। সঙ্গে সেনাদল থাকলেও বন্য জন্তুর উপদ্রব রয়েছে। তাই ঠিক হল বলীবর্দ শকটে আনা হবে নতুন রাণীকে। সৈন্য-পরিবেষ্টিত হয়ে অনেক শকট যাবে সঙ্গে।

মহারাজা বলেন—হাতি কী দোষ করল?

রাজমাতা বলেন—সঙ্গে হাতি অবশ্যই থাকবে। তবে আমার অভিজ্ঞতা হল হাতিতে

দীর্ঘপথ আসতে কিছু অসুবিধা রয়েছে। শকটে ঝাঁকুনি লাগলেও অনেক আরামপ্রদ। যখন তখন শোয়া যায়। নামা যায়। অন্য শকটে পরিচারিকারা থাকে, তাদের সাহায্য নেওয়া যায়। ইচ্ছে করলে তাদের এনে নিজের শকটের সামনে বসতে দেওয়া যায়।

চন্দ্রকেতু বলেন—আমার কিছুতে আপত্তি নেই। একমাত্র আপত্তি এবারে আমাকে নিজে গিয়ে বিবাহ করতে হবে বলে। আমার সবচেয়ে সুবিধা হল অশ্বে গিয়ে ওইভাবেই ও-দেশের রাজকন্যাকে নিয়ে আসা। সময় অনেক বাঁচবে।

মাতা অম্বিকা হেসে বলেন—আমার আপত্তি নেই। যিনি তোমার সঙ্গে আসবেন তিনি কি এত ধকল সহ্য করতে পারবেন? কিংবা তাঁর পিতামাতা, প্রজাকুল তাতে কি সম্মতি দেবে? চন্দ্রকেতুগড়ের কোন রাজকন্যাকে সেইভাবে কোন রাজা নিয়ে যেতে চাইলে প্রজারা কি আপত্তি জানাতো না?

চন্দ্রকেতু একথার উত্তর দেন না। রাজমাতা ভাবেন, পুত্র বোধহয় ইতিমধ্যেই নতুন রানীকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তবে তিনি সত্যই মহারাজকে সঙ্গে অশ্ব নিয়ে যেতে বললেন। একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে মাঝে তিনি অচঞ্চলকে সঙ্গে নিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে আগেভাগে গিয়ে পরবর্তী বিশ্রামস্থল নির্দিষ্ট করে রাখতে পারবেন।

প্রথম রানী যখন এসেছিলেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে নদীতীরে অজস্র মানুষের সমাবেশ হলেও আসার পথে কেউ দাঁড়িয়ে থাকেনি। কারণ তিনি এসেছিলেন নদীপথে। কিন্তু এবারে মহারাজা স্বয়ং চললেন তাম্রলিপ্তের উদ্দেশে নতুন রানীকে আনতে এবং তিনি চললেন স্থলপথে। তাই পথিপার্শ্বে বহু মানুষ তাদের মহারাজাকে শুভকামনা জানাতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো। ওরা শুনেছে মহারাজা অন্তত পনেরো কুড়িদিন রাজ্য ছেড়ে থাকবেন। রাজ্যে মহারাজা অনুপস্থিত এই কথা মানসিকভাবে মেনে নিতে তাদের কষ্টবোধ হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু তার পরবর্তী কথা ভেবে আনন্দিত হয়।

ওদিকে রাজ-অন্তঃপুরে রানী দেবযানী বিষণ্ণ। মহারাজের রাজপুরী ত্যাগের দৃশ্য তিনি গোপনে বাতায়নপথে দেখেছেন। তখন থেকেই তাঁর মনের মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এতদিনে মানুষটাকে যেভাবে দেখেছেন সহসা তার পরিবর্তন ঘটেছে। মহারাজের পাশাপাশি নিজের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রেখে মনে মনে মিলিয়ে তিনি প্রথম উপলব্ধি করলেন যে শতানীক তাঁর চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ। তিনি একথাও বুঝলেন যে এবার থেকে রানী রূপে তাঁর গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়ে গেল। তিনি এবং নবাগতা রানীর মধ্যে কে পাটরানী রূপে গণ্য হবেন সেটা মহারাজের ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। এই সব ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যা এগিয়ে আসে, আলো কমে যায়। রাজপ্রাসাদ আজ রাজাশূন্য। একটা ভীতিভাব তাঁকে গ্রাস করতে চায়। তিনি চিৎকার করে ওঠেন—জাহ্নবী।

জাহ্নবী আজও বল্লভের কুটিরে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে বল্লভের কুটির থেকে ফিরে এলেও মহারানীর কক্ষের কাছে আসেনি। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে নিজের গৃহ থেকে কিছু মুখে দিয়ে সবে বের হয়েছে রানীর কাছে আসবে বলে। তাই দেবযানীর চিৎকার শুনে পৃথা ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসল।

দেবযানী জ্বলে ওঠেন—জাহ্নবী কোথায়?

—একটু পরেই আসবে।

—কোথায় গিয়েছে?

—আমাকে তো বলে যায়নি।

—তুমি যাও। জাহ্নবী আসলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে তাকে।

—আমি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।

—না। প্রয়োজন নেই। এখনি যাও।

পৃথা দিবাবসানের স্বল্প আলোয় মুখবিকৃতি করে ভাবে– জাহ্নবীটা একে যাদু করেছে। সব কাজ করে মিষ্টি কথা, বলেও একে ভোলানো যাবে না। নিজে রাক্ষসী কিনা তাই ভাব হয়েছে এক দুশ্চরিত্রার সঙ্গে। যেন প্রাণের সখী দুইজনে।

পৃথা বাইরে আসতেই জাহ্নবীকে দেখতে পায়। তার হাতে একটি থলি। ডেকে বলে—ভেতরে যাও। খেপে আছেন তোমার ওপর।

জাহ্নবী স্বাভাবিক হেসে বলে—তাই নাকি?

পৃথা সে কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। ভাবে সবসময় পরপুরুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। নিশ্চয় কারও স্পর্শের মাদকতা এখনো কাটেনি। তাই মুখে হাসি।

জাহ্নবী ভেতরে প্রবেশের পরে সে কান পেতে থাকে। শুনতে পায় মহারানীর চিৎকার। ভাবে, বেশ হয়েছে। কিন্তু সেই একবারই। তার পরে আর কোন সাড়া পাওয়া যায় না। হতাশ হয়ে সে তার নির্দিষ্ট আসনে বসে। একসময় সুহস্তের চিন্তা তাকে অন্যমনস্ক করে ফেলে। তারপর সেই অবস্থাতেই অজানিত ভাবে পেছনে হাত বাড়িয়ে একটা ক্ষুদ্র মধুভাণ্ডে আঙুল চুবিয়ে চুষতে থাকে।

ওদিকে জাহ্নবী দেবযানীর ধমকে যতটা না ভীত, তার চেয়ে বেশি আতঙ্কিত তার চোখ-মুখের অস্বাভাবিকতায়।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—তোমাকে তো কিছু গোপন করিনা। বল্লভের কাছে।

—হাতে ওটা কী?

—উনি কয়েকটা হাতির দাঁতের আর মাটির দ্রব্য দিয়েছেন।

—চেয়ে নিয়েছ?

—না। তাছাড়া উনি হাতির দাঁতের কাজ বেশি করেন না। তবু দেখ কী সুন্দর। অঞ্জন শলাকা। তুমি যে সব পেয়েছ তার চেয়ে অন্যরকম।

—ওই মাটির ঘটগুলো কিসের?

—এর মধ্যে ধান ভর্তি করে মাটির প্রলেপ দিয়ে বন্ধ করে শ্রী কিংবা যক্ষিণীর পূজা করা হয়। দেশে শস্যের ফলন ভাল হয়।

—এসব তোমার ছল। তুমি ওই লোকটাকে ভালবাসো। নইলে এতবার যেতে না।

—আমি ভালবাসলেই বা কি এসে যায় তাঁর?

—তার অর্থ?

—এসব ওঁর মাথায় নেই। সব পুরুষ একরকম হয় না মহারানী। কয়েকজন দলছাড়া পুরুষও রয়েছে পৃথিবীতে।

—আমি জানি। বিশেষ করে এই দেশে। তোমার চেয়ে ভালই জানি।

জাহ্নবী দেবযানীর দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে। মহারানীর মুখে অন্যধরনের কথা। তাঁর

আতঙ্ক কিন্তু এত কথার পরেও কাটেনি।

—কী হয়েছে তোমার?

দেবযানী বলে—আমার ভীষণ একা একা লাগছে। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। কে যেন আমাকে হত্যা করতে চাইছে। আমি আর বাঁচব না বোধহয় জাহ্নবী।

জাহ্নবী দেবযানীর পাশে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বলে—মহারাজা চলে গিয়েছেন বলে অমন মনে হচ্ছে। কালই ঠিক হয়ে যাবে। উনি তো কোথাও যান না বেশিদিনের জন্য। মাঝে মাঝে শুধু মৃগয়ায় যান। কিন্তু তোমার তো এমন হওয়ার কথা নয়।

—আমার মনে হচ্ছে আমি হেরে গেলাম।

—সেই কথাই বল। আমি ভেবেছিলাম তুমি এতদিনে বুঝতে পেরেছ যে মহারাজাকে তুমি ভালবাস।

—ঠিক জানিনা। তবে তিনি যে উন্নত মনের পুরুষ এটা বুঝতে পেরেছি। আজ প্রথম বুঝেছি ওঁর প্রতি আমার ঘৃণা নেই।

—বড় দেরিতে দেবযানী, বড়ই দেরিতে।

—না। তুমি ভেবো না আমি কোনোদিন তাঁকে প্রেম নিবেদন করতাম। উজ্জয়িনী আর গঙ্গে কখনো এক শ্রেণীতে পড়ে না।

জাহ্নবীর মন খারাপ হয়ে যায়। সে বলে—তাহলে তো ঠিকই আছে। মহারাজা রানী আনতে গিয়ে ঠিক কাজ করেছেন। তোমার আজকের কথা শুনে আমি তাঁর নতুন রানী আনা সমর্থন করছি। তিনি যেন জীবনে সুখের মুখ দেখেন, যা তোমাকে এনে পাননি।

মহারাজা ফিরছেন। নতুন রাণীকে নিয়ে ফিরছেন। রাজ্যে সাড়া পড়ে যায়। পথে ঘাটে মানুষের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। সবাই ভাবে এখনি বুঝি আসছেন। কিন্তু তা তো নয়। তিনি সবে নিজের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। প্রজারা ভীড় করছে। তাতে শকটের গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। একজন সৈন্য প্রজাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজে সেই প্রজার কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে দুঃখ প্রকাশ করায় সে হতবাক। আশেপাশের সবাই মহারাজকে সাক্ষাৎ দেবতা ভেবে প্রণাম করতে শুরু করে। সেও আর এক বিপদ। যার প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা হয়েছিল সে তো আনন্দে আত্মহারা। ভাগ্যিস প্রহরী অমন করেছিল নইলে মহারাজের স্পর্শ লাভ হত না। সেই প্রহরীকে কাছে পেলে মাথায় তুলে নাচত।

চন্দ্রকেতু নিজে অশ্বারূঢ় হয়ে সবার আগে চলতে থাকেন। ঘন ঘন জয়ধ্বনি ওঠে। রানী উর্মিলার সঙ্গে এসেছেন তাঁর প্রিয় সখী চন্দ্রমুখী। তাকে মহারাজা নিজেই বলেছেন দিনের বেলায় রানীর সঙ্গে শকটে থাকতে। তবে পথিমধ্যে রাত্রে বিশ্রামকালে পট্টাবাসে মহারাজ নিজে রানীর কাছে থাকবেন বলে গিয়েছেন।

প্রথম রাত্রের এই অস্থায়ী অসুবিধাজনক শয্যায় নতুন রানীর সঙ্গ পেয়ে মহারাজা হৃদয়ঙ্গম করেছেন এতদিনে তিনি জীবনে প্রকৃত নারী-রত্ন পেয়েছেন। তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন প্রথম রজনীতে। নিজেই এতদিন জানতে পারেননি যে তাঁর ভেতরে এমন একটি প্রাণোচ্ছল পুরুষ লুকিয়ে রয়েছে। উর্মিলা শুধু ভাবছিলেন, তিনি বোধহয় স্বপ্ন দেখছেন। গঙ্গারিদির রাজার কথা সবাই তাঁর কাছে বলাবলি করত। তার প্রতিক্রিয়া বোধহয় স্বপ্ন

হয়ে দেখা দিয়েছে। জীবন যে এত মধুর হতে পারে তিনি কখনো কল্পনা করেননি। কিন্তু পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে মহারাজা যখন রানীর নিকট থেকে বিদায় চাইলেন, তিনি বুঝলেন, স্বপ্ন নয়, সবই সত্য। চন্দ্রমুখী বাইরে অপেক্ষা করছিল। মহারাজা চলে গেলে সে পট্টাবাসে প্রবেশ করে। কারণ রানীকে প্রস্তুত করতে হবে সারাদিনের যাত্রারম্ভের পূর্বে। মহারাজা চন্দ্রকেতু নতুনশক্তিতে সঞ্জীবিত। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে আত্মশক্তির প্রকাশ।

নিজের রাজ্যসীমায় প্রবেশের পর থেকে প্রজাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে ভেসে চলেন তিনি। এই সব পথে কত এসেছেন তিনি। মন্দার তাঁকে নিয়ে আসত। মন্দারের কথা মনে হতেই বল্লভ আর গুণবানের কথা মনে পড়ল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মন্দারের মনে অভিমান আছে তাঁর প্রতি। এবারে উর্মিলা এসেছেন, এখন তিনি নিশ্চিন্ত। নারীজাতিকে তিনি চিনতে পেরেছেন। এবারে নিশ্চিন্তে সব কিছু শৃঙ্খলার সঙ্গে করতে পারবেন। তাঁর মনের মধ্যে যেন কালবৈশাখীর ঝড় বইছিল। মন্দার অবহেলিত থাকবে না। তিনি তাঁর রাজসভায় গুণিজনদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে দেবেন। তাঁদের সমাদর করতে হবে। বিক্রমাদিত্যের মত নবরত্নসভা না করতে পারলেও অনেকেই থাকবেন। বল্লভ আর গুণবান যে সাধারণ মানুষ নয় সেটা যাতে সবাই বুঝতে পারে সেজন্য রাজসভায় তাদের স্থান রাখা প্রয়োজন। এতে অবশ্য ওরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠবে। ওরা নিজের কাজ নিয়ে তন্ময় থাকতে চায়। তবু তাদের অনুরোধ করতে হবে মাঝে মাঝে যাতে সভায় উপস্থিত থেকে সভাকে সমৃদ্ধ করে। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের কথা বললে তারা নিশ্চয় বুঝবে।

অবশেষে রাজধানী গঙ্গের গড়বেষ্টিত অঞ্চলে এসে উপস্থিত হলেন মহারাজা চন্দ্রকেতু। গড়ের ভেতরে রাজপথে যেন জনসমুদ্র। প্রথম রানী নদীপথে এসেছিলেন বলে এত সাড়া জাগেনি। নতুন রানী বিস্মিত হন নগরীর পথ দেখে। রীতিমত প্রশস্ত। জনতা কৌতূহলান্বিত হলেও বিশৃঙ্খল নয়। তাদের তীব্র আগ্রহ রয়েছে নতুন রানীকে একবার দর্শনের জন্য। যে যতটুকু দেখতে পেল তাতেই আনন্দিত হল। কেউ শকটের সম্মুখে এল না। পথিপার্শ্বে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে রইল। কেউ পুষ্পবর্ষণ করল। কেউ বা দিল মালা। অশ্বারূঢ় মহারাজাকে তারা করজোড়ে প্রণাম জানায়, জয়ধ্বনি করে।

যাত্রার সমাপ্তি ঘটল রাজ-প্রাঙ্গণে শকটটি প্রবেশের পরে। নতুন রানী অপূর্ব কারুকার্য-মণ্ডিত কাষ্ঠ-নির্মিত প্রাসাদ দেখে অভিভূত হন। তাম্রলিপ্তের এত নিকটে যে এই স্বপ্নপুরী ছিল একথা তিনি জানতেন না। চন্দ্রমুখীও নয়।

মহারাজ লক্ষ্য করেন যে তাঁর জননী প্রাসাদে প্রবেশের পথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন নতুন রানীকে বরণের জন্য এবং কী আশ্চর্য! তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রানী দেবযানী। রূপ যেন তাঁর ফেটে পড়ছে। মহারাজ জানেন, ওই রূপ নীরস এবং প্রাণহীন।

মহারাজের অশ্ব কি প্রভুর মনোভাব বুঝতে পারল? সে অমন থমকে গেল কেন? মহারাজা অশ্ব থেকে অবতরণ করে রজ্জুটি সুহৃদের হাতে দিয়ে এগিয়ে গেলেন। নতুন রানীকে সযত্নে নামিয়ে আনল চন্দ্রমুখী। তখন রাজমাতা বরণডালা তার ললাটে স্পর্শ করে ডালাটি একজনের হাতে দিয়ে নতুন রানীকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অদূরে দাঁড়িয়ে জাহ্নবী সেই মুহূর্তে বুঝল যে রাজমাতা দেবযানীর সঙ্গে নববধূর পার্থক্য সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করেছেন। কারণ সে নিজেও বুঝতে পেরেছে দেবযানীর তুলনায় তাঁর রূপ কিছুই নয়। কিন্তু রূপই যে নারীর প্রকৃত পরিচয় নয়, নতুন রানীকে দেখলে সেটি অনুভব করা যায়। ওই মুখ আর চোখের চাহনিতে যে ধরিত্রীর সহিষ্ণুতা আর মমতা মাখানো রয়েছে।

রাজমাতা অম্বিকা সেই মুহূর্তে বুঝলেন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি দেবযানীকে আঘাত করে ফেলেছেন। কারণ দেবযানী আর যাই হোক, সে কৃত্রিম নয়। মনের কথা স্পষ্টভাবে বলে দেওয়ার সৎসাহস তার রয়েছে। তার মধ্যে অভিনয় বলে কিছু নেই। তাই তাড়াতাড়ি তারই পাশে দণ্ডায়মান দেবযানীকে দেখিয়ে তিনি উর্মিলাকে বলেন—ইনি প্রথম রানী হয়ে এই পুরীতে এসেছেন। ইনি তোমায় জ্যেষ্ঠা, তাই শ্রদ্ধেয়া।

উর্মিলা এগিয়ে গিয়ে দেবযানীর সামনে নত হয়ে বলেন—কী রূপ। এই রূপ কল্পনাও করা যায় না। আপনি আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরার মত।

দেবযানীর হৃদয়ের কোথাও যেন নাড়া লাগে। তিনি বলেন—আমি জানি না আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব কি না। তবে আমি চেষ্টা করব।

রাজমাতা বড়রানীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে ভাবেন, এত সুন্দর কথা বলতে পারে ও? নতুন রানী আসাতে সে কি বুঝতে পেরেছে যে তার একচ্ছত্র আধিপত্য ধূলিসাৎ হল? বুঝুক। বোঝা উচিত। কিন্তু আজ ওর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কষ্ট হয়। পরমুহূর্তে নিজের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভাবেন, যে তাঁর পুত্রকে বিবাহের পর থেকে জীবন্মৃত করে রেখেছিল সে ক্ষমার যোগ্য নয়। শাস্তি তাকে পেতেই হবে। যদি তার ক্ষমতা থাকে, পুত্রকে নিজের দিকে টেনে নিক। সেই অধিকার তার অটুট রইল। তাকে তো নির্বাসনে পাঠানো হয়নি।

নতুন রানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদের রুদ্ধশ্বাস অবস্থার অবসান ঘটল। অথচ রানী এপর্যন্ত তেমন কথা বলেননি কারও সঙ্গে। পরিচিত হননি সেভাবে। রাজমাতার একান্ত দাসী বিমলা অম্বিকা দেবীকে বলে ফেলে—একটা পরিবর্তন ঘটে গেল। কিসের পরিবর্তন মা?

রাজমাতা জানেন, বিমলা একটু বেশি কথা বলে। সব কিছুতে সে নাক গলায়। তবু আজ তার কথা শুনে তাঁর ভালই লাগল। তিনি বলেন— তুমিই বল?

—মনে হচ্ছে সবাই যেন অবসাদে ভুগছিল। সেই অবসাদ হঠাৎ কেটে গেল।

—এটা তোমার কল্পনা। সবার মনের কথা তুমি কি করে জানবে? এভাবে অন্য কাউকে বলো না। কথায় কথা বাড়ে। শেষে আয়ত্তের বাইরে চলে যায়।

নতুন রাণী এলেও কাঞ্চনমালা এখনো তাঁকে দেখতে আসতে পারেনি। আমন্ত্রণ সে পেয়েছিল। কিন্তু পায়ে আঘাত পাওয়ায় বলতে গেলে শয্যাশায়ী হওয়ার অবস্থা। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে নদীতে স্নান করা তার চিরকালের অভ্যাস। রাণী আসার আগের দিনও সে বিদ্যাধরীতে গিয়েছিল অন্ধকার থাকতে। পরে লোকজন যাতায়াত শুরু করলে সিক্তবসনে পথ অতিক্রম করা অসুবিধা হয়। এক এক দিন রাত না কাটতেই চলে যায় স্নানের জন্য। ক'দিন পূর্বে স্নানের পরে ওপরে উঠতে তার পায়ের নীচে মৃৎপাত্রের একটি ভাঙা টুকরো আমূল বিঁধে যায়। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে নদীর পার্শ্ববর্তী পলিমাটিতে বসে পড়ে সেই ভাঙা টুকরো তুলে ফেলে। তুলতে খুব কষ্ট হয় তারপর বুঝতে পারে অস্বাভাবিক রক্তপাত হচ্ছে। কোনরকমে কুটিরে ফিরে আসে। ততক্ষণে আলো ফুটেছে। দেখতে পায় রক্তের ধারা বইছে যেন। ক্ষতস্থান ছিন্নবস্ত্র দিয়ে কোনরকমে বেঁধে নেয়। সেই বস্ত্রখণ্ড ছাপিয়েও রক্ত বের হয়। সে তখন তার উদ্যানে গিয়ে একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তার রস লাগিয়ে দিয়ে নতুন বস্ত্রে সেটি আবার বাঁধে। রক্তপাত কমে যায়। কিন্তু অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে। যন্ত্রণা যত বাড়ে, মহারাজের আদেশের কথা তত বেশি মনে হয়। খাদ্যগ্রহণের

জন্য যে সমস্ত মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হয় সাধারণ মানুষে সেগুলো একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়। কারণ এই পাত্রগুলো খুবই নামমাত্র মূল্যে পাওয়া যায়। মৃৎপাত্র, পদ্মপত্র কিংবা কদলীবৃক্ষের পত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মৃৎপাত্রগুলো যত্রতত্র এমন ভাবে নিক্ষিপ্ত হয় যে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এতে রাজ্যের বিশেষ করে রাজধানীর বহু ব্যক্তি কাঞ্চনমালার মত আহত হয়েছে। মহারাজা সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ দিয়েছেন যে ওইসব বাসন-কোসন পথিপার্শ্বে আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্টস্থানে ফেলতে হবে। কিংবা যদি সেখানে ফেলার অসুবিধা থাকে তাহলে নিজ নিজ গৃহে একটি স্থান খনন করে ফেলতে হবে। কাঞ্চনমালা বেদনায় অস্থির হয়ে ভাবে কয়জন যে এই নির্দেশ পালন করে কে জানে। তাছাড়া নদীর ঘাটে ঘট ইত্যাদি পাত্র নিয়ে অনেক ধরনের পূজা দেয়। সেই সব দেবদেবীর মধ্যে রয়েছেন যক্ষ-যক্ষিণী, কুবের শ্রী, মিথুন ইত্যাদি। ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি, কৃষিক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত ফলন এবং দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তির আশায় এই পূজা। পাত্রগুলো তো পুত্তলিকার মত মূল্যবান বা দর্শনীয় নয় যে সযত্নে তুলে রেখে দেবে? পূজার শেষে ওগুলোর কাজ শেষ। তখন নিক্ষিপ্ত হয় নদীগর্ভে কিংবা নদীর ধারে।

কাঞ্চনমালা রাজপুরীর কথা ভাবে। সেখানে এখন নিশ্চয় আনন্দোৎসব চলছে। রাজমাতা তাকে ডেকেছিলেন। অবহেলা করেননি। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে সে যেতে পারল না। সে তার গৃহদেবতার কাছে প্রার্থনা করে মহারাজা যেন এবার সুখী হন। প্রথম রানীর চোখ ধাঁধানো রূপে জ্বলুনি রয়েছে, শান্তি নেই, একথা কিছুদিনের মধ্যে তার জানা হয়ে গিয়েছিল। রাজমাতা বলতে চাননি। কিন্তু তাঁর মুখে অশান্তির ছায়া দেখতে পেয়েছে সে। তাছাড়া মহারাজের আচার-আচরণের মধ্যে একটা ছন্নছাড়া ভাব প্রকট হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। সাধারণ মানুষ বুঝতে না পারলেও প্রাসাদে মাঝে মাঝে গিয়ে সে বুঝতে পেরেছিল। তার মনের ভেতরে উতলা হয়ে উঠত। সামান্য সুযোগ যদি পেত সে তাহলে মহারাজের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারত। কিন্তু তা তো সম্ভব ছিল না। নতুন রানী যেন পারেন।

মহারাজের কথা যতক্ষণ ভাবছিল, তার ব্যথার উপশম হয়েছিল কিছুটা। কিন্তু মন বিক্ষিপ্ত হতে আবার পায়ের ব্যথা বৃদ্ধি পায়। এরজন্য কি শেষ পর্যন্ত বৈদ্য ডাকতে হবে? যে মূক স্ত্রীলোকটি তার ঘরের কাজে সহায়তা করে সে কি পারবে ডেকে আনতে? সে নিজেও জানে না, কাকে ডাকতে হবে। রাজবৈদ্য কখনই নয়।

সূর্য মাথার ওপর উঠেছে। গাছের ছায়া গাছের নীচেই লুকিয়ে রয়েছে। সেই সময় দ্বারে করাঘাত। এ সময়ে কে আসবে? রাজপুরী থেকে? তাড়াতাড়ি কোনরকমে উঠে দ্বার খুলে দেখে, উর্বশী দাঁড়িয়ে হাসছে। কিন্তু কাঞ্চনমালার মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি অন্তর্হিত হয়।

—কি হয়েছে?

কাঞ্চনমালা বলে।

—দেখি দেখি। উঃ, এ যে লাল হয়ে উঠেছে। দাঁড়া দাঁড়া আমি সেঁক দিয়ে দি।

উর্বশী কাঞ্চনমালার কোন কথা না শুনে নিজেই আয়োজন করে সেঁক দিতে বসে। কাঞ্চনমালার খুব ভাল লাগছে।

—কেমন লাগছে?

—খুব ভাল।

—তোর তো কপালে নেই।

—কী?

—বর।

—বর বুঝি সেঁক দিয়ে দেয়?

—প্রয়োজনে সব করে। তবে সবার অগোচরে। নইলে দুর্নাম।

কাঞ্চনমালা হাসে। বলে—এ জন্মে তো হল না। পরের জন্মে যাতে পাই সেজন্য তপস্যা করতে হবে। তুই যখন এলি মুখ তো ঝল্‌মল্‌ করছিল। সেই হাসি উধাও হল কেন?

—কেন আবার? তোর অবস্থা দেখে। কত আনন্দে ছুটে এসেছিলাম।

—কিসের আনন্দে?

—কতদিন পরে ও এসেছে।

—সত্যি? বলবি তো।

—সময় পেলাম কোথায়? ও এখন ধনী। খুব ধনী।

—এর মধ্যেই। শুনে খুব আনন্দ হল। মনে হচ্ছে আমারই ভাগ্য খুলে গেল।

—একই কথা। আমার ভাগ্য ফেরা মানেই তোর ফেরা। আমি ধনী হলে কি তুই দরিদ্র থাকবি?

কাঞ্চনমালা হাসে। উর্বশীর মন বড় সুন্দর। যাকে ভালবাসে তাকে পর ভাবে না।

উর্বশী বলে—ও একটা ছোট সাগরে যাওয়ার তরী কিনেছে। নাম দিয়েছে জলধিশত্রু।

এবারে কাঞ্চনমালার বিস্মিত হওয়ার পালা। দেড় বছরের মধ্যে বাণিজ্য করে এত অর্থ উপার্জন করা যায়? সে বলে—এ যে কল্পনার অতীত। তোর বরের জন্মগত প্রতিভা রয়েছে।

—ঠিক তাই। সবাই সেই কথা বলছে। ও তো শ্বেতদেশে যায়নি। গিয়েছিল এই দেশেরই অপর প্রান্তে। সেখানেও এখানকার দু'একজন দেবদেবীকে অনেকে পূজা করে। সেখানকার নারীরাও এখানকার নারীদের মত সাজগোজ করে। এদেশের বণিকেরা মাটির পুতুল আর শালিধান নিয়ে যায় বেশি করে। সে নেয়নি। সে নিয়েছে সোনারূপার দেবাসন, পাথরের দ্রব্য সামগ্রী আর হাতীর দাঁতের অলঙ্কার—কানের দুল, চিরুনী, চুড়ি, এই সব। সবই নিয়েছিল দেনা করে। বিয়ের আগে থেকে অনেক কষ্ট করে অর্থ সঞ্চয় করত। তারপরেও দেনা করতে হয়েছিল, সেই সব সামগ্রী কিনতে। অল্প স্থানের মধ্যে বেশি মূল্যের সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিল ওদেশে গিয়ে পৌঁছোতেই সব বিক্রি হয়ে যায়। তারপর ওদেশের দ্রব্যসামগ্রী, যা ভাল লেগেছে, কিনে এদেশে আসতে না আসতেই সব শেষ। সে আগেই একজনকে বলে রেখেছিল সমুদ্রে যাওয়ার উপযোগী জলযান নির্মাণ করতে। আগে থেকে কি করে বুঝল এত অর্থ পাবে জানি না। তবে জলযান কিনতে সব অর্থ পরিশোধ করা যায়নি। বলেছে, একবছরে শোধ করবে। ফলে মূল্য একটু বেশি পড়েছে।

—আমি এতসব কিছুই শুনিনি।

—তুই শুনবি কী করে? তুই জ্বলছিস নিজের জ্বালায়। আজ তো আবার সোনায় সোহাগা। সবাই জেনেছে। যাঁর জানার তিনি জেনেছেন সবার আগে।

—কে?

—স্বয়ং মহারাজা।

—সত্যি? কিন্তু তোর বর তো সবে ফিরেছে।

—মহারাজা যখন তাম্রলিপ্তে গিয়েছিলেন বিবাহের সময় তখন শুনেছেন। ও যে এর মধ্যে ফিরবে আমরাই জানতাম না। ফিরে এসে প্রথম কথাই হল—মহারাজা ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার বাবা বললেন—তুমি এসেছ মহারাজা জানলেন কী করে? ও বলল, উনি আগেই জেনেছেন। তাম্রলিপ্তের এক বণিক সঙ্গে ফিরছিল। তার কাছে তাম্রলিপ্তের মহারাজা জেনেছেন। তিনি আবার বলেছেন তাঁর নতুন জামাতাকে।

স্বামীর গর্বে গরবিনী উর্বশীর মুখে চোখে আনন্দ উপচে পড়ছিল। কাঞ্চনমালার খুব ভাল লাগছিল। বিয়ের পরে মেয়েদের এত আনন্দ সে দেখেনি। সে দেখেছে শুধু তাদের দুঃখ। তার নিজের মাও দুঃখিনী ছিলেন। তাই এতদিন তার ধারণা ছিল, বিয়ের আর এক নাম অশ্রু।

দুজনে একথা সেকথা বলাবলি করছিল। কাঞ্চনমালা হঠাৎ বলে—তুই আমার সখী বলে তোকে একটা কথা বলছি। তুই হয়ত পারবি।

—কী কথা?

—আমি দেখি সব বণিক সুরাপান করে। সুরা পানের অনেক দোষ। এই নগরীতে একমাত্র চিত্রাক্ষ ছাড়া সুরা পান করেও কেউ সংযত থাকে না। তুই দেখিস তোর বর যেন ওটা না স্পর্শ করে।

উর্বশী হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—অত হাসির কী হল?

—তোর কথা শুনে।

—কেন? তোর বর তো খেত না বলেছিলি একদিন।

—বলেছিলাম। ও বলে অনেকের সঙ্গে মিশতে হলে সুরাপান না করলে চলে না।

কাঞ্চনমালার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। নিম্নস্বরে বলে—তাই বুঝি।

উর্বশী হঠাৎ প্রশ্ন করে—তোর খাওয়া হয়নি?

অপ্রস্তুত কাঞ্চনমালা বলে—খেয়ে নেব কিছু। ভোর থেকে তো পা নিয়ে ব্যস্ত।

—তাই বলে নিরম্বু উপবাস? তোকে নিয়ে যে কী করব। দাঁড়া, আমি একটু ভাত ফুটিয়ে দি। আনাজ আছে তো?

—আছে কিছু।

অল্প সময়ের মধ্যে ভাত ফুটিয়ে একটা পদ্মপত্রের ওপর ঢেলে দেয়। একটু লবণ আর তেল দেয়। কাঞ্চনমালা লক্ষ্মী মেয়ের মত সোনার মত মুখ করে খেতে খেতে ভাবে, উর্বশীর অগাধ ভালবাসার অনেক উদ্‌বৃত্ত থেকে যায় স্বামী আর প্রিয়জনদের দিয়েও। তার ভয় হয় এই ধরণের নারীরা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত আঘাত পায়। যেমন তার নিজের মা। তার মায়ের মত এটাই বোধহয় উর্বশীর শেষ মনুষ্য জন্ম। এরপর শুধুই আনন্দ।

—তোর 'ও' কোথায় রে এখন?

—কি জানি? বাড়িতে নেই। মহারাজের কাছেও যেতে পারে? ও নেই বলেই তো তোর কাছে ছুটে এলাম সুসংবাদটা দিতে।

—তোকে সোহাগ করার সময় পেয়েছে?

—দূর, সে সব রাতের জন্য রাখা আছে।

—দেখিস, হয়ত সোহাগই করবে না।

—বললেই হল? কথা না বলেও অনেক কথা বলা যায়। ও আভাস দিয়েছে।

—তাই নাকি?

—তুই বুঝবি না। তুই তো আমার মত সাধারণ ন'স। তোর অন্য চিন্তা আছে। তুই নাচ নিয়ে ভাবিস। আরও কত কিছু নিয়ে ভাবিস। মহারাজা এমনিতে তোর বাড়িতে আসেননি। আমাদের মত সাধারণ মেয়ে হলে রাজমাতা ছুটে আসতেন না।

—এবারে তুই চুপ কর। এত যে বললি, এতে আমার কী লাভ হয়েছে?

উর্বশী একটু ভেবে বলে—আমার মনে হয় সই, যারা সাধারণ নয়, তারা সুখী হতে পারে না। তাদের দুঃখ মনের ভেতরে। বাইরের অত্যাচারের জন্য এ-দুঃখ নয়। এ-দুঃখ মোচন কেউ করতে পারে না। তোরও বোধহয় তাই।

কাঞ্চনমালা এতক্ষণে জোরে হাসে। বলে—তুই দেখছি ভাবতে পারিস।

—না পারি না। তবে তোর জন্য ভাবনা হয়। তুই কি একটা বিয়ে করতে পারবি?

—হঠাৎ আমার বিয়ে কেন?

—তাহলে হয়ত সুখী হতিস। নিজের অনেক কিছুর ভার অন্যকে সমর্পণ করতে পারবি।

—কিসের ভার?

—যৌবনের ভার, একাকীত্বের ভার, অসহায়তার ভার, আরও কত কিছুর ভার। করবি বিয়ে?

—না রে, এ-জন্মে আর হবে না। পরজন্মে যদি ভাগ্যবতী হয়ে জন্মাই নিশ্চয় আমার বিয়ে হবে। আমার পুত্রসন্তান হবে। তার কচি মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সব কিছু ভুলে যাব। সে আমাদের মহারাজের মত দেখতে হবে।

কথাটা বলে ফেলেই কাঞ্চনমালা থমকে যায়। উর্বশী সখীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

তাম্রলিপ্তের রাজকুমারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে মহারাজা রাজসভায় বসেননি। বসার অবকাশ হয়নি। তবে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের বিরাম নেই। এদের মধ্যে রয়েছে চিত্রাক্ষ কনকধ্বজ এবং নতুন বণিক দ্বিজন্ম। তার কথা তিনি তাম্রলিপ্তের মহারাজার নিকট প্রথম শোনেন। তিনি বলেছিলেন যে দ্বিজন্ম একজন অসাধারণ প্রতিভাধর ব্যবসায়ী। কথাটা মহারাজা চন্দ্রকেতুর প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। এমন একজন ব্যক্তি তাঁর রাজধানীতে থাকে, অথচ তিনি চেনেন না? তাম্রলিপ্তের মহারাজা বলেছিলেন যে এই প্রথম দ্বিজন্ম দেশের বাইরে গিয়েছিল। মহারাজা তার সম্বন্ধে সব জেনে নিয়ে ফিরে এসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দ্বিজন্মকে। খুব কম বয়সী। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ। কথাবার্তাতেও বিনয়ী এবং মার্জিত। সে এখানে ফিরে এসে একটা জলযান কিনেছে সেকথাও জানেন।

সবাই এল কিন্তু বল্লভ আর গুণবান যথারীতি এল না। হয়ত তারা ভুলে গিয়েছে যে নতুন রানী এসেছেন। কারণ দোপাটি স্বয়ং স্বামীকে জানিয়েছিল ঘাটে স্নান করতে গিয়ে জেনে এসে। মহারাজা তখন অচঞ্চলকে পাঠালেন। তারা দুজনে একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে আসে। মহারাজের সামনে এসে তারা অপ্রস্তুত মুখে নীরব থাকে।

—কী হল? কী হয়েছে তোমাদের? কোন অপরাধ করে এসেছ নাকি?

বল্লভ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলে—অপরাধ নিশ্চয় করেছি। আপনি নতুন রানীকে নিয়ে এলেন, অথচ অভ্যর্থনা জানাতে ব্যর্থ হলাম। নতুন রানীকে সম্মান জানাতে পারলাম না। এর চেয়ে বেশি অপরাধ আর কি হতে পারে।

গুণবান তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—আমার স্ত্রীর কোন দোষ নেই। সে আমাকে বলেছিল যে আপনি নতুন রানীকে নিয়ে ফিরেছেন।

বল্লভ সঙ্গে সঙ্গে বলে—হ্যাঁ সে আমাকেও বলেছিল। তার কোন অপরাধ নেবেন না মহারাজ। শাস্তি আমাদের দুজনার প্রাপ্য।

চন্দ্রকেতু বলেন—তোমাদের শাস্তি দিলে এই রাজ্যের দুর্নাম হবে। ভুল, মানুষ মাত্রেই করে। আমি নিজে কত সময় কত ভুল করি। তাই তোমাদের ভুলও ক্ষমার যোগ্য। আমি তোমাদের ডেকেছি অন্য কারণে। এবার থেকে রাজসভা নিয়মিত বসবে। এতদিন তোমাদের ডাকা হয়নি। কিন্তু এবার থেকে মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতে হবে। তোমাদের আগেও বোধ হয় বলেছি যে বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্ন, আমার অন্তত দুই রত্ন রয়েছে।

গুণবান আর বল্লভ দুজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারা নিজেদের কখনো এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে ভাবেনি। অথচ মহারাজা তাদের বিশেষভাবে ডেকে পাঠিয়েছেন এবং রাজসভায় মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকতে বলেছেন। গুণবান ভাবে, বল্লভ তো নিশ্চয় গুণীব্যক্তি। ওর প্রতিবেশী রূপে তারও মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। বল্লভ ভাবল ঠিক বিপরীত।

মহারাজা বলেন—তোমরা সম্মত তো?

বল্লভ বলে—আপনার আদেশ সর্বদা শিরোধার্য।

গুণবান বলে—আপনি সংবাদ পাঠালে অবশ্যই আসব। আপনাকে অমান্য করার কথা কল্পনাতেও আসে না।

চন্দ্রকেতু বলেন—খুব আনন্দ হল তোমাদের কথা শুনে।

বল্লভ বলে—কবে ডাকবেন?

—শিগ্‌গিরই। অনেকদিন সভা বসেনি।

—সেদিন আপনাকে একটা দ্রব্য দেখাব। যদি সফল হই তাহলে রাজধানীর রূপ অন্যরকম হয়ে যাবে। পরীক্ষা করে আমি অবশ্য সফল হয়েছি। জানি না বিশাল আকারে সফল হব কিনা।

মহারাজের কণ্ঠে কৌতূহল ফুটে ওঠে। তিনি বলেন—আমার তো এই মুহূর্তে দেখতে ইচ্ছা করছে। আগামীকাল সভা ডাকি তাহলে? অসুবিধা হবে?

ইদানীং মহারাজাকে এত প্রাণবন্ত ওরা দুজনে কখনো দেখেনি। ভাবে, সদ্য বিদেশ ভ্রমণের জন্য বোধহয় এই সজীবতা।

বল্লভ বলে—না মহারাজ। অসুবিধা হবে কেন? এতো আমার পরম সৌভাগ্য।

—তোমরা দুজনাই তাহলে প্রস্তুত থেকো। মধ্যাহ্নের আহার একটু আগে সেরে নিও। অচঞ্চলকে পাঠাব।

ফেরার পথে গুণবান বল্লভকে প্রশ্ন করে—কী এমন দ্রব্য দেখাবে ঘটা করে যা আমি জানি না।

বল্লভ মুচকি হেসে বলে—এমন কিছু নয়। তোমাকে নিশ্চয় দেখাতাম। কিন্তু মহারাজকে

যখন বলে ফেলেছি তখন তাঁকে আগে দেখানো কর্তব্য। অনেকদিন থেকে এটিকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছি। তোমাকে আর জাহ্নবীকে বলেওছি বোধহয়। খেয়াল করনি।

—তা হবে হয়তো। কিন্তু আমার চোখে তো কিছু পড়েনি তোমার পুতুল ঘরে?

—চোখের সামনেই রয়েছে। এমন কিছু দর্শনীয় নয় বলে দেখতে পাওনি।

—আশ্চর্য! আমার চোখ এড়িয়ে গেল?

গুণবান ভাবতে ভাবতে নিজের কুটিরের আঙিনায় প্রবেশ করে। বল্লভও তার নিজের কুটিরে যায়। একটু পরে গুণবান বাইরে থেকে তাকে ডাকে।

বল্লভ ভাবে, এই তো দুজনে একসঙ্গে এলাম। এর মধ্যে আবার ডাকে কেন?

সে বাইরে এসে বলে—কী হল?

—দোপাটি পাঠাল তোমার কাছে। বলল, কাল রাজভায় যাওয়ার আগে আমার ওখান থেকে কিছু মুখে দিয়ে যেও।

—এ আবার কি উৎকট অনুরোধ? আমিই তো দুটো ফুটিয়ে নিতে পারতাম।

—দোপাটি বলল, তুমি এই কথাই বলবে। কিন্তু ও বিশ্বাস করে না। দেখতে এক রত্তি হলে কি হবে তেজ আছে।

বল্লভ হেসে ফেলে। বলে—তোমার মত দিগগজকে যখন বশে রেখেছে তখন একথা মুখে না বললেও চলে। ওইটুকু মেয়ে। ভাবতো ওই বয়সে আমরা কত অপরিণত ছিলাম।

—ওসব ভাবতে হবে না। তুমি না হয় কোন বৃদ্ধাকে বিয়ে করো। আমি চললাম।

পরদিন অচঞ্চল এসে পৌঁছোবার আগে তারা দুজনে দোপাটির হাতের ব্যঞ্জন, টাটকা মাছের ঝোল আর দুধকলা দিয়ে ভাত খেয়ে প্রস্তুত ছিল। গুণবানের মধ্যে তীব্র কৌতূহল থাকলেও বল্লভ কোন্ দ্রব্য সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে একবারও জানতে চায়নি। সে জানে বল্লভ তাকে দেখাবে না। তবে যাত্রার পূর্বে বল্লভ তার পুতুল-ঘরে ঢুকে বস্ত্রে জড়ানো একটি চৌকো ভারী দ্রব্য হাতে তুলে নেয়। আড়চোখে গুণবান একবার সেটি দেখে। মুখে কিছু বলে না।

অচঞ্চল এসে বলে—আপনাদের জন্য শকট কিংবা হাতি আনিনি।

বল্লভ বলে—হঠাৎ শকট আর হাতির কথা কেন?

—রাজসভায় যাচ্ছেন তো।

—অন্যেরা সব কিভাবে যায়?

—অধিকাংশ হেঁটে যায়। কেউ কেউ অশ্ব কিংবা শকটে।

—আমাদের অশ্বও নেই, শকটও নেই। তাই হেঁটে যাব। তাছাড়া আমরা বোধহয় রাজবাড়ির সবচেয়ে কাছে থাকি।

—তা থাকেন।

—তবে?

গুণবান বলে—অচঞ্চল এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন আমরা বিরাট কিছু হয়ে গিয়েছি।

অচঞ্চল গম্ভীর হয়ে বলে—আপনারা অমন করলে কী হবে, মহারাজা আপনাদের যথেষ্ট সম্মান করেন।

—সেটা আমাদের গুণ নয়, ওঁর মাহাত্ম্য।

বল্লভ বস্ত্রাচ্ছাদিত দ্রব্যটি এতক্ষণ ডান হাতে বহন করছিল, একটু এগিয়েই হাত পালটে বাঁ-হাতে নেয়।

গুণবান বলে—তোমার চৌকো রহস্যটি যথেষ্ট ভারী।

বল্লভ বলে—ভারী তো হবেই। এর মধ্যে দেশের বিরাট ভবিষ্যৎ লুকিয়ে রয়েছে যে।

তারা রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে এসে প্রবেশ করে। সেখানে দেখে মহামান্য সেনাপতি, পরিষদবৃন্দ, বৃদ্ধ যক্ষ এবং চিত্রাক্ষ কনকধ্বজ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত। ওদের মধ্যে কয়েকজন অচেনা। নিশ্চয় রাজধানীতে তারা থাকে না। তবে সভায় নিশ্চয় তাদের গুরুত্ব রয়েছে।

ওদের দুজনার সঙ্গে চিত্রাক্ষের কিছুটা ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। চিত্রাক্ষের স্বভাবই সবার সঙ্গে মেলামেশা করা। তাই রাজ্যে তার যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে; সে এগিয়ে এসে দুজনাকে জিজ্ঞাসা করে—আপনারা?

গুণবান বলে—মহারাজা আমাদের ডেকেছেন।

—এই রাজসভায়?

—তাই তো জানি।

—খুব ভাল। এই দিকটায় খুঁত ছিল। মহারাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির এও এক প্রমাণ।

বল্লভ বলে—কেন বলুন তো?

—সভায় বিদগ্ধ ব্যক্তিদের উপস্থিতির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

চিত্রাক্ষকে দেখে কনকধ্বজও এগিয়ে আসে। সে সব সময় ভাবে চিত্রাক্ষ বোধহয় বেশি কিছু জেনে ফেলল। ওদের দুজনাকে দেখে সেও বলে ওঠে—আপনারা?

চিত্রাক্ষ বলে—মহারাজা রাজসভায় উপস্থিত থাকতে বলেছেন।

কনকধ্বজ বলে—আমাকে এতটা মূর্খ ভেবো না চিত্রাক্ষ।

—তুমি কী বলছ?

—মহারাজা ওঁদের রাজসভায় আসতে বলেছেন? আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ? মহারাজের আর কাজ নেই?

চিত্রাক্ষের মত মানুষেরও মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে ওঠে। সে দুজনের হাত ধরে বলে—চলুন। মহারাজা একটু পরেই আসবেন।

সভাকক্ষের রক্ষী বল্লভ আর গুণবানকে তাদের নির্দিষ্ট আসনে নিয়ে যায়। চিত্রাক্ষ তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে—কিছু মনে করবেন না।

গুণবান বলে—মনে করব কেন? উনি তো ভুল বলেননি।

চিত্রাক্ষ গুণবানকে বলে—অর্থ কনকধ্বজকে গ্রাস করে ফেলেছে। আজ হয়ত সে কিছুটা বুঝবে।

মহারাজা চন্দ্রকেতু এসে প্রবেশ করেন একটু পরেই। তিনি সভাসদদের সম্মুখে নির্দিষ্ট উচ্চাসনে গিয়ে উপবেশন করেন। মহারাজা সাধারণত তাঁর স্বাভাবিক গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলেন। কিন্তু আজ তিনি ইচ্ছা করে গাম্ভীর্যের কিছুটা বিসর্জন দিয়েছেন।

তিনি বলেন— এবার থেকে রাজসভা নিয়মিত যেমন বসত তেমনি বসবে। আজ আমি এই সভা আহ্বান করেছি আকস্মিক ভাবে। তাম্রলিপ্ত থেকে সদ্য ফিরেছি। আপনারা নিশ্চয় সভা আহ্বানের পূর্বে একটি উৎসবের প্রত্যাশা করেছিলেন। উৎসব কয়েকদিন পরে

হবে। কিন্তু আজ আপনাদের আসতে বলেছি একটি বিশেষ কারণে। একটি সম্পূর্ণ নতুন দ্রব্য প্রদর্শন করা হবে। দ্রব্যটি যে কি আমিও জানি না। সেই দ্রব্য নাকি রাজধানীর রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম।

সবাই কৌতূহলান্বিত হয়ে ওঠে। গুণবান বল্লভকে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে বলে—এবারে ঠেলা সামলাও।

—কিসের ঠেলা। চুপচাপ দেখে যাও।

মহারাজা বলেন—বল্লভকে আপনাদের অনেকেই বোধহয় চেনেন। সেই বল্লভ বলেছে সে একটি দ্রব্য নির্মাণ করেছে যার ভবিষ্যৎ অভাবনীয়।

সভায় অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি ওঠে।

মহারাজা বল্লভকে কাছে ডাকেন।

বল্লভ এগিয়ে যায়। হাতে তার সেই চতুষ্কোণ দ্রব্যটি রয়েছে। গুণবান মনে মনে প্রার্থনা করে বল্লভের যেন কোন অমর্যাদা না হয়। কনকধ্বজের মত মানুষ অনেকে থাকতে পারে।

মহারাজা বল্লভের হাতের দিকে চেয়ে বলেন—ওটি তোমার সেই বিস্ময়কর সামগ্রী?

বল্লভ বলে—মহারাজ, এটি আদৌও দর্শনীয় নয়। এমনকি একটি পুতুল মানুষকে যতটা আকর্ষণ করতে পারে এটির সেই ক্ষমতাও নেই।

বল্লভ বস্ত্রখণ্ড সরিয়ে ফেলে। মহারাজের চোখেও অবজ্ঞা ফুটে ওঠে। এ যে পোড়া মাটি। পাতলা আর চার কোনা। কী হবে এতে?

—মহারাজ, এই ইষ্টক একটি একটি করে সাজিয়ে গগনচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করা যেতে পারে। আমার কল্পনা তাই বলে। আমি ছোট ছোট ইষ্টক দিয়ে আমার উদ্যানের এক কোণে লোকচক্ষুর অন্তরালে সংগোপনে একটি পুতুলরাজের প্রাসাদ নির্মাণ করেছি। আমার ধারণা এই ভারতবর্ষে কোথাও এর অস্তিত্ব নেই।

মহারাজের চোখের অবজ্ঞাভাব নিমেষ অন্তর্হিত হয়। রীতিমত আগ্রহী হয়ে তিনি বলেন—তুমি নির্মাণ করেছ?

—হ্যাঁ মহারাজ। গুণবান আমার প্রতিবেশী, সেও জানে না।

—কিন্তু এই ইষ্টক জোড়া দিলে কি করে?

—ইষ্টক চূর্ণ জলে ভিজিয়ে তার সঙ্গে বিদ্যাধরীর পাশের এঁটেল মাটি মিশিয়ে জোড়া দেওয়া যায়। বেশ শক্ত হয়। এই রাজপুরীর উচ্চতার চেয়েও অনেক বেশি উচ্চতাসম্পন্ন প্রাসাদ নির্মাণ সম্ভব। এই নিয়ে আমি একবছর নাড়াচাড়া করেছি। আমি যতটা সম্ভব শক্তি প্রয়োগ করে ধাক্কা দিয়ে দেখেছি পর্বতের মত অটল।

সভার সবাই নীরব। কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গুণবান বিশ্বাস করেছে। সে জানে বল্লভ উন্মাদ নয়। সে তার সৃষ্টিকে নিয়ে রসিকতা করে না। এ বিষয়ে সে অত্যন্ত আন্তরিক। কনকধ্বজের মুখে ব্যঙ্গের হাসি। সে স্থির দৃষ্টিতে মহরাজের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেও অপারগ হয়।

সহসা চিত্রাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—মহারাজ, একটি প্রাসাদ নির্মাণ করতে যত অর্থের প্রয়োজন আমি বল্লভকে দেব।

মহারাজের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি বলেন—তার আগে চল বল্লভের সেই গোপন

প্রাসাদটি দেখে আসি।

আনন্দ আর আশঙ্কায় বল্লভের হৃদয়ে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সে বলে—আপনি যাবেন আমার গৃহে? সেই গৃহে তো কোন শ্রী নেই।

—শ্রী তোমার মনে, তোমার মস্তিষ্কে। তোমার জন্য স্বর্গ থেকে শ্রী আসবেন আমার এই রাজ্যে। গুণবানের অভিমত কী?

গুণবান বলে—ওর শৈশব থেকে আমার এই একই অভিমত। আজ দেশের মহারাজের স্বীকৃতি পেল।

সেদিনের মত সভার কাজ সাঙ্গ হয়। মহারাজ ঘোষণা করেন, পরদিন সভা বসবে পূর্বাহ্নে। পঁচিশজন সভাসদ মহারাজকে অনুসরণ করে পদব্রজে! মহারাজ একটি অশ্বে ধীর গতিতে চলেন। এই দৃশ্য রাজধানীতে প্রথম। সংবাদটি রটে গেল মুহূর্তের মধ্যে। যে যেখানে ছিল ছুটে এসে পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাদের চোখে জিজ্ঞাসা। এর মধ্যে কিছু ব্যক্তি কাল্পনিক কোন ঘটনার কথা রটিয়ে দিয়েছে। বল্লভকে মহারাজের পাশে পাশে চলতে দেখে তারা বলাবলি করে মন্দারের পিঠে চড়ার জন্য মহারাজা রেগে গিয়েছেন। অমন সুন্দর একজন মানুষের এই মতি হল কেন কে জানে। তার তো কোন দোষ নেই। মনে হয় কোন দুরাত্মা ভালমানুষ দেখে ক্রমগত উস্‌কানি দিয়ে প্রলোভিত করেছিল। মহারাজের ওই দেহরক্ষীটা এই কাজ করতে পারে। ও বল্লভের বড় ন্যাওটা। একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলে রাজপুরীর ওই হরিণের মত মেয়েটা এ সবের মূলে। মাঝে মাঝে এ বাড়িতে না এলে যেন পেটের ভাত পরিপাক হয় না। নিশ্চয় কেউ মহারাজের কানে কথাটা তুলেছে। মেয়েটা বড় রানীর দেশের। মেয়ে তো নয় পুরুষের বাড়া। নিশ্চয় বেচারা বল্লভের মন ভোলাতে চেষ্টা করছিল।

অবশেষে সকলের চোখের সামনে দিয়ে মহারাজা বল্লভের গৃহের সামনে উপস্থিত হন। বাতায়নের ফাঁক দিয়ে দোপাটি চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে। একি স্বপ্ন! বল্লভের গৃহাঙ্গনে স্বয়ং মহারাজা।

মহারাজা বলেন—কোথায় তোমার প্রাসাদ বল্লভ?

বল্লভ তার উদ্যানে নিয়ে যায় মহারাজকে। উদ্যানটি বৃহৎ নয়। তারই কুটির সংলগ্ন। পুষ্পশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ রয়েছে সেখানে। এক কোন অনেক ঝোপ-ঝাড়। এই আড়াল সৃষ্টি করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। কারও চোখে পড়ে না, কারও মনে প্রশ্নও জাগে না। এটি হল শিল্পীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান। ঘরের মধ্যে কল্পনা আর চিন্তা যেন বাধাপ্রাপ্ত হয়। উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিজেকে অনেক স্বাধীন বলে মনে হয়।

মহারাজা সেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়ান। সামনে একটি অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার উচ্চতা প্রায় তাঁর সমান। কিন্তু কী নেই সেই অট্টালিকায়? তাঁর আবাসে যা রয়েছে সেসব ছাড়াও অনেক কিছু রয়েছে যা হয়ত কাষ্ঠদ্বারা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। মহারাজা চন্দ্রকেতু নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। এ যেন কোন এক স্বপ্নপুরী। কিন্তু এই পুরী তিনি স্বপ্নেও দেখেন নি। যে বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকে স্বপ্নে তার দেখা মেলে না।

মহারাজা দাঁড়িয়েই থাকেন। তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটে না। অন্যেরাও একে একে দেখে আবার উদ্যানের বাইরে চলে যায়। কারও মুখেই কোন কথা নেই।

শেষে মহারাজা বলেন—তুমি বলেছ, এটি যথেষ্ট শক্ত।

—হ্যাঁ মহারাজ।

—পরীক্ষা করে দেখব?

—অবশ্যই দেখবেন। আমি তো তাই চাই। আমার এক বছরের সাধনার পরীক্ষা হয়ে যাবে।

মহারাজা অচঞ্চলকে তাঁর অশ্বটি নিয়ে আসতে বলেন। এরপর তাঁর আদেশে একটি শক্ত এবং দীর্ঘ রজ্জু যোগাড় করা হয়। সেই রজ্জু দিয়ে প্রাসাদটিকে বেষ্টন করে অন্য প্রান্ত অশ্বের গ্রীবার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এবারে মহারাজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তাকে ছোটাতে কশাঘাত করেন। অশ্বটি প্রাণপণে ছুটতে চায় কিন্তু পারে না। তার সামনের পা দুটি শূন্যে অনেকটা উঠে গিয়ে আবার মাটিতে পড়ে।

মহারাজা লাফিয়ে নীচে নামেন। হাতের কশা অচঞ্চলের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বল্লভের পিঠে হাত রেখে বলেন—তুমি সত্যই গঙ্গারিদির রত্ন।

অশ্বকে রজ্জুমুক্ত করা হয়। চিত্রাক্ষ ছটফট্ করে। কিন্তু কীভাবে বল্লভকে সাহায্য করবে বুঝে উঠতে পারে না।

মহারাজা বলেন—কীভাবে তোমার সাধনা পরিপূর্ণতা পাবে সে সম্বন্ধেও নিশ্চয় ভেবেছ।

—হ্যাঁ মহারাজা।

—আগামী কাল রাজসভায় আসতে পারবে?

—অবশ্যই পারব। এই নিয়ে আলোচনা করতে হবে। গুণবান থাকবে।

—হ্যাঁ, গুণবান সব সময়েই থাকবে। আজ আমি চলি। তোমাকে আর সঙ্গে যেতে হবে না। বরং গুণবানকে নিয়ে পরামর্শ কর।

—আমার গৃহে পদধূলি দিলেন আর আমি এগিয়ে দেব না? আমার অপরাধ হবে।

—একটুও অপরাধ হবে না।

মহারাজা ওদের দুজনকে রেখে সদলে আঙিনা ছেড়ে চলে যান। একটু পরে দোপাটি গুটি গুটি এসে ওদের পাশে দাঁড়ায়। বলে—মহারাজা কেন এসেছিলেন? আমি ভাবতেও পারি না।

গুণবান বলে ওঠে—মহারাজের হাতি এলে ভাবতে পার আর তিনি এলে ভাবতে পার না?

বল্লভ বলে—সব সময় ওর সঙ্গে ওভাবে কথা বল কেন?

—কীভাবে বলি?

দোপাটি হেসে বলে—ওর কথা ছেড়ে দিন। ওভাবে কথা না বললে বুঝতে হবে শরীর কিংবা মনটা ঠিক নেই। মহারাজের ঘোড়া কি নিয়ে অত টানাটানি করছিল?

বল্লভ বলে—চল দেখবে। তোমার জন্য একটা বড় বাড়ি নির্মাণ করে রেখেছি।

সে দোপাটিকে নিয়ে সেই প্রাসাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। দোপাটির পলক পড়ে না। সে দেখতেই থাকে দেখতেই থাকে।

শেষে বলে—এত সুন্দর?

—ভাল লেগেছে?

—আমার মনে পড়ছে সেই রাজপুত্র আর রাজকন্যার কথা।

—ঠিক বলেছ। চল, গুণবান তোমাকে উল্টো কথা বলে এতক্ষণ বোধহয় অনুশোচনায় ভুগছে।

—কোন্ উল্টো কথা?

—ওই যে মহারাজা আর হাতির কথা বলে?

দোপাটি হেসে বলে—ওর কথাই অমন। মানুষটা খুব ভাল। আমার কষ্ট সইতে পারে না। মুখ একটু ভার দেখলে বারবার কাছে কাছে ঘোরে। লেখাপড়া মাথায় ওঠে। ওর কথায় আমার একটুও রাগ হয় না। ভাল লাগে।

—তাহলে তো কথাই নেই। ওকে তুমি আর আমি শুধু চিনি। সব সময় পুঁথি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে বলে অতি ঘনিষ্ঠ মানুষদের সঙ্গে মেপে কথা বলে না।

—ঠিক বলেছেন। আপনি ছাড়া ওর মত আর কাউকে দেখি না।

—আমি? আমি ওর যুগ্যি নই।

—আপনারা দুজনাই সমান। আপনাকে আমি মনে মনে প্রণাম করি রোজ মা-বাবার সঙ্গে।

বল্লভের মনে, একথা শুনে একটা আবেগের সৃষ্টি হয়। সে কোনরকমে সেটি দমন করে ওকে নিয়ে গুণবানের কাছে আসে।

পরদিন রাজসভায় এসে মহারাজ প্রথমেই বল্লভকে প্রশ্ন করেন—কীভাবে এটি বাস্তবায়িত করা যায়? তুমি তো বললে, ভাবনা-চিন্তা করেছ।

—হ্যাঁ মহারাজ, কাল যে ক্ষুদ্র প্রাসাদ দেখলেন তার ইষ্টক সূর্যের আলোয় শুকানো হয়েছে। কয়েকটি অবশ্য আমি পুড়িয়ে নিয়েছি। কিন্তু বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করতে হলে ইষ্টকগুলো পুড়িয়ে নিতে হবে। হাঁড়ি-কলসী পোড়ানোর মত ক্ষুদ্র হলে হবে না। এর জন্য বৃহৎ ভাঁটির প্রয়োজন। সমস্ত ইষ্টক একসঙ্গে পুড়ে লাল হয়ে যাবে। এক একটা ভাঁটিতে অন্তত এক সহস্র ইষ্টক পুড়বে। পোড়া মাটির মূর্তির আকার তো ক্ষুদ্র। কিন্তু এতগুলো ইষ্টক একসঙ্গে পোড়াতে হলে সেগুলো সাজিয়ে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে অনেক কাঠ দিয়ে। চুণ পোড়াতে যেমন ছোট ভাঁটি হয়, তার চেয়ে অনেক বড় হবে। সব ইষ্টক কয়েকদিনে সমানভাবে পুড়ে শক্ত হয়ে উঠবে।

—এত ইষ্টক তৈরি করবে কী করে?

বল্লভ বলে—কোন অসুবিধা নেই মহারাজ। আমি মাটির একটা ছাঁচ গড়ে দেব। তাই দেখে সূত্রধরেরা অনেকগুলো কাঠের ছাঁচ করে দেবে। তার মধ্যে পরিমাণ মত ভেজা মাটি ভরে উপুড় করে দিলেই ইষ্টক হবে। কতভাগ মাটি কতভাগ বালি আর কত পরিমাণ জলের প্রয়োজন আমি একবার বলে দিলে সবাই পারবে।

চিত্রাক্ষ উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আপনি চিন্তা করবেন না মহারাজ। আমাকে দায়িত্ব দিলে সব কিছু যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় আমি তার ব্যবস্থা করে দেব।

মহারাজা চন্দ্রকেতু নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি তখনই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

মধ্যাহ্নের পূর্বে সভা ভঙ্গ হয়। মহারাজের মধ্যাহ্নের আহার শৈশবের মত এখনো মায়ের সামনে করতে হয়। এরপরে অবশ্য মা-পুত্রের সাক্ষ্যাৎ হয় না সারাদিন ও রাত্রে। এই ব্যবস্থা মহারাজ করেছেন। আহারের পর মহারাজ মায়ের প্রকোষ্ঠ থেকে বাইরে এসে

দেখেন দূরে দেবযানীর কক্ষের সামনে পৃথা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী একটা খাচ্ছিল। মহারাজকে দেখে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলল। মহারাজের হাসি পায়। তবে তাঁর গাম্ভীর্য অটুট থাকে। দেবযানীর কক্ষে প্রবেশের কোন আগ্রহই জাগে না তাঁর মনে। তিনি জানেন উর্মিলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে গতকালের ঘটনা জানার পর থেকে। এগিয়ে গিয়ে তিনি উর্মিলার কক্ষে প্রবেশ করেন।

উর্মিলা এতক্ষণ তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। ছুটে এসে তাঁর হাত ধরে বলেন—তোমার খাওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ। মায়ের ওখানে থেকেই আসছি। এই নিয়মটা রেখেছি বলে মায়ের সঙ্গে দিনে একবার দেখা হয়।

—ভালই করেছ।

—মা একটা নতুন ব্যঞ্জন খাওয়ালেন। খুব ভাল লাগল। রাঁধুনীর নাম জিজ্ঞাসা করলাম। মা হেসে বললেন, দ্রৌপদী। হেঁয়ালী সৃষ্টি করা মায়ের চিরকালের অভ্যাস। ভালই লাগে।

—কিসের ব্যঞ্জন এত ভাল লাগল?

—অনেক রকম আনাজ দিয়ে করা হয়েছে। মাছ মাংসের চেয়েও ভাল।

উর্মিলা হাসে। বলে—এবারে একটু বিশ্রাম কর। তোমার আজকের সভার আলোচনার কথা বল। সত্যই কি আকাশছোঁয়া গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হবে?

—হবে উর্মিলা। বল্লভ অসাধারণ প্রতিভাবান।

উর্মিলা স্বামীর শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। একটু পরে মহারাজ তাঁকে কাছে টেনে নেন।

ওদিকে পৃথা মহারাজা নতুন রানীর কক্ষে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হাত ধুয়ে নেয়। এতক্ষণ সে তার আসনের পাশে লুকিয়ে রাখা পাত্র থেকে মধু খাচ্ছিল। এখানকার অরণ্য থেকে প্রচুর মধু পাওয়া যায়। সেই মধু বিদেশেও যায়। প্রাসাদের রন্ধনশালায় একটি অলিঞ্জরে মধু রক্ষিত থাকে। রন্ধনশালার পাচকের সঙ্গে ভাব করে মাঝে মাঝে সে চেয়ে নিয়ে আসে। বড়রানী তাকে বড় একটা ডাকেন না। সে তাই নিজের আসনে বসে মাঝে মাঝে আঙুলের ডগায় মধু নিয়ে খায়। মহারাজা বোধহয় দেখে ফেলেছেন। একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু মহারাজকে নতুন রানীর কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে তার ভয় উধাও হয়। বিজাতীয় আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। সে জানে জাহ্নবীর আসার সময় হয়ে এসেছে। তার আগেই দেবযানীকে বিষণ্ণ করে দেওয়ার লোভে সে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে।

দেবযানী তাকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠেন—তুমি কেন ঢুকলে? আমি তোমাকে ডেকেছি?

—না মহারানী। তবু মনে হল একটা কথা আপনাকে না জানালে অন্যায় হবে।

—কী কথা?

—মহারাজা এখনই আপনাকে উপেক্ষা করে আপনার কক্ষ অতিক্রম করে নতুন রানীর কাছে গেলেন।

—গেলেন তো বয়ে গিয়েছে। এটা কি একটা সংবাদ হল যে সেকথা বলতে তুমি ঢুকে পড়লে?

—আপনি আমাদের দেশের রাজবংশের কন্যা। আপনাকে কেউ এভাবে অবহেলা করলে আমার সহ্য হয় না মহারানী। তার চেয়ে আপনি আমাকে মেরে ফেলুন।

পৃথা অনেক কৌশলে কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিসর্জন করে ফেলে।

এই বোধহয় প্রথম পৃথার প্রতি দেবযানীর মন কোমল হয়। তিনি বলেন—ঠিক আছে

পৃথা। তুমি আর জাহ্নবী ছাড়া অবন্তীর কেউ নেই এই বিদেশে। তোমরা আমার মঙ্গল চাইবেই। আমিও তোমাদের দুজনার ভাল চাই।

পৃথা সুযোগ বুঝে বলে—মহারানী, একটা কথা বললে ক্রুদ্ধ হবেন না। জাহ্নবী অবন্তীদেশের চেয়ে এই গঙ্গারিদিকে বেশি ভালবাসতে আরম্ভ করেছে। এই দেশের জন্য না হলেও, এক শিল্পী রয়েছে, তার জন্য। কী যে দেখেছে তার মধ্যে।

দেবযানী বুঝলেন, প্রশ্রয় পাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলতে শুরু করেছে। তিনি তাড়াতাড়ি বলেন—ঠিক আছ পৃথা। আমি দেখব।

সেই মুহূর্তে জাহ্নবী প্রবেশ করে হেসে বলে—এখন থেকে বোধহয় এদেশে কেউ আর মাটির কুটির নির্মাণ করবে না। প্রাসাদও দারু-নির্মিত হবে না।

মহারানীর মনে পৃথার প্ররোচনা সক্রিয় ছিল। তিনি বলে ওঠেন— তোমার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এদেশের জন্য প্রাণত্যাগ করতে পার।

জাহ্নবী দেবযানীর ক্রোধকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে বলে—হয়ত পারি। কিন্তু সে কথা বলছি না। একটা নতুন আবিষ্কার তো।

—কিসের আবিষ্কারের কথা বলছ?

জাহ্নবী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে—আপনি জানেন না?

সে পৃথার সামনে পরিচারিকার মত কথা বলে।

দেবযানী বলে—তুমি কি দেখে এলে, আমি জানব কেমন করে?

—রাজধানীর সবাই প্রায় জেনে গিয়েছে ইতিমধ্যে। মহারাজা আপনাকে বলেননি?

—মহারাজা! তিনি তাম্রলিপ্ত থেকে ফিরে চারদিন পরে এক প্রভাতে কয়েক মুহূর্তের জন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না। আর বলেছিলেন, আমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। তবে ওই মেয়েটি দুদিন এসেছিলেন।

—কোন মেয়ে?

—যাকে তাম্রলিপ্ত থেকে আনা হয়েছে। এসে প্রণাম করেছে। বসেছে। বারবার আমার রূপের প্রশংসা করেছে। আর বলেছে, আমি তার জৈষ্ঠা ভগিনীর মত। মেয়েটা ভাল। তবে আমি তাকে প্রশ্রয় দিইনি।

—দিলেই পারতেন।

—ও যতক্ষণ আমার সামনে ছিল, অপমানের জ্বালায় জ্বলছিলাম।

— কেন?

সেইসময় মহারানী পৃথার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হন। পৃথা এতক্ষণ ওঁদের কথোপকথন গিলছিল আর ভাবছিল জাহ্নবী মহারানীর সঙ্গে এ ধরনের কথা বলে!

দেবযানী পৃথাকে বলেন—তুমি এখন যাও পৃথা। পরে আবার ডাকব।

পৃথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জাহ্নবীর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

দেবযানী তখন বলেন—ওর গালে, ওষ্ঠে চুম্বনের দাগ। আমার রঙ ওর চেয়ে অনেক উজ্জ্বল। আমার গণ্ডে, ওষ্ঠে সামান্য স্পর্শেই অমন চিহ্ন ফুটে উঠতে পারত। কিন্তু পড়েনি। উনি কখনো অতদূর এগোননি।

—তুমি এগোতে দিয়েছিলে?

—না।

—এখন মনে হয়ে লাভ কী?

—কিছু না।

মহারানী দেবযানী সহসা অশ্রুবির্সজন করতে থাকেন। জাহ্নবী বিচলিত বোধ করে। কী করবে ভেবে পায় না। সে দেবযানীর পৃষ্ঠে হাত রাখে। বাল্যে আর কৈশোরে অমন কত সান্ত্বনা দিত। এখন সঙ্কোচ হয়।

দেবযানী বলেন—তুমি ছাড়া আমার নিজের কেউ নেই। পৃথা একই দেশের মানুষ। কিন্তু ওই পর্যন্ত। সব সময় বসে বসে আঙুল দিয়ে মধু খায়।

বিস্মিত জাহ্নবী বলে—তুমি জানলে কী করে?

—ওসব চাপা থাকে নাকি? একদিন রন্ধনশালায় গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। তখন একজন ওকে ফিস্‌ফিস্ করে বলছিল। আমার শ্রবণেন্দ্রিয় যে কত তীক্ষ্ণ তুমি তো ভালই জান। তারপরে কত সময় দেখেছি বাইরে বসে আঙুল চুষছে। মা বলত, মেয়েদের বেশি মধু খাওয়া ভাল নয়। গা গরম হয়।

কথাটা ঘুরে যাওয়ায় জাহ্নবী স্বস্তি পায়। সে তখন বলে—যে কথাটা তুমি এখনো শোনোনি সেটা হল, বল্লভ এক শ্রেণীর ইষ্টক তৈরি করছে তাই দিয়ে বড় বড় গৃহ নির্মাণ করা যাবে। কাঠের বাড়ির চেয়ে অনেক উঁচু হবে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তও সেই বাড়ির উচ্চতার জন্য আড়াল পড়ে যাবে।

—বল্লভের অনেক গুণ রয়েছে দেখছি। ভালই বেছে নিয়েছ।

—আমার মনে ওসব নেই মহারানী। আমি শুধু মানুষটার গুণমুগ্ধ।

—তুমি এত বুদ্ধিমতী আর এটুকু বুঝতে পার না? এই মুগ্ধতার পরিণতির কথা কে না জানে।

—তিনি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।

—তাতে তোমার কী? তুমি তো অন্যরকমের নও। তাছাড়া স্নেহ আর ভালবাসা দিয়ে মেয়েরা সবকিছু জয় করতে পারে।

জাহ্নবী ছিট্‌কে একটু দূরে সরে গিয়ে দেবযানীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

—কী হল?

—তুমি যা বললে, তা কি অন্তর দিয়ে অনুভব করে বলছ?

দেবযানী বলেন—আমি এখানে আসার আগে মা আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে এটি একটি।

—তিনি যে এত প্রজ্ঞাবতী তা তো জানা ছিল না।

—কেন?

—তিনি যা বলেছেন তার চেয়ে অধিকতর সত্য আর নেই। তোমার কখনো ইচ্ছা হয়নি মহারাজকে ওভাবে জয় করতে?

—আগে কখনো হয়নি। কিন্তু সেদিন মেয়েটার মুখে ওই সব চিহ্ন দেখে আমার খুব

হিংসা হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল ও জেনেশুনে ইচ্ছা করে ওইসব সোহাগের চিহ্ন দেখাতে এসেছে। কিন্তু মেয়েটা এত কূট বলে মনে হয় না।

—এবারে তাহলে চেষ্টা করে দেখ না। তোমার মত সুন্দর মুখ পৃথিবীতে নেই। ওই মুখ সব কিছু জয় করতে পারে।

—হয়ত তাই। কিন্তু মহারাজের বেলায় মনটাও ততখানি সুন্দর হতে হবে, একথা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি। ওই মেয়েটা হয়ত দেখতে সুন্দর নয় কিন্তু ওর যে হৃদয় রয়েছে। তাই সুন্দরী না হয়েও ওর মুখশ্রী অত মিষ্টি।

—তুমি নতুন রানীর নাম উচ্চারণ কর না কেন?

—মনের জ্বালায়। আমি জানি ওর মনে কোন গ্লানি নেই। ওর কাছে আমি পরাজিত।

জাহ্নবী একটু ভেবে বলে—তুমি মহারাজকে একদিন ডাকো।

—তাঁর কাছে গিয়ে ডাকব?

—তা কেন? আমাকে কিংবা পৃথাকে বল। আমরা বলব যে তুমি দেখা করতে চাও।

—তাতে কী লাভ?

—উনি আসবেন।

—তারপর?

—তুমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইবে। বলবে, তোমার সমস্ত দর্প চূর্ণ হয়েছে। ছোটরাণীকে দেখে তুমি ভালবাসতে শিখেছ।

—সে কথা কি বলা যায়?

—নিশ্চয় বলা যায়। পুরুষের ভালবাসা পেতে সব কিছু বলা যায়।

—একজন পুরুষ কয়জন রানীকে ভালবাসতে পারে?

—জানি না। কিন্তু একাধিক নারীকে ভালবাসতে দোষ কি? উনি না হয়, শুধু তোমার অলৌকিক রূপের আকর্ষণে তোমাকে ভালবাসলেন। নিজের রূপকে সেইভাবে মেলে ধর।

—ভাবতে পারছি না।

—সময় নিয়ে ভালভাবে ভেবে দেখ। তারপর প্রস্তুত হলে আমাকে জানাবে। আমি মহারাজকে গিয়ে বলব।

চন্দ্রকেতুগড়ের পরিখার বাইরে গঙ্গে নগরের পাশে নদীর তীরে একটি কুটির কয়েক বছর পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল। সেখানে একদল যাযাবরের এখানকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে ঘর বাঁধার সাধ হয়েছিল। তারা ওই কুটিরটি অদ্ভুতভাবে নির্মাণ করেছিল। এদেশে এই ধরনের কুটির দেখা যায় না। তাদের চালচলন আর হাবভাবও অন্য রকমের ছিল। তারা যে কোন দেশের মানুষ নিজেরাই জানত না। জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসত। তাদের পোশাক অন্যরকমের, ভাষাও ততটা বোধগম্য হত না। তবে খুব কর্মঠ ছিল তারা। শহরের পথেঘাটে ঘুরে ঘুরে সুন্দর সুন্দর পাথর বিক্রয় করত তারা। দুই তিনটি বড় বড় লোমের কুকুর ছিল তাদের।

তারপর এক দেড়বছর অতিবাহিত হতে না হতেই এখানে বসবাসের সাধ মিটে গেল

তাদের। রক্তের মধ্যে ওদের বোধহয় স্থিরতা নেই। ওদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় মহারাজা সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তবু থাকতে পারল না ওরা।

একদিন প্রত্যুষে নদীতে স্নানে এসে সবাই দেখল ওরা উধাও হয়েছে। শুধু কুটিরটি পড়ে রয়েছে। যাওয়ার আগে কাউকে বলেও যায়নি। মহারাজা জেনে বললেন—ওরা যাওয়ার আগে কারও কাছে কোন সাহায্য চায়নি। কিছু ধারেও না। ওরা সব সময় সংসার থেকে মুক্ত। তাই জানাবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

প্রায় দুই বছর পরে গঙ্গের মানুষ একদিন আবার লক্ষ্য করল সেখানে এক বৃদ্ধ, সঙ্গে একজন মধ্য যৌবনের পুরুষ এবং বোধহয় তার স্ত্রী সেই কুটিরে বাসা বেঁধেছে। মনে হয় রাতেই এসেছে। কারণ বৃদ্ধ কুটিরটিকে বাসোপযোগী করে তোলার জন্য পরিষ্কার করছে।

সবার মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। দলবেঁধে বারবার দেখে যায়। নবাগতেরা সবাইকে দেখছে, কিন্তু কথা বলছে না। অথচ এদের সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় সম্ভ্রান্ত। যাযাবর কখনই নয়। শেষে ওদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যক্তি এগিয়ে এসে একটা কিছু জানতে চায়। কেউ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

একজন বলে—গুণবানকে সংবাদ দিলে হয়।

আর একজন বলে—সে তো গড়ের ভেতরে।

—তা হোক। মহারাজ বলে দিয়েছেন কোও বিদেশী এলেই গুণবানকে জানাতে।

অতি উৎসাহী একজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটল।

গুণবানের আসতে দেরি হল। ততক্ষণে কৌতূহলী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ততটা নয়। কারণ এই সময় সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনাবশ্যক সময় নষ্ট করার অবকাশ খুব অল্প মানুষের রয়েছে গঙ্গে নগরীতে।

গুণবান এলে বৃদ্ধ তাকে বলে—আমরা উজ্জয়িনী নগরী থেকে আসছি।

তার প্রথম কথাতেই গুণবান বিস্মিত হয়। বলে—আপনারা তো আমাদের মহারানীর দেশের অধিবাসী।

—হ্যাঁ। নিশ্চিন্ত হলাম। ভেবেছিলাম এখানে কেউ আমাদের বোধহয় চিনতে পারবে না।

—কিন্তু এদের কেউ আপনার কথা বুঝতে পারল না!

—না।

—হতে পারে। সবাই তো সংস্কৃতিসম্পন্ন নয়। তাছাড়া উচ্চারণে অনেক প্রভেদ থাকে। এরা বোধহয় বোঝায় চেষ্টাও করেনি। চেষ্টা করলে, না বোঝার কারণ ছিল না। এবারে বলুন, উজ্জয়িনী থেকে আপনাদের আগমনের হেতু কী। মহারাজের শ্বশুরালয়ের কোন সংবাদ রয়েছে কি?

—সংবাদ অবশ্যই রয়েছে। তবে মহারাজের শ্বশুরালয়ের সংবাদ শুভ। তিনি আমাদের পাঠাননি। তাঁরা জানেনও না যে আমরা এখানে এসেছি। আমরা গোপনে এসেছি।

গুণবানের মনে সন্দেহ উঁকি মারে। এই বৃদ্ধের কথাবার্তায় কোন যুক্তি খুঁজে পায় না। সে প্রশ্ন করে—আপনি কে? আপনার পরিচয়?

—আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। কোন রাজপরিবারের সঙ্গে আমার বিন্দুবিসর্গ সম্পর্কও নেই। ওঁরা দুজনাও রাজপরিবারের কেউ নন। তবে ওই রমণীর এই দেশের বাইরের এক রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। যদিও সে সব অতীতের কথা। আমি এই যুবকের পরিবারের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আমার আপন বলতে অন্য কেউ নেই। কারণ আমি দার পরিগ্রহ করিনি। এঁর পিতা অত্যন্ত বিদ্বান ও প্রতিষ্ঠিত। ইনি নিজেও খুবই বিখ্যাত। এঁর জীবনটাই চমকপ্রদ।

—বলুন তবে সেই চমকপ্রদ জীবনের কথা।

—আমি আর কিছুই বলব না। যা কিছু বলবেন উনি। কিন্তু আপনাকে নয়। উনি বলতে চান স্বয়ং মহারাজকে। আমি ওঁর সঙ্গে এসেছি মাত্র। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে জেনেও এসেছি। ওঁর চেয়ে প্রিয়জন আমার তো কেউ নেই এই জগতে।

গুণবান প্রশ্ন করে—কখন যাবেন?

—আমরা তো জানি না মহারাজা কখন দেখা করেন। রাজসভা কখন বসে তাও জানি না।

—আপনারা কখন যেতে চান?

—আপনি দেখা করিয়ে দেবেন?

—দেব।

—একটু অপেক্ষা করুন, জেনে আসছি।

বৃদ্ধ ওই যুবকের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গুণবানের নিকটে আসে। গুণবান যুবকের মুখের দিকে চেয়ে নিমেষেই বুঝতে পারে উনি সাধারণ নন। সে তাঁকে বলে—আপনি আমার সঙ্গে মহারাজের কাছে যেতে পারেন।

যুবক উৎসাহিত হয়ে বলেন—আমি এখনি যেতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার স্ত্রীকে এই অপরিচিত স্থানে রেখে যেতে ভরসা পাচ্ছি না।

গুণবান বুঝতে পারে যুবকের যুক্তি তর্কাতীত। সে তখন বলে—আপনি যদি আপনার নাম বলেন আমি মহারাজকে গিয়ে বলতে পারি।

—সেটা কি উচিত হবে? তিনি অন্যভাবে নিতে পারেন।

—আমাদের মহারাজের মন খুব উদার। বিশেষত আপনাদের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই নেই। আপনি নাম বলুন, আর বলুন কখন যেতে পারবেন। উনি ব্যবস্থা করে দেবেন।

—উনি আমাকে চিনতে পারেন। আমার নাম মিহির।

গুণবান চিনতে পারল না। মিহির সেই সঙ্গে তাঁর পিতার নাম বললে অবশ্যই চিনত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা বললেন না। গুণবান সোজা রাজপুরীতে চলে আসে। প্রধান প্রহরী সুহস্তকে বলল যে মহারাজের সঙ্গে এই মুহূর্তে দেখা করতে চায়।

সুহস্ত গুণবানকে খুব ভাল চেনে। সে এও জানে যে গুণবান আর বল্লভ তাঁর প্রিয়পাত্র শুধু নয়, তাদের গুরুত্বও অপরিসীম মহারাজের কাছে। সে বলে, মহারাজ এখন উদ্যানে রয়েছেন, একাই রয়েছেন।

—আমি যেতে পারি? উনি কিছু ভাববেন না তো?

—না। আপনি নিশ্চিন্তে যান।

গুণবানকে ওই সময়ে উদ্যানে দেখে মহারাজ বিস্মিত হন। তিনি বলেন—তুমি এখানে?

—মহারাজ। একটি সংবাদ জানাতে আসতে হল। সংবাদটির গুরুত্ব রয়েছে বুঝে সুহস্তের অনুমতি নিয়ে এখানে চলে এসেছি।

—ভালই করেছ। বল, কী সংবাদ।

—উজ্জয়িনী থেকে এক দম্পতি এসেছেন গড়ের বাইরে নদীর ধারে পরিত্যক্ত কুটিরটিতে।

—উজ্জয়িনী থেকে? আশ্চর্য! এত স্থান থাকতে এই দূর দেশে?

—সেই যুবক বললেন, আপনি হয়ত তাঁকে চিনতে পারেন। তিনি আমার সঙ্গে আসতে পারলেন না। কারণ তাঁর স্ত্রীকে একা এক বৃদ্ধের তত্ত্বাবধানে রেখে আসতে সাহস পেলেন না।

—নাম বলেছে কী?

—হ্যাঁ। নাম বললেন, মিহির।

মহারাজা লাফিয়ে ওঠেন—মিহির! তাঁর স্ত্রী খনাকেও সঙ্গে এনেছেন আমার রাজ্যে! এযে কল্পনাও করতে পারছি না, গুণবান। মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। আজ তুমি আমাকে যে শুভ সংবাদ শোনালে এমন কেউ কখনো শোনাতে পারবে না। চল সবাইকে ডেকে পাঠাই। শিতিকণ্ঠ, চিত্রক যক্ষ, ধনুর্ধর শল্য—সবাইকে ডাকতে হবে। শিবিকা নিতে হবে।

গুণবান মহারাজের প্রতিক্রিয়া দেখে স্তম্ভিত। ভাবে পুঁথিতে দিনরাত মাথা গুঁজে থাকলে জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু অজানা থেকে যায়। অথচ মহারাজা কত জানেন।

দ্রুত আয়োজন করা হল। মহারাজা, গুণবান আর চিত্রক মন্দারকে নিয়ে প্রথমে যাত্রা কবলেন। একটি সজ্জিত শিবিকা চলল সঙ্গে। সবশেষে কালিনীর পৃষ্ঠে যক্ষ, শল্য আর ধনুর্ধর চলল। মহারাজা অচঞ্চলকে বললেন একটি অশ্ব নিয়ে যেতে। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে ফিরবেন। মিহির-পত্নী খনা শিবিকায় আসবেন।

গড় অতিক্রম করার সময় মহারাজের মনে পড়ল, তাড়াতাড়িতে তিনি একটি মারাত্মক অন্যায় করে ফেলেছেন। তিনি তাঁর প্রথমা রানী দেবাযানীকে মিহিরের আগমন বার্তা জানাতে ভুলে গিয়েছেন। ফিরে গিয়ে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। কিন্তু এই ভুলের ফলে যাঁকে আহত করা হল তিনি নিশ্চয় বুঝলেন এই রাজ্যে তিনি আজ কতখানি অবহেলিত। মহারাজ নীরব হয়ে রইলেন। সুহৃদ চিত্রক তাঁকে নানাভাবে নানা প্রশ্ন করেও উত্তর পায় না। শেষে নিজেই চুপ করে যায়। অনুমান করে বড়রানীর দেশের মানুষ বলে বোধহয় মহারাজ বিমর্ষ। তার অন্তত জানতে বাকি নেই যে বড়রানী মহারাজকে একফোঁটাও আনন্দ দিতে পারেন নি। তিনি গন্ধহীন এক সুদৃশ্য শাল্মলি পুষ্প।

কুটিরের সম্মুখে গিয়ে মহারাজ সবাইকে পেছনে ফেলে দ্রুতপদে এগিয়ে যান। সেখানে মিহির খনাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন না এত আড়ম্বর করে কে এদিকে আসছে।

খনা মৃদুস্বরে বলেন—মহারাজ বোধহয় সেনাপতি পাঠিয়েছেন তাদের উচ্ছেদ করার জন্য। তাঁর নিশ্চয় তোমার কথা মনে নেই। ভেবেছেন, অবাঞ্ছিত কোন ব্যক্তি।

—না, না তা হবে কেন! বোধহয় যাচাই করতে পাঠিয়েছেন।

ততক্ষণে মহারাজা ওঁদের সম্মুখে গিয়ে মাথা নত করে সম্মান জানিয়ে বলেন—আমি মহারাজা চন্দ্রকেতু।

এবারে স্বামী-স্ত্রীর বিস্ময়ের পালা। মিহির বলে ওঠেন—আমাদের মত সামান্য ব্যক্তিদের জন্য আপনি স্বয়ং এলেন? আমরা অত্যন্ত সঙ্কোচবোধ করছি।

ততক্ষণে যক্ষ এগিয়ে এসে নমস্কার করে। তাকে দেখে মিহির চিনতে পারেন। হেসে বলেন—ভাল আছেন?

—আপনার কৃপায়।

মহারাজা বলেন—আপনারা আমার সম্মানীয় অতিথি। আমি আমার দূত এই যক্ষের মাধ্যমে আমার সেই মনোভাবের কথা আপনাদের জানাতে বলেছিলাম। যদিও এই সৌভাগ্য কল্পনাতীত। এতদূর এইভাবে কেন এলেন, তা জানতে কৌতূহল রইল।

—সে অনেক কথা।

—সব পরে শুনব। আপনারা এখন প্রাসাদে চলুন।

—প্রাসাদে কেন?

— সেখানে সাময়িকভাবে আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হবে। আগে যদি জানতে পারতাম এই দুর্ভোগ আপনাদের ভুগতে হত না।

—আমরা একে দুর্ভোগ ভাবি না। মানুষের জীবন বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, সঞ্জীবিত রাখে। আমাদের দুজনার মধ্যে বিশেষ করে আমার জীবন, জন্ম থেকেই ঘটনাবহুল।

—আসুন।

প্রথমে মিহির-পত্নী খনা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন। অপরিচিতের দেশে অবগুণ্ঠন শোভনীয়। কথাবার্তার পরে তাঁর অবগুণ্ঠন কিছুটা খসে যায়। মহারাজা এক পলকেই বুঝলেন যে এই নারী অসামান্যা প্রতিভাময়ী। এঁর বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অভিব্যক্তি দেখেই মহারাজ বোঝেন মিহিরের যোগ্য সহধর্মিণী ইনি।

তাঁকে শিবিকার দিকে নিয়ে যায় যক্ষ। কারণ সে খনার একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি। মিহির যক্ষ ও অচঞ্চলের সঙ্গে মন্দারের পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অন্যান্যরা কালিনীর সাহায্য নেয়। মহারাজ অশ্ব নিয়ে সবার সামনে চলতে থাকেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করে শল্যকে বলেন—আপনি চিত্রকের সাহায্যে এঁদের থাকার ব্যবস্থা করুন প্রাসাদ প্রাঙ্গণের দক্ষিণের কুটিরে। এখনি নিয়ে যান, যাতে এঁরা যথাসময়ে স্নানহার করে নিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারেন।

শল্য বলে—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ।

প্রাসাদের এবং রাজধানীর কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না এমন কারা এলেন যাঁদের জন্য মহারাজ স্বয়ং এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমন তারা কখনো দেখেনি। রানী উর্মিলা বাতায়ন পথে চেয়ে দেখলেন মিহির ও খনাকে। অতি সাধারণ বেশবাস। অত্যন্ত কোন দেশের রাজা বা রানী কখনই নন। তিনি নিজের কক্ষের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। সখী চন্দ্রমুখী এখন

নেই। তবে তাঁর পরিচারিকা বিনীতা রয়েছে বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুটা দূরে। দেবযানীর কক্ষের বাইরে পৃথা বসেছিল। মধুভাণ্ড তখনো সে আনেনি। সে জানে এই রানী তার নিজের দেশের কন্যার চেয়ে অনেক ভাল। তাই তাঁকে স্বয়ং দ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে উঠে দাঁড়ায়। দাসীর প্রতি এই ব্যবহার ও দেশের কেউ কল্পনা করতে পারে না। বিনীতা মেয়েটার ভাগ্য ভাল। সুহস্ত যদি তার আপনজন হয়, তাহলে সেও নিশ্চয় আরও সহস্র গুণ মিষ্ট ব্যবহার করবে। কিন্তু সেই আশা কি কখনো ফলবতী হবে?

রানী উর্মিলা স্বামীর পদশব্দ শুনতে পান। এদিকেই আসছেন। প্রতিদিন তাঁকে দেখেন, নিবিড়ভাবেই দেখেন। তবু বুকের মধ্যে এমন দুরু দুরু করে কেন? কিসের আশায়? আশায় আবার দুরু দুরু করে নাকি? নৃত্য করবে তো। না না, অতি আশায় করে বৈকি।

মহারাজা তাঁর দিকে এগিয়ে না এসে অতি দ্রুত তাঁকে অতিক্রম করে যান। উর্মিলা বিস্ময়াবিষ্ট হন। এমন হবে, তিনি কল্পনা করেননি। তাঁর অভিমান হয়। তারপর যখন দেখেন মহারাজা রাণী দেবযানীর কক্ষে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সামনে বিনীতা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে চাইলেন। যাতে সে তাঁর অশ্রু দেখতে না পায়। কারণ সবাই জেনে যেতে পারে। মনকে তিনি প্রবোধ দেন এই ভেবে যে নিশ্চয় কোন গুরুতর কারণ রয়েছে। দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে নিজের পালঙ্কে বসে নানা আশঙ্কায় পীড়িত হতে থাকেন। কল্পনা করেন এতক্ষণে এক আসামান্য সুন্দরীর মৃণাল ভুজে আবদ্ধ হয়ে তিনি বোধ হয় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন, যেমন দেখেছেন তাঁর নিজের বেলায়। সেই মুখ তো নতুন নয় এই অসুন্দর মুখের চেয়ে অনেক বেশি পবিচিত। বিনীতা কি তাঁর অশ্রু দেখতে পেয়েছে? দেখলে কি ভাবল কে জানে। আর কাউকে না বলুক চন্দ্রমুখীকে তো বলবেই। আর চন্দ্রমুখী তিলকে তাল করবে। ওর স্বভাব ওই রকম।

মহারাজা প্রথম রানী দেবযানীর কক্ষে প্রবেশের শব্দে মহারানী পেছনে ফিরে চান। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কিছু ভাবছিলেন। একটু অনমনস্ক ছিলেন। মহারাজ যে তাঁর কাছে অনেকদিন পরে এলেন একথা প্রথমে তাঁর মাথায় আসেনি। যখন এল, তখন তাঁর চাহনিতে বিস্ময় ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

—তোমাকে আসতে হবে না দেবযানী।

—হঠাৎ আমার কাছে—

—দেবযানী, আমি ওসব নিয়ে কথা বলতে আসিনি। আমি এসেছি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে।

—ক্ষমা? আমার কাছে? হতে পারে না। আপনি ক্ষমা চাওয়ার মত কোন কাজ করেননি, করতেও পারবেন না। ক্ষমা আমি চাইব অমার অপরাধের জন্য।

—না দেবযানী। আগে আমার কথা শোনো, তাহলে বুঝতে পারবে। তোমার দেশ থেকে কোন ব্যক্তি আমার রাজ্যে এলে সর্বপ্রথম সেই সংবাদ তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য। আমি জানাইনি।

—কে এসেছে? আমার মা-বাবা ভাল আছেন?

—কোন সংবাদ নিয়ে তাঁরা আসেননি। তাঁরা এসেছেন গোপনে। মহারাজা বিক্রমাদিত্যও জানেন না।

—কারা তাঁরা।

—বরাহ-পুত্র মিহির তাঁর পত্নী খনাকে নিয়ে গড়ের বাইরে একটি কুটিরে এসে উঠেছিলেন।

দেবযানী এবারে উৎসাহিত হয়ে বলেন—তাঁরা এসেছেন? কিন্তু এখানে কেন? এতদূর এলেনই বা কেন? তাও আবার গোপনে।

—তোমার মনে যেমন অজস্র প্রশ্ন, আমারও তেমনি। তবে তোমার মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য আমি সংবাদ পেয়ে নিজে গিয়ে তাঁদের সসম্মানে রাজপুরীতে নিয়ে এসেছি। মনে হল তারা খুব ক্লান্ত। তাই তাঁদের বিশ্রাম আর আহারের ব্যবস্থা করে তোমার কাছে এসেছি।

—আপনি বলেই সম্ভব। এত গভীরভাবে চিন্তা শুধু আপনি করতে পারেন।

—ক্ষমা করেছ তাহলে?

—ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। জীবনে যদি কখনো আমাকে ক্ষমা করতে পারেন, জানালে আমি তৃপ্তি পাব।

—নিজের স্ত্রীর আচরণে আঘাত পেতে পারি, কিন্তু তাকে অপরাধিনী বলে ভাবতে পারি না। তাই ক্ষমা করার প্রশ্ন ওঠে না দেবযানী।

দেবযানীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলেন—এ আপনার অন্তরের কথা?

—হ্যাঁ দেবযানী।

—আমি—

কিন্তু কথা শুরু করার আগেই মহারাজ বলেন—এখন আমি চলি। ওঁদের এখানে আসার কারণ জানতে হবে। নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

দেবযানীর বলার ইচ্ছা ছিল যে তাঁর কক্ষে মহারাজের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই স্পর্ধা তাঁর আর নেই। শুধু বলেন—আমি জানতে পারব তো?

—অবশ্যই।

অর্থাৎ মহারাজ আবার আসবেন দু'একদিনের মধ্যে এবং তাঁকে জানাবেন। এই গুরুত্বটুকু হারিয়ে ফেলে নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয় তাঁর।

মহারাজ চন্দ্রকেতু এবারে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী উর্মিলার কক্ষে প্রবেশ করেন। দেখেন উর্মিলা তাঁর পালঙ্কের ওপর বিষণ্ণ বদনে বসে রয়েছেন। তিনি তাঁর পাশে বসে চিবুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে ধরে বলেন—রানীর কি অভিমান হয়েছে? তোমাকে অগ্রাহ্য করে দেবযানীর কক্ষে প্রবেশ করলাম। কতখানি স্পর্ধা হলে এমন করতে পারি।

উর্মিলার ততক্ষণে সব কিছু গলে জল। তিনি করুণ কণ্ঠে বলেন—তুমি আমাকে খেপাচ্ছ কেন শুধু শুধু।

—কী করব? অমন বিষাদ-প্রতিমাকে দেখলে কি আনন্দ হয়?

—আমি বুঝেছিলাম, নিশ্চয় কোন কারণ রয়েছে।

—তুমি বুদ্ধিমতী, তাই বুঝেছ। সবাই কি তোমার মত হয়?

—কি হয়েছে?

—দেবযানীর দেশের এক বিখ্যাত দম্পতি এসেছেন। তাঁদের ওদেশেও খুব সম্মান। আমি নিজে গিয়েছিলাম নিয়ে আসতে। অথচ দেবযানীকে আগে জানাইনি। কাজটা কতখানি গর্হিত হয়েছিল। ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলাম।

—তুমি!

—হ্যাঁ।

—অন্যায় করলে কখন?

—ওকে বলে যাইনি, অথচ ওর দেশের বিখ্যাত এঁরা দুজনাই।

—তুমি তো সবই করেছ। যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে নিয়ে এসেছ। এর চেয়ে বেশি কেউ করে বলে আমি জানি না। তবে তোমার বিবেক যদি বলে, ঠিক করনি, তাহলে ক্ষমা চেয়ে ভালই করেছ। তিনি নিশ্চয় ক্ষমা করেছেন।

—মনে হল করেছে।

—মনে হল?

—না না, ক্ষমা করেছে। তার ধারণা এটা ক্ষমা চাওয়ার যোগ্য অপরাধই নয়।

—ঠিক বলেছেন উনি। এবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বস। সকাল থেকে তো ছোটাছুটি করছ।

—একে ছোটাছুটি বলে নাকি? তবে তুমি যখন বলছ তবে তোমার কাছে বসে খেয়ে যেতে পারি। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। নবাগত অতিথিদের এখানে চলে আসার কারণ এখনো জানা হয়নি।

—আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।

ঊর্মিলা বাইরে গিয়ে দেখেন চন্দ্রমুখী তখনো আসেনি। মনে মনে একটু বিরক্ত হন। বিনীতাকে বলেন—মহারাজ এখানে মধ্যাহ্নের আহার করবেন। খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করতে বল।

কথাটা অদূরে দণ্ডায়মান পৃথার কানে যায়। সে আনন্দ চেপে থাকতে না পেবে ছুটে দেবযানীর কক্ষে প্রবেশ করে সংবাদটা তাঁর কর্ণগোচর করতে, যাতে অন্তরে তিনি বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভব করেন।

মহারাজা চন্দ্রকেতু মিহির এবং খনার যথোপযুক্ত আহার এবং বিশ্রামের পরে নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় শুরু করলেন। ওঁদের শুভানুধ্যায়ী বৃদ্ধ ত্র্যম্বক আহারের পরে ক্লান্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে বলে অনুপস্থিত রয়েছে।

মিহির প্রথমেই অন্য কথা শুরু করার আগে বৃদ্ধের পরিচয় প্রদান করে বলেন—ওঁর নাম ত্র্যম্বক শর্মা। উনি আমার পিতৃতুল্য। আমার তত্ত্বাবধায়কও বলতে পারেন। তবে সব কথা বলার আগে সহসা এতদূরে এভাবে কেন চলে এলাম তার কারণ প্রদর্শন করা প্রয়োজন।

মহারাজ তাড়াতাড়ি বলেন—আমি কোন কারণ প্রদর্শন করতে বলছি না। আপনারা এমন অভাবিতভাবে এইদেশে এসেছেন বলে আমি অভিভূত।

—তবু আমার বিবেক পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সব কিছু খুলে বলার প্রয়োজন রয়েছে। আপনার মনে নিশ্চয় প্রশ্ন জেগেছে এভাবে আমাদের চলে আসার কী কারণ ঘটল। আমি তো স্বাভাবিকভাবে মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে অনুরোধ করে দূত পাঠিয়ে আপনাকে আমার আগমনবার্তা পূর্ব থেকে জানাতে পারতাম। আমরা তা করিনি। কারণ আমরা সবার অগোচরে পালিয়ে এসেছি।

মহারাজা অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। মুখ দিয়ে তাঁর কথা সরে না।

—হ্যাঁ, আমরা পালিয়ে এসেছি। খনা, তুমি বলবে?

খনা মৃদু হেসে স্বামীকে বলেন—তুমিই বল। আমি সঙ্কোচবোধ করছি। আমি কখনো বিশ্বাস করব না এর পশ্চাতে তোমাদের অর্থাৎ পিতাপুত্রের অজ্ঞতাই কারণ। তোমরা উভয়েই তখন শনিগ্রহের রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রচেষ্টায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত ছিলে। তাই মনোনিবেশ করতে পারনি।

মিহির স্ত্রীকে বলেন—তোমার বিশ্বাস যাই হোক, উজ্জয়িনীবাসীরা জেনেছে যে মহারাজা বিক্রমাদিত্য কোন এক বিষয়ে প্রশ্ন রেখে উত্তর চেয়েছিলেন তাঁর রত্নসভার দুই রত্ন বরাহ আর মিহিরের কাছে। তাঁদের দুজনার কেউ উত্তর দিতে পারে নি। রাজ্যবাসী একথাও জেনেছে যে, তখন মহারাজা মিহিরের পত্নীর গভীর জ্ঞানের কথা শুনে, তাঁর কাছেও প্রশ্নটির উত্তর জানতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বামীর মাধ্যমে। তিনি সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। বিক্রমাদিত্য অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে খনাকে দশম রত্নরূপে সভায় স্থান দিতে চান।

মিহির এবারে মৃদু হেসে চন্দ্রকেতুকে প্রশ্ন করেন—আপনার স্ত্রী যদি তাঁর জ্ঞানের দ্বারা কোন বিষয়ে আপনাকে পরাভূত করেন, আপনার মানসিক প্রতিক্রিয়া কেমন হবে?

চন্দ্রকেতু তৎক্ষণাৎ বলেন—কেন? আনন্দ হবে। কোন মানুষই সর্বজ্ঞ নয়। কোন ব্যক্তি পরিপূর্ণ নয়। তাহলে ঈশ্বর আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়?

মিহির সপ্রশংস দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে চেয়ে বলেন—আপনি অত্যন্ত উন্নত মনের ব্যক্তি। কিন্তু সবাই তো আপনার মত নন। আমার পিতা খুবই কোপন স্বভাবের ব্যক্তি। তার ওপর তাঁর আত্মভিমান অত্যন্ত প্রবল। তিনি পুত্রবধূর এই অভাবনীয় কৃতিত্বে অপমানিত বোধ করলেন। এই পরাজয় তাঁর আত্মাভিমানে প্রচণ্ড আঘাত করে এবং তিনি ভাবেন ভবিষ্যতে আবার কখনো এমন হলে তাঁর মর্যাদা ধুলায় লুটাবে এবং সবাই খনাকে ওই দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানবতী বলে মনে করবে। তিনি আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজের মা-কে হত্যা করেছিলেন। আমি তোমার মা-কে হত্যা করতে বলতে পারি না। কারণ তিনি স্বর্গবাসিনী। তোমার স্ত্রীকেও হত্যা করতে বলছি না। তুমি শুধু তোমার স্ত্রীর জিহ্বা কর্তন কর। আমি জানি, বিশেষ কোন কারণবশত সে লেখনী স্পর্শ করে না। এক বর্ণও লেখে না। আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছি, সে বলেনি। তুমি জান কিনা জানি না। তুমি তার জিহ্বা কর্তন করে নিলে সে লিখেও কিছু জানাতে পারবে না। এই ভাবে আমি আর তুমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকতে পারব।

চন্দ্রকেতু অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চেয়ে বলেন—একি সত্য!

—হ্যাঁ সত্য। আমি পিতার মনোভাব প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম। খনা অতটা তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করেনি। যদিও পিতার পুত্র হলেও খনা এবং আমি জীবনে প্রথম পিতার সঙ্গে পরিচিত হই একই দিনে এবং একই মুহূর্তে। সে আর এক কাহিনী। সেই কাহিনী তাত ত্র্যম্বকের কাছ থেকে পরে জেনে নেবেন। আমার জন্য যাতে পিতার মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য আমি সর্বদা সর্তক ছিলাম। তিনি কোন কিছু মীমাংসায় ব্যর্থ হলে আমিও স্বেচ্ছায় ব্যর্থতা বরণ করতাম। কিন্তু মহারাজা যে প্রশ্নটি করেছিলেন, আমি ভেবেছিলাম খনাও হয়ত উত্তর দিতে ব্যর্থ হবে। আমার এই সামান্য ভুলের জন্য এত কাণ্ড। এও আমার এক শিক্ষা। শৈশব থেকে নিজের স্ত্রীকে দেখেও তাঁর জ্ঞান যে কত অপরিমেয়, আমি বুঝতে পারিনি।

চন্দ্রকেতুর মনে সহস্র প্রশ্ন। কিন্তু তিনি কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করে মিহিরের কথায় বাধা দিতে চাইলেন না। মিহিরকে তিনি নিজে থেকে সবকিছু বলতে দিলেন।

মিহির একটু হেসে বলেন—দেখতেই পাচ্ছেন এঁর জিহ্বা অক্ষত রয়েছে। তেমন ঘটলে উনি বাঁচতেন কিনা সন্দেহ। আর সেই অবস্থায় ওঁকে নিয়ে এত দূরপথে আসবই বা কেন? প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া পিতৃআজ্ঞা পালন করলে মহারাজা বিক্রমাদিত্য কি আমাকে ক্ষমা করতেন? তিনি জানেন খনা আমার স্ত্রী হলেও তিনি বিদুষী-শ্রেষ্ঠ। তাঁর নিজের পরিচয়ে তিনি খ্যাতনাম্নী। তাই তাত ত্র্যম্বক আমাদের অবিলম্বে দেশত্যাগ করতে বললেন। আর বললেন তিনিও আমাদের সঙ্গী হবেন। কিন্তু কোথায় যাব? এই বিশাল দেশের কোন্ রাজ্য আমাদের ঠাঁই দেবে? সহসা আপনার কথা স্মরণে এল। তাই এইভাবে এসেছি।

মহারাজা চন্দ্রকেতু বিনয়ের সঙ্গে বলেন—আমার কথা যে আপনার মনে পড়েছিল এজন্য নিজেকে ধন্য বলে মনে করছি। আপনার জীবন কাহিনী জানতে আমার মনে যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। আপনি বললেন, শৈশব থেকে স্ত্রীর সঙ্গে আপনার পরিচয়। অথচ আপনি বললেন আপনার পিতা জ্যোতিষাচার্য বরাহের সঙ্গে আপনাদের উভয়ের পরিচয় ঘটে একই মুহূর্তে। আমি কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না।

—এই কৌতূহল খুব স্বাভাবিক। আপনার কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটাবেন তাত ত্র্যম্বক শর্মা। তিনি সবিস্তারে আপনাকে সব বলবেন। তার পূর্বে আপনাকে একটি কথা বলতে চাই।

—স্বচ্ছন্দে বলুন।

—রাজপুরীতে অনির্দিষ্ট কাল থাকতে পারি না। খুব দৃষ্টিকটু লাগবে। আপনি যদি একটি কুটির নির্মাণের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে খুব উপকার হয়। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের মত থাকতে চাই।

—অবশ্যই। আপনার সম্মানের কথা ভেবে আমি মনস্থির করেছিলাম। নিজে থেকেই বলতাম।

—আর একটা কথা। আমি সব কিছু ফেলে এলেও সঙ্গে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা এনেছি। গৃহনির্মাণের ব্যয় আমি বহন করব।

চন্দ্রকেতু একটু ভেবে নিয়ে বলেন—তাই দেবেন। আপনাকে একটি কাষ্ঠনির্মিত গৃহ তৈরি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

—আমার ইচ্ছা আছে, পরে আমার বাসগৃহ সংলগ্ন একটি বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করব।

খনা এতক্ষণ পরে প্রথম বলেন—তুমি বরাবর সূর্য মন্দিরের কথা বলতে।

—তাই হবে। আমার নিকট বিষ্ণু আর সূর্য ভিন্ন নন।

চন্দ্রকেতু বলেন—আমার একটি অনুরোধ রয়েছে।

—অনুরোধ কেন বলছেন মহারাজ, আপনি সব কিছুই বলতে পারেন।

—আপনার মন্দির হবে ইষ্টক নির্মিত। এদেশে ইষ্টক দিয়ে গৃহনির্মাণের সূচনা হবে।

চন্দ্রকেতু বল্লভের কথা বিস্তারিতভাবে বলেন। তারপর বলেন—তার নির্মিত অট্টালিকার ক্ষুদ্র নিদর্শন তার উদ্যানেই রয়েছে। আপনি ইচ্ছা করলে দেখে আসতে পারেন।

খনা বলেন—আমরা অবশ্যই দেখে আসব। কিন্তু তার আগেই আমাদের সম্মতি জানিয়ে দিলাম। আপনি ইষ্টক নির্মাণের ব্যবস্থার নির্দেশ দিলে ভাল হয়।

চন্দ্রকেতু যারপরনাই উৎসাহিত হন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। বছরের পর আরও দু'এক বছর অতিক্রান্ত হয়। চন্দ্রকেতু গড়ের বৃহস্পতি তুঙ্গে। প্রজারা বলে, ছোটরানী আসার পর থেকে সুদিন এসেছে। অধিকাংশ মানুষের ধারণা খনা-মিহিরের আগমনই এত উন্নতির মূলে। যারা ছোটরাণীর গুণমুগ্ধ তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে—ওঁরা কার ভাগ্যে এলেন? ছোটরানী না এলে হয়ত তাঁরা আসতেন না।

সবাই বলে—একথা অবশ্য ঠিক।

খনা-মিহিরের নিবাসে প্রায় দিনই বহু মানুষের সমাগম। তারা সেখানে যায় তাদের ভাগ্য জানতে তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবহিত হতে। মিহির তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেন ভবিষ্যৎ জানা অত সহজ নয়। সবকিছু সর্বাংশে সঠিক হয় না। তিনি নিজেও জানতেন না সুদূর উজ্জয়িনী থেকে তাঁকে এদেশে আসতে হবে। কথাটা ওরা বোঝে। কথায় কথায় অত পীড়াপীড়ি করে না। তবে যারা কৃষক তাদের আগমন বন্ধ করা যায় না। তারা জানে খনার পরামর্শে গঙ্গারিদির কদলী উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শালিধানের ফলন বছরের পর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যান্য জাতের ধানের উৎপাদনও খুব ভাল।

খনা যে লিখতে পারেন না একথা কারও বিশ্বাস হয় না। চন্দ্রকেতুর ও ঊর্মিলারও নয়। দেবযানীর মনের কথা বোঝার উপায় নেই। এই দুই-তিন বছরে তাঁর রূপ আগের মতই উপচে পড়ছে। কিন্তু এক রানীর রূপ এবং অন্য রানীর গুণ, কোন কিছুই মহারাজকে একটি সন্তান দিতে পারছে না। পুত্র তো নয়ই, কন্যাও নয়। মহারাজা কি রানী দেবযানীর সান্নিধ্যে যান? সে কথা পরে হবে। আগে খনার কথা খানিকটা হোক। তিনি লিখতে পারেন না, অথচ পড়তে পারেন। তাই কি কখনো হয়? মিহির কি বলেন? মিহিরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে সবাই দ্বিধায় পড়েছে। শুধু একজন ছাড়া। গুণবান তাঁর সঙ্গে বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও খানিকটা নিবিড় হয়েছে। তিনি বুঝেছেন গুণবানের অগাধ পড়াশোনা। সেই গুণবান একদিন কথায় কথায় ওঁর কাছে খনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল—ওঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি,

কোন বিদ্যাই বোধহয় ওঁর অনধীত নয়। উনি লিখতে পারেন না, একথা বিশ্বাস করব? আমি বিশ্বাস করি না। যে পড়তে পারে সে লিখতেও পারে।

মিহির হেসে বলেছিলেন—যদি জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও লেখনীতে হাত না দেন?

—চোখে দেখতে খুব মন্দ হলেও লিখতে পারবেন তিনি।

—খনাকেই তাহলে জিজ্ঞাসা কর। ও আমার স্ত্রী। সব সময় একসঙ্গে রয়েছি। আমি ওকে ওর জন্ম থেকে কখনো লেখনী হাতে দেখেনি।

—কেন?

—আমার ধারণা ওঁর পিতা বা মাতার প্রতি নিশ্চয় কোন দেবতার নির্দেশ। অথবা কোন প্রতিজ্ঞা পালন। খনা হয়ত পূর্ব জন্ম থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। ও আমার স্ত্রী হবে একথা আগে জানলে আমি হয়ত চেষ্টা করতাম। তবে ওর একটা বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে।

—কোন্ ক্ষমতা?

—ও তোমার মত দ্রুত যে কোন ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া ও শ্রুতিধর। এদেশে এসে এখানকার কথায় বচন তৈরি করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা অসুবিধা হয়েছে বলে ভাবছি।

—কিসের অসুবিধা?

—আমাদের এদেশে আসার কারণ তোমরা সবাই জান।

—হ্যাঁ। স্ত্রীকে আপনি অত্যন্ত ভালবাসেন বলে।

—আমার এই বয়সে ওকথা শুনতে কেমন লাগে। বল্লভ বলে, দোপাটি তোমার নয়নের মণি। একথা তোমার শুনতে ভাল লাগে, কারণ তুমি এখনো তরুণ। কিন্তু আমি প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসে যাচ্ছি।

—তাই বলে ভালবাসা অন্যরকম হয় নাকি?

—ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম। কিন্তু ভালবাসা আমাদের পলায়নের প্রধান কারণ নয়। আমরা পালিয়েছি পিতার ভয়ে। সেজন্যে আমার পিতার প্রতি খনা অত্যন্ত বিরক্ত। তাই সে তার বচনের মধ্যে প্রায়ই নিজের শ্বশুরের উল্লেখ করে।

সেই সময়ে খনা সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। মিহির তাঁকে ডেকে বলেন, তোমার সেই কদলীর ছড়াটা শুনিয়ে দাও তো।

খনা হেসে বলেন—কলার ছড়া আবার শোনায় নাকি? খোসা ছাড়িয়ে খেতে হয়।

গুণবান হেসে ফেলে। মিহিরও হাসেন।

খনা গুণবানকে প্রশ্ন করেন—তুমি শুনতে চাও?

—হ্যাঁ।

—তুমি কি শ্রুতিধর?

—কখনই নই।

—আমি কিন্তু শ্রুতিধর।

—এই মাত্র শুনলাম। এখন বুঝতে পারছি, না লিখলেও আপনার চলে কি করে।

খনা বলেন—কলা সম্বন্ধে যতটা এ পর্যন্ত তৈরি করেছি সবটা বলি শোন। এমনিতেই

তাই কলাচাষীদের পরামর্শ দিয়েছি। তারা খুব ভাল ফল পেয়েছে। সবার মনে যাতে স্থায়ী ভাবে উপদেশগুলো থাকে তাই ছড়ার আকারে আমার এই পরামর্শ। বলব?

—হ্যাঁ।

খনা বলেন ঃ ডাক দিয়ে বলে খনা
আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুঁতো না।
যদি পোঁত ফাগুনে কলা।
কলা হবে মাস ফসলা॥

হঠাৎ এমন সুমিষ্টস্বর রূঢ় করে খনা বলে ওঠেন—

কি কর শ্বশুর মিছে খেটে।
ফাগুনে পোঁত এঁটে কেটে॥
বেঁধে যাবে ঝাড়কে ঝাড়।
কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়॥

গুণবান অপ্রস্তুত। মিহিরের মস্তক অবনত। খনা বলেন—কিছু মনে করো না। আমার শ্বশুর মহাশয় বিখ্যাত ব্যক্তি। ভবিষ্যতেও মনে রাখবে মানুষে। আমার বচনের মধ্যেও নাহয় একটু বেঁচে থাকুন। তুমি জান না স্বামী ছাড়া আমার কেউ নেই। পিতার অনুমতি নিয়ে তাঁর অতি-সচ্ছল আশ্রয় ত্যাগ করে স্বামীর হাত ধরে দেশ ছেড়েছিলাম। উনি আমার দেবতা। তবু আমি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম ওঁর অগোচরে। এই আঘাত ঈশ্বরের দান বলে মাথা পেতে নেওয়ার চেষ্টা করেও সব সময় পারি না। কারণ আমার কিছু হলে আমার স্বামী বাঁচবেন না। ভাবলেও শিউরে উঠি।

গুণবান শ্রদ্ধাবনত হয়ে খনার পদধূলি নেয়।

—একি করলে?

—প্রণম্য পদে প্রণাম করা বড় আনন্দের, বড় সুখের।

মহারাজ চন্দ্রকেতু সব শুনেছিলেন ত্র্যম্বক শর্মার কাছে। শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলেন বহুক্ষণ। মানুষের জীবনে যে এত বৈচিত্র্য এত উত্থান-পতন থাকতে পারে তিনি ভাবেননি কখনো।

বরাহের গণনা কতটা অভ্রান্ত ছিল জানা নেই। কিন্তু এর জন্য যতটা তাঁকে দোষ দেওয়া যায় ততটাই তিনি ধন্যবাদার্হ। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর ভাগ্য গণনা করেন। দেখেন সেই পুত্র স্বল্পায়ু। প্রসবের পর তাঁর স্ত্রী তখনো অর্ধ-অচেতন। ধাত্রীরূপে একজন প্রতিবেশিনী ছিল। সে তখন পাশেই তার গৃহে গিয়েছিল মধ্যাহ্নের আহার শেষ করতে। সেই সময়ে মিহিরকে মায়ের পাশ থেকে তুলে নিয়ে পণ্ডিত বরাহ একটি পেটিকায় শুইয়ে দিয়ে সাগর জলে ভাসিয়ে দেন। প্রসূতির চেতনা সম্পূর্ণ ফিরলে পাশে হাত দিয়ে সদ্যোজাত পুত্রের স্পর্শ পান না। তিনি আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বসেন। সেই সময়ে প্রতিবেশিনী মধ্যাহ্নের আহার শেষ করে এসে ভাল করে খুঁজে দেখে শিশুটি সত্যই নেই। সে ছুটে গিয়ে বরাহকে সংবাদ দিতে যায়। কিন্তু কোথায় বরাহ? তিনি তখন পেটিকা নিয়ে ছুটছেন সাগরের দিকে। তখন তাঁরা সমুদ্রের কাছেই থাকতেন। উজ্জয়িনীতে পরে এসেছেন।

বরাহ গৃহে ফিরলেন যখন তার পূর্বেই তাঁর স্ত্রী এবং সবাই বুঝে গিয়েছে যে এই সর্বনাশের মূলে নবজাতকের পিতা। তাই দেশের রাজার নিকট অভিযোগ জানাতে কেউ যেতে পারে না।

স্বামী গম্ভীর বদনে এসে দাঁড়াতেই স্ত্রী চিৎকার করে ওঠেন—এ কী সর্বনাশ তুমি করলে?

—খুব ভাল করেছি। দুই বছর পরেই তার মৃত্যু ছিল অবধারিত। সেই শোক তুমি সহ্য করতে পারতে না। এই শিশুর মুখও তুমি দেখনি ভাল করে। সব একদিনের শিশু দেখতে একরকম হয়। তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায় না। দুদিনে শোক কেটে যাবে।

উন্মাদিনীর মত তাঁর স্ত্রী বলে ওঠেন—তুমি একজন অতি কঠোর পুরুষ। কতটুকু খোঁজ রাখ মায়ের মনের? বল, কোথায় ফেলে এলে তাকে?

—সাগরে।

—তুমি কি মানুষ?

—জানি না। তবে ওকে বাঁচিয়ে রাখার এটাই একমাত্র পথ। হয়ত কোন ব্যক্তি ওকে উদ্ধার করবেন এবং ও কোন নিরাপদ আশ্রয় পাবে। তাহলে ও দীর্ঘায়ু হবে।

—এতো তোমার গণনা।

—হ্যাঁ। আমার গণনা অভ্রান্ত। এক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ সম্ভবত ওকে উদ্ধার করবেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের অনেক গুণ থাকে। এঁদের পূর্বপুরুষেরা মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সময় আলেকজান্দারের সঙ্গে পারস্য থেকে এসেছিলেন।

—তোমার ওসব পণ্ডিতি কথায় আমি ভুলছি না। আমার সন্তানকে দাও।

—কোথাও পাব তাকে? এখনো হয়ত সমুদ্রের তরঙ্গের তালে ভেসে চলেছে।

—মায়ের দুধ পাবে কোথায়?

—জানি না।

—স্বামীর নিন্দা করতে নেই। তুমি স্বামী না হলে মুখ দিয়ে যা উচ্চারণ করতাম, তুমি তাই। নিজের অহমিকা নিয়ে নিজেকে সর্বজ্ঞ ভেবে বসে আছ।

বরাহ অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বলে পরিচিত। তিনি সাগরতীরের এক অখ্যাত গ্রাম ছেড়ে নগরী উজ্জয়িনী এলেও সেই খ্যাতি অটুট রইল। পরে আরও বিস্তার লাভ করল। কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর গর্ভবতী হলেন না। একমাত্র সন্তানের শোকে ধীরে ধীরে তিনি রুগ্ণ হয়ে পড়লেন। পরে এই ঘটনার বারো বৎসর পরে তাঁর মৃত্যু হল। ফলে বরাহের গ্রামের একমাত্র সুহৃদ যে তাঁর সঙ্গে উজ্জয়িনীতে এসে একই গৃহে ছিল বন্ধুপত্নীর মৃত্যুর পরে সে ভিন্ন গৃহে চলে গেল। সব কিছুর একমাত্র সাক্ষী শুধু সে। বরাহ তাকে বলেছিলেন—তোমার স্ত্রীভাগ্য ভাল। সে হেসে বলেছিল—ওসব গণনা নিয়ে তুমি থাকো। আমাকে আর জড়িয়ো না। তাহলে তোমার দুর্নাম হবে। কারণ তোমাকে দেখে আমার চৈতন্য ফিরেছে। আমি বিবাহই করব না। করেও নি সে। বরাহের সংসারের দশা দেখে সংসার স্থাপনের রুচি তার চলে গিয়েছিল। বরাহের স্ত্রীকে সে কনিষ্ঠা ভগিনীর মত স্নেহ করত। অথচ মধুর স্বভাবের একজন নারী পুত্রশোকে কেমন হয়ে গেলেন। হয়ত গর্ভে দ্বিতীয় সন্তান এলে এই শোক কাটিয়ে উঠতে পারতেন। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বরাহ ত্র্যম্বককে কিছু বললেই

সে বলে উঠত—নিজের একটা পুত্রের জন্ম দাও আগে। দেখছ না তোমার স্ত্রীর কি দশা?

সিংহল দ্বীপের রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন অতি-শিশু মিহিরকে নিয়ে এক শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ প্রাসাদে গিয়ে তাকে মহারাজের হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল—এই শিশু অতি সুলক্ষণযুক্ত। আপনি নিঃসন্তান বলে শুনেছি। আপনি একে আশ্রয় দিতে পারেন। শিশুটিকে আমি সাগর থেকে উদ্ধার করেছি। তার পেটিকায় প্রাপ্ত এই ভূর্জপত্রে তার জন্মপরিচয় লিখিত রয়েছে। আপনি এটিও গ্রহণ করুন।

সিংহলরাজ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন। বলেন—আশ্রয় দেব কি? এতো আমার পুত্রের মত। এতদিন নিঃসন্তান ছিলাম। সন্তান পেলাম। তবে এই শিশু যদি ভবিষ্যতে নিজের জন্মদাতার কাছে ফিরে যেতে চায় আমি বাধা দেব না। কিন্তু আমার সিংহাসনে ও স্বচ্ছন্দে বসতে পারে। পরবর্তীকালে আমার পুত্র হলেও।

সুতরাং মিহিরের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তিনি অনেক বিষয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। তবে রক্তের ধারা অনুযায়ী তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারঙ্গম হলেন।

কিন্তু দু'চার বছর পরে মহারাজের একটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। সিংহলের জ্যোতিষীরা গণনা করে সবাই একবাক্যে বলে—এই কন্যা অত্যন্ত প্রতিভাময়ী। তিনি ক্ষণজন্মা। যুগে যুগে এমন অসাধারণ কন্যা খুব অল্পই জন্মান। ইনি বড় হলে একজন যশস্বিনী নারী হবেন।

মহারাজা তাই কন্যার নাম দিলেন, ক্ষণা। তার থেকে খনা। মিহিরের সংস্পর্শে থেকে বোধহয় তিনিও মিহিরের মত গণিত ও জ্যোতিষে পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। সিংহল-রাজ হৃষ্টচিত্তে ভাবেন, এরা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। এদের চেয়ে সুখী দম্পতি আর হতে পারে না। সুতরাং তিনি সমারোহের সঙ্গে উভয়ের বিবাহ দিলেন। এর একবছর পরেই মহারাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল।

কিছুদিন অতিবাহিত হল। মহারাজা মিহিরকে কোন ভ্রান্তির মধ্যে রাখেননি কখনো। তিনি তাঁকে পরিচয়পত্র দেখিয়েছেন। পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণের পরও তিনি মিহিরকে বলেছেন, মিহির থাকতে তাঁর পুত্রের সিংহাসনের ওপর কোন অধিকার নেই। মিহিরের মাথায় সিংহাসনের কথা কোনদিন ছিল না, এখনো নেই। তিনি তাঁর নিজের পরিচয় পাওয়ার পর থেকে মাতৃভূমির প্রতি একটি আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেন। আর পিতার চেয়েও নিজের গর্ভধারিণীকে একবার দেখার জন্য মন আকুল হয়ে উঠতে থাকে।

যেটুকু পরিচয় লেখা ছিল তাই দেখে তাঁর পিতাকে খুঁজে পাওয়া অসুবিধা ছিল। যে অখ্যাত গ্রামের নাম লেখা ছিল সেই গ্রামের সন্ধান কেউ দিতে পারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু বরাহ উজ্জয়িনী চলে আসার পরে তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই তাঁর নামের সঙ্গে সেই গ্রামের নামও উল্লিখিত হয়। সিংহলের অধীশ্বরও একথা জানেন এবং তারপর থেকে তিনি আসন্ন বিচ্ছেদের দিনের আশঙ্কায় দিন কাটিয়েছেন। মিহির ও খনা উভয়েই তাঁর প্রাণের চেয়ে অধিক। মিহিরও সেকথা জানেন। তবু কর্তব্যকে তিনি প্রথম স্থান দিলেন। তারও ওপর নিজের মাকে দেখা এবং তাঁর স্পর্শ লাভের অদম্য বাসনা তাঁকে মনস্থির করতে সাহায্য করল। তিনি অনেক দ্বিধায় খনাকে একথা বললেন।

খনা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেসে বলেন—এর জন্য এত দ্বিধা কেন তোমার?

—তুমি রাজকন্যা। ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছ। দুঃখ কষ্ট সইতে পারবে না।

—তুমিও একই পরিবেশে আমার চেয়ে অধিকদিন প্রতিপালিত হয়েছ।

—তুমি নিজের পিতামাতা এবং ভ্রাতাকে চিরকালের মত পরিত্যাগ করে জন্মভূমি থেকে চিরবিদায় নিচ্ছ। আর শত হলেও আমি রাজপুত্র নই।

—একটুও চিন্তা করো না। স্ত্রী সবসময় স্বামীর অনুগামিনী। পৃথিবীর আর কেউ স্বামীর চেয়ে আপন আর প্রিয় নন। তেমন নারী যদি থেকে থাকে। সে নারী জাতির কলঙ্ক।

—মহারাজকে বলব?

—অবশ্যই বলবে।

মহারাজকে বলতে তাঁর মন ভেঙে গেল। তাঁর আশঙ্কাই অবশেষে সত্য হল। কিন্তু তিনি বাইরে প্রকাশ করলেন না। তিনি কর্তব্য সচেতন। জানতেন, এমন দিন আসবে। হাহুতাশ না করে শান্তভাবে কন্যা জামাতার বিদায়ের সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন এবং স্বয়ং সমুদ্রতটে গিয়ে তাঁদের অর্ণবপোতে উঠিয়ে দিলেন।

দ্বীপ থেকে সমুদ্র অতিক্রম করে মূল ভূখণ্ডে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনে হল বিদেশে অপরিচিতদের মধ্যে তাঁরা এসে পড়েছেন। তবু অসীম মনোবল সম্বল করে মিহির খনাকে নিয়ে উজ্জয়িনী অভিমুখে চললেন। তাঁদের সঙ্গে রয়েছে একরাশ পুঁথি আর প্রভূত অর্থ। সিংহলাধিপতি বারবার মিহিরকে বলে দিয়েছেন, কখনও যেন তাঁরা অনর্থক কষ্ট সহ্য না করেন।

চলতে চলতে একদিন তাঁরা এক দ্বিপ্রহরে এক প্রান্তরে বটবৃক্ষের নীচে বিশ্রামের জন্য গিয়ে দাঁড়ালেন। পাশেই একটি স্বচ্ছ জলাশয় রয়েছে। তাঁদের বাসনা কিছু খাদ্য গ্রহণ করে ওই জলাশয় থেকে জলপান করে আবার যাত্রা করবেন। সেই সময় সেখানে একটি গাভী এসে উপস্থিত হয়। দেখলেই বোঝা যায় সেটি আসন্নপ্রসবা। সে একটু অস্থির হয়ে উঠেছিল।

খনা হেসে বলেন—গণনা করে বল দেখি, যে বৎস ভূমিষ্ঠ হবে তার গায়ের রঙ কেমন হবে?

মিহির একটু পরেই বলেন—সাদা।

গাভী প্রসব করল তাঁদের চোখের সামনে। শাবকটির রঙ কৃষ্ণবর্ণ।

খনা বিস্মিত হলেন। তাঁর স্বামীর এমন ভ্রম হবে, এ যে অবিশ্বাস্য।

মিহির ভাবলেন, এই সামান্য বিষয়টি তিনি ঠিকভাবে বলতে পারলেন না। তাঁর এতদিনের সাধনা সব নিষ্ফল। মর্মাহত হয়ে তিনি সঙ্গের যাবতীয় পুঁথি সব নিয়ে জলাশয়ের জলে নিক্ষেপ করলেন। ভাবলেন, এতদিনের অধ্যবসায় আর শিক্ষা বিফল হল।

ঘটনাটা এমন আকস্মিকভাবে ঘটে গেল, যে খনা স্বামীকে বাধা দেওয়ার সময় পেলেন না। কারণ পুঁথিগুলো খুব মূল্যবান। একটি গণনা কোন কারণে ঠিক না হলেও পুঁথির জ্ঞান-ভাণ্ডার কখনো মিথ্যা হয়ে যায় না। কিন্তু স্বামীকে একথা বোঝাবার সময় পেলেন কোথায়?

গাভীটা ততক্ষণে তার শাবকের গাত্র লেহন করতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরে শাবকের

প্রকৃত গাত্রবর্ণ পরিস্ফুট হয়ে উঠল। সেটি শ্বেতবর্ণের। খনা স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে বলেন—আমি দায়ী।

—তুমি হবে কেন?

—তোমার গণনায় মুহূর্তের জন্য হলেও অবিশ্বাস করেছি। যদি বিশ্বাস থাকত যে তুমি অভ্রান্ত তাহলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতাম। আমার মধ্যে দ্বিধা ছিল বলে আমি জড়বৎ বসেছিলাম।

মিহির খনাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমাকে তুমি কখনো অবিশ্বাস করনি। যে আমাকে এত ভালবাসে সে অবিশ্বাস করতে পারে না। তুমি হয়ত ভেবেছিলে কোন কারণে আমার গণনা অভ্রান্ত হয়নি। তেমন তো সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে। এসব নিয়ে ভেবো না। আমার শুধু দুঃখ হচ্ছে অত মূল্যবান পুঁথিগুলো স্বহস্তে বিসর্জন দিলাম। তা হোক, তুমি তো আছ। তুমি আমার জীবন্ত পুঁথি।

খনা হেসে বলেন—তুমি বাড়াবাড়ি করছ।

এরপর একদিন উভয়ে বরাহের কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হন। বরাহ এক তরুণ আর এক কিশোরীকে আঙিনায় এসে দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে যান। কে এরা? এরা কি দম্পতি? হতেও পারে।

— কে তোমরা?

—আমি আপনার পুত্র। ইনি আপনার পুত্রবধূ খনা।

—আমি আমার পরিচয়ের সঙ্গে পুত্রেব নামও দিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ, আমি মিহির।

বৃদ্ধের নয়ন বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে। একটু সামলে নিয়ে তিনি বলেন—তবু আমি ভাবিনি তুমি বেঁচে থাকবে। গণনা কোন কোন ক্ষেত্রে অভ্রান্ত হয় না।

—হ্যাঁ। আপনি যথার্থ বলেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে যায়।

বরাহ উভয়কে পেয়ে যতই অভিভূত হন, জ্যোতিষী সম্বন্ধে কোন অযাচিত মন্তব্য শুনলে মাথা গরম হয়ে যায়। সদ্য আগত পুত্রের কথায় তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেন—তুমি জানলে কী করে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে মিহির বলে—মা কোথায়? বিশেষ করে তাঁর জন্য আমার এদেশে আগমন। তাঁর জন্য আমার মন আকুল হয়ে থাকত। তাঁর তুলনায় আমার জন্মভূমি এবং অন্য সব তুচ্ছ। আমার নিশ্চয় একজন জন্মদাত্রী রয়েছেন, এবং আমি যদি আপনার পুত্র হই তাহলে তিনি আপনার স্ত্রী। এতে গণনার কিছু নেই।

বরাহ একজন সদ্য যুবকের এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে হতচকিত হন। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। তিনি কোনরকমে বলেন— তোমার দুর্ভাগ্য তিনি জীবিত নেই।

মিহির জীবনে প্রথম চূড়ান্ত আঘাত পেলেন। তাঁর এতদিনের স্বপ্ন এতদিনের আকুলতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তিনি মাত্রাতিরিক্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। খনা স্বামীর এই অবস্থা দেখে অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না।

মিহির কিছুক্ষণ পর নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলেন—দুর্ভাগ্য আমার অবশ্যই। কিন্তু আপনার নয় বলে মনে হচ্ছে।

—তুমি একথা বলছ কেন?

—আমি যে আশা নিয়ে এতদূরে ছুটে এসেছি সেই আশার কিছুই আর অবশিষ্ট থাকল না। নিজের জননীকে জীবনে না দেখার মত দুর্ভাগ্য আর নেই। আমি বুঝতে পারছি আপনার ভ্রান্ত গণনার ফলে আমার জননী ভগ্ন-হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন।

বরাহ বহুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন—তুমি ঠিক বলেছ। হ্যাঁ, তোমার মায়ের মৃত্যুর জন্য প্রকারান্তরে আমি দায়ী। তার জন্য আমার অনুশোচনা রয়েছে। সেই অনুশোচনা আমার সহিষ্ণুতা কমিয়ে দিয়েছে, আমাকে আগের চেয়েও ক্রুদ্ধ স্বভাবের করে তুলেছে।

—এ কথা বোধহয় সঠিক নয়। অনুশোচনা মানুষকে আরও সংযত, আরও বিনয়ী করে তোলে।

—তোমার আর কোন ভ্রাতা বা ভগিনী জন্মগ্রহণ করেনি। তাহলে হয়ত তোমার মা জীবিত থাকতেন, আমিও কিছুটা স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে পারতাম। তোমরা কি আমার গৃহে থাকবে?

খনা এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলেন—হ্যাঁ পিতা। অন্য কোথায় যাব আমরা? আপনার গৃহ তো আমাদের তীর্থস্থান।

বরাহ এত মিষ্ট বাক্য স্ত্রীবিয়োগের পরে আর শোনেনি। তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়। তিনি প্রাণভরে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

এরপরের ঘটনার কথা সবার জানা হয়েছে। বরাহের সহিষ্ণুতা কতটা হ্রাস পেয়েছিল তার পরিচয় এঁরা দুজনেই পেয়েছেন। এমন কি যাঁকে তিনি প্রথম দিনে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছিলেন, তাঁর জিহ্বাকর্তনের জন্য পুত্রকে প্ররোচিত করেছিলেন।

উর্বশীর স্বামী দ্বিজন্ম ইতিমধ্যে অনেক ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে। তার সমুদ্রগামী পোত জলধিশত্রু কয়েকবার সাগর পাড়ি দিয়েছে। মাঝে মাঝে দ্বিজন্মের এই দীর্ঘ অনুপস্থিত উর্বশীর এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। হয়ত হত না। কিন্তু প্রচুর অর্থ নিজের হাতে নাড়াচাড়া করার সুখ ও শূন্য ক্রোড় পূর্ণ হওয়ার আনন্দে তার মন সব সময় ভরে থাকে। স্বামীর দীর্ঘ অনুপস্থিতি তার কাছে আর অসহ্য বলে মনে হয় না। তবু তার কাঞ্চনমালার কাছে যাতায়াত কমেনি। সে সামান্য একটু স্থূল হয়েছে। তবে তার জন্য উর্বশীর শ্রী হ্রাস পায়নি, বরং একটু বেড়েছে। কাঞ্চনমালা হেসে বলে—ছেলেদের মায়েদের অমন একটু হলে ভালই লাগে। বেশ 'সুখী সুখী 'মা মা' বলে মনে হয়। সখীর কথা শুনে উর্বশী তৃপ্তির হাসি হাসে। বলে—তুই কিন্তু একই রকম আছিস কাঞ্চন। অনন্ত-যৌবনা।

—না থেকে উপায় আছে? সামান্য মেদ বাড়লে আমার মূল্য কমে যাবে। নটীদের একই রকম থাকতে হয়। তাবা উর্বশী মেনকার জাত। তাই বলে তুই না।

—জানি। আমাব এই বিদ্‌কুটে নাম দিয়েছিল আমার মামা। তার নাকি এক পালা শুনতে গিয়ে এই নাম খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। কোন্ পালা কে জানে? আমি তো কখনো শুনিনি।

কাঞ্চন হেসে বলে—নিশ্চয় স্বর্গে ইন্দ্রের সভা বসেছিল সেই পালায়।

—আমি জানি, নিজের অনেক কিছু গোপন রাখতে তুই পরিহাসের আশ্রয় নিস্। আমি জানি আগের চেয়ে এখন তুই অনেক অল্প আসরে যাস। চলে কি করে?

—একজন মানুষের কতটুকু প্রয়োজন?

—তোর নৃত্য রয়েছে, সেজন্য সাজগোজ রয়েছে। শরীর ঠিক রাখতে দুধ-মাছের প্রয়োজন।

—দুধ মাছ কেন?

—ভাল খাদ্য।

—সব খাদ্যই ভাল। তবে বেশবাসে অবশ্য ব্যয় হয়। চলে যায়।

—তারপর?

—তারপর আবার কি?

—তুই সত্যই চির-যৌবনা থাকবি না। যৌবন একদিন বিদায় নেবে। তখন?

—আমি শুনেছি এই গঙ্গারিদিতেই কিছু কিছু নটী সম্পদশালিনী হয়ে উঠেছে। আবার কিছু কিছু নটী এই গড় নির্মাণের আগেও রাজধানীর পথে ঘাটে ভিক্ষাপাত্র নিতে ঘুরত। আমার ভাগ্যে দুটোর একটা হবে। অত ভাবিনা।

উর্বশী উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—তুই কি কিছুই বুঝিস না?

কাঞ্চনমালা এবারে গম্ভীর হয়ে বলে—বুঝে কি করব বল্। নটী হয়েও আমি অনেক কিছু করতে পারি না যা অনেকে করে। আমি আত্মবিক্রয় করতে পারি না। দেহ বিক্রয় করতে পারি না। আমি জানি তুই আমাকে ভরিয়ে দিতে পারিস। দেওয়ার জন্য তুই ব্যগ্র। আমি কি করে নেব? তুই বল। তুই তো জানিস আমার কোন বাহুল্যের প্রয়োজন নেই।

উর্বশী একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে—ঠিক আছে। তোর ভবিষ্যতের কথা আমিই ভাবব।

—তুই?

—হ্যাঁ।

কাঞ্চনমালা আশঙ্কিত দৃষ্টিতে সখীর দিকে চেয়ে থাকে। উর্বশী বলে—ভয় নেই। আত্মমর্যাদা নিয়ে যাতে তুই বাঁচতে পারিস সেই কথাই ভাবব।

—আমি খুব সুখে আছি রে। এখন তো খনা-মিহিরের বিষ্ণু মন্দিরে মাঝে মাঝে যাই। আরতি দেখি। সেখানে কত মানুষজন থাকে। তারা শুধু প্রতিমা দেখে না, ওই মন্দিরও অবাক হয়ে দেখে। এমন তো গঙ্গারিদিতে আর নেই। বল্লভের প্রতিভা এর মূলে। পুণ্যার্থীরা মন্দির সংলগ্ন অমিত্তো কুণ্ড আর জীয়ন্ত কুণ্ডের জলপান করে শান্তি পায়। বল্লভের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। শৈশবেও কত দেখেছি ওকে। তখন তো জানতাম না ও অমন শিল্পী হবে। আদুড় গায়ে দলবেঁধে নদীতে দাপাদাপি করত। তখন কত দুরন্ত ছিল। আর এখন শান্ত। ও বলল, আমাকে ও চেনে। তবে নটী কাঞ্চনমালা যে আমি সেটা জানত না। মহারাজের প্রথম বিবাহের পরে আমাকে দেখে খুব চেনা চেনা মনে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারেনি। মন্দিরে আমাকে দেখে বুঝতে পারে, আমাদের কুটিরের কুলগাছ থেকে কুল পেড়ে খেত স্নানে যাওয়ার আগে আর আমি চেঁচাতাম। আমার মা গালাগালি দিত তাও বলল। শুনে আমার খুব ভাল লাগল। তোর মনে আছে সেই কুলগাছের কথা?

উর্বশী ঘাড় নেড়ে বলে—কুলগাছের কথা মনে নেই। তবে কয়েকটা বড় বড় গাছ ছিল। একটা শিউলি গাছ ছিল। তার গোড়ায় অজস্র শুঁয়োপোকা ছিল।

—হ্যাঁ। সব গাছ কেটে ফেলে এই উদ্যান করা হয়েছে। আমার কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছিল। গাছগুলোকে পরিবারের মানুষ বলে মনে হত। মানুষ বড় নিষ্ঠুর।

উর্বশী বলে—মন্দির যখন গড়ে উঠেছিল, তখন সবাই বিস্মিত হয়েছিল। এভাবে কিছু গড়া যায়, কেউ ভাবতে পারেনি। বাস্তুকার কৃতবিদ্য বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও বল্লভের পদস্পর্শ করে বলেছিল—এ যেন ইন্দ্রজাল। আমি আগে জানলে এইভাবে গড় গড়ে তুলতাম। কত শক্ত হত। বিদ্যাধরী কখনো উন্মত্ত হলেও একে ভাঙতে পারত না। বল্লভ হেসে নাকি বলেছিল, এইভাবে গৃহনির্মাণ করতে।

উর্বশী বলে—ওখানে যাস্, ওঁদের সঙ্গে দেখা হয় না?

—ওঁদের কাছেই তো যাই। আমাকে দ্বিধাভরে বলেছিলেন, আমি মন্দিরে একদিন নাচতে পারব কিনা। আমি সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়েছি। সেই দিন আমি হব দেবদাসী। দর্শক থাকবেন ওরা দুজন এবং স্বয়ং বিষ্ণু। আমার যতটুকু শিল্প রয়েছে সব ঢেলে দেব সেইদিন। কৃতার্থ হব। ওরা জানালেন বর্ষা কাটলে একদিন বলবেন।

—খনাকে কেমন লাগে?

বিস্মিত কাঞ্চনমালা বলে—তুই দেখিসনি?

—দেখব না কেন? কে না দেখেছে? কত দূর থেকে এসে ওঁকে দেখে যাচ্ছে লোকে। ওঁর মুখের বাণী কৃষকদের কাছে বেদবাক্য। বেদ তো আমরা চোখেই দেখিনি। ওসব নাকি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। কিন্তু খনার বাক্য মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

কাঞ্চনমালা বলে—আমার মনে হয় উনি সাক্ষাৎ দেবী। সত্যই দেবী। ওঁর মূর্তি গড়ে পূজা করা যায়। বল্লভ এত মূর্তি নির্মাণ করে অথচ কেন যে ওঁর মূর্তি গড়ে না।

—তুই বল্লভকে বললেই পারিস।

—বলেছিলাম। ও বলে, শিব, শ্রী যক্ষিণী মিথুন, এঁদের চোখে দেখেনি কখনো। তাই কল্পনায় তাঁদের রূপ ফুটিয়ে তুলতে ততটা অসুবিধা হয় না। কিন্তু সাক্ষাৎ দেবীকে স্বচক্ষে দেখে ওই রূপ মাটি দিয়ে গড়তে কিংবা আঁকতে মন থেকে সাড়া পায় না। ওঁকে হয়ত ছোট করে ফেলবে। ওঁর মর্যাদা রাখতে পারবে না। বল্লভ ঠিক কথা বলেছে। আমি ওকে সমর্থন করি।

—ওঁর স্বামী কেমন রে?

—সূর্যের মত। সূর্যের নামই তো মিহির। সূর্যের উদয় কখনো যদি বন্ধ হয়ে যায় পৃথিবী নিশ্চয় ধ্বংস হবে। মিহির না থাকলে খনা নিষ্প্রভ।

—তার অর্থ?

—অর্থ কি অন্যের মুখে শুনে বোঝা যায়? নিজে একদিন স্বচক্ষে দেখে আয়। এখন তো শকটেও যেতে পারিস।

—গিয়েছি। দেখেছি। ওঁকে দেখে মনে হয় উনি যেন অন্য জগতে বাস করেন। মনে হয় নিজেকে ঢেকে রাখেন। তুই যে বললি সূর্য? উনি যেন মেঘে ঢাকা সূর্য।

কাঞ্চনমালা উর্বশীকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে—তুই ঠিক বলেছিস। আমারও তাই মনে হয়। তুই এত অনুভূতিসম্পন্না?

এবারে উর্বশী গম্ভীর হয়ে বলে—হ্যাঁ। তাই তোর এত আবোল তাবোল কথার মধ্যেও প্রকৃত কথা ভুলিনি।

—কোনটা প্রকৃত কথা?

—তোর ভবিষ্যতের কথা। তোর পা তো ধরতে পারি না। হাত ধরে বলছি একটু ভাব।

কাঞ্চনমালা বিষণ্ণ হেসে বলে—ভাবব। যতটুকু সামর্থ্য ভাবব। তোর ছেলেকে একদিন নিয়ে আসিস। ভরত নাম কে রেখেছিল?

—কে আবার। ওর জন্মদাতা।

কাঞ্চনমালা হেসে ফেলে। নাদুসনুদুস ভরতের ওপর তার মায়া জন্মেছে। শুধু শিশু বলে নয়, উর্বশীর সন্তান বলে।

—জলধিশত্রু ঘাটে বাঁধা রয়েছে জানি। তোর কর্তা কোথায়?

—জলধিশত্রুকে বোঝাই করা হচ্ছে। যে সব সামগ্রী বোঝাই করা হচ্ছে, সেগুলো ক্রয় করতে ব্যস্ত এখন। বণিক চিত্রাক্ষও শুনলাম দূরে গঙ্গানদীর তীরে একটা পোত নির্মাণের কারুশালা গড়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে একটি পোতও জলে ভাসিয়েছে। খুব ভাল হয়েছে সেটি। কুণ্ডল নামে একজনকে অন্য দেশ থেকে নিয়ে এসেছে। সে পোত নির্মাণে অতি দক্ষ। এখানে স্থানীয় যারা খুব ভাল নৌকা তৈরী করে তাদের শিক্ষা দিচ্ছে নিজে হাতে। দ্বিজন্মেরও ইচ্ছা জলধিশত্রু বিক্রয় করে দিয়ে চিত্রাক্ষের কারুশালা থেকে কুণ্ডল নির্মিত নতুন একটা ক্রয় করবে পরে। চিত্রাক্ষের সঙ্গে কথাও হয়েছে এই বিষয়ে।

মহারাণী দেবযানী কিছুদিন থেকে অসুস্থ। মাঝে মাঝে তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। বৈদ্য যাতায়াত করছেন, কিন্তু কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। রাজমাতা অম্বিকাও শয্যাশায়ী। তাঁর অসুস্থতা প্রধানত বার্ধক্যের জন্য। বৈদ্য বলেছিল, এখানকার আর্দ্র জলবায়ুতে তাঁর নিরাময় হয়ে ওঠা খুব কঠিন। তাঁকে যদি কোন শুষ্ক স্থানে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে অচিরে সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। শুষ্ক স্থান কোথায় পাওয়া যাবে? মহারাণীর দেশ উজ্জয়িনী খুব শুষ্ক স্থান। একথা বলেছে তাঁর পরিচারিকা জাহ্নবী। কিন্তু সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

রাজমাতা এই সব আলোচনায় বিশ্বাসী নন। তিনি বলেন, এখনি তিনি পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন, যদি মহারাজের একটি পুত্র সন্তান হয়। এমনকি কন্যাসন্তান হলেও ক্ষতি নেই। দুই রানী থাকা সত্ত্বেও মহারাজা নিঃসন্তান একথা অহরহ ভাবতে ভাবতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মহারাজের মনেও যে দুঃখ নেই তা নয়। কিন্তু তাঁকে তার চেয়েও পীড়িত করে দেবযানীর অসুস্থতা। তিনি জানেন বানীর প্রকৃতি নম্র না হলেও তিনি মানুষ তো বটে। দীর্ঘদিন বিদেশে পড়ে রয়েছেন আত্মীয়-স্বজন বিবর্জিতা হয়ে। সঙ্গে দুজন এসেছিল। তার মধ্যে পৃথা কোন অজ্ঞাত কারণে বিদ্যাধরীতে প্রাণবিসর্জন দিয়েছে। সে যে কেন সহসা এভাবে চলে গেল কাউকে বলে যায়নি। তবে প্রাসাদের প্রধান রক্ষী বলেছিল, বোধহয় তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছিল। সুহস্তের কথায় কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ভেবেছে, এটা কথার কথা। কারণ আত্মহত্যার মুহূর্তে কারও মাথাই ঠিক থাকে না। শুধু একজন এসে সুহস্তের সামনে দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল, কেন সে একথা বলেছিল। সে হল জাহ্নবী। তার কথার উত্তরে সুহস্ত বলেছিল, যেদিন সে আত্মহত্যা করেছিল, সেদিন প্রাসাদ থেকে আরও কয়েকজন রমনীর সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল সুহস্তের। ভেবেছিল মহারানী বোধহয় তাকে তিরস্কার করেছেন। জাহ্নবীর কৌতূহল তাতেই নিবৃত্ত হয়। সুহস্ত কিন্তু অনেক কিছু গোপন করেছিল। তবে

পৃথা সত্যই আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে জানলে, সে তাকে কিছুতে যেতে দিত না। কারণ সে তাকে কিছুতে ভুলতে পারে না।

মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস পূর্বে একদিন সন্ধ্যায় রাজপুরীর নির্জন স্থানে সুহস্ত দাঁড়িয়েছিল। সেই সময় হঠাৎ পৃথা এসে অশ্রুসিক্ত নয়নে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছিল। সুহস্ত ভীত স্বরে তাকে বলেছিল—এ কি করছ! আমার মৃত্যু চাও নাকি? আমি যে ধ্বংস হয়ে যাব।

পৃথা আকুল কণ্ঠে বলেছিল—তোমাকে না পেলে যে আমার মৃত্যু হবে এটুকু ভাব। একজন নারীর জীবন রক্ষা কর। তার আশা পূর্ণ কর।

—অসম্ভব।

—আমাকে তুমি ভালবাসতে পারবে না?

—আমি ওসব নিয়ে কখনো ভাবিনি। মাথায় আসেনি। আমি খুব সুনাম নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। এই ভাবেই কাজ করে যেতে চাই।

—একজন রমণীকে জীবনে স্থান দিলে তোমার দুর্নাম হবে?

—হ্যাঁ, তাই হবে। তাড়াতাড়ি চলে যাও। তোমার মাথার ঠিক নেই।

—আমি জানি, আমার মাথার ঠিক নেই। তুমি আমাকে সুস্থ করে তুলতে পার। আমি সেবায়, ভালবাসায় তোমার জীবন ভরিয়ে দেব।

ত্রস্ত সুহস্ত দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করেছিল।

এরপর সুহস্তের সঙ্গে পৃথার শেষ দেখা তার জীবনের শেষ দিনে। অন্য কয়েকজন রমণীর সঙ্গে প্রাসাদের প্রধান দ্বার থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কিছুদূর গিয়ে রমণীদের অপেক্ষা করতে বলে সুহস্তের সামনে এসে মিষ্টি হেসে বলেছিল—আমি চললাম। আর তোমাকে বিরক্ত করব না। পরের জন্মে দেখা হবে।

ভীত সুহস্ত চুপ করে ছিল। আড় চোখে দেখছিল অন্য কেউ শুনে ফেলেছে কিনা। পৃথা রমণীদের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে চলে যায়। সুহস্ত অপরিচিতা রমণীদের সঙ্গে কখনো মেশেনি। তাদের মনোভাব তার ধারণার বাইরে। পৃথার জন্য তার মনে চাপা ব্যথা রয়েই গিয়েছে। কতদিন থাকবে জানা নেই। পরের জন্মে সত্যই দেখা হলে আগ্রহ ভরে তাকে ডেকে নেবে।

মহারাজা চন্দ্রকেতুর মনেও রানী দেবযানীর জন্য সুহস্তের মত একটা চাপা বেদনা। যদিও এর মধ্যে কোন যুক্তি নেই। কারণ স্বামী রূপে তিনি তাঁর সব কর্তব্যই করে চলেছেন। দেবযানীর সম্মান এতটুকুও হ্রাস পেতে দেননি। ঊর্মিলাকে বুঝিয়েছেন, অত দূরদেশ থেকে এখানে এনে সম্মানটুকু হ্রাস করলে অপরাধ হবে। ঊর্মিলা উৎসাহ না দেখালেও আপত্তি করেননি। তিনি স্বামীর কোন কিছুতেই বাধা দিতে চান না। স্বামীর প্রতি তাঁর অনুরাগ অটুট। দেবযানী থাকা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি মহারাজের প্রেম আন্তরিক। কিন্তু স্ত্রী রূপে তিনি তো তাঁর নিজের কর্তব্য করতে পারলেন না। তাঁকে একটি সন্তান উপহার দিতে পারলেন না। তাম্রলিপ্ত থেকে তাঁর মা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে কন্যার গর্ভসন্তারে সহায়ক বটিকা পাঠিয়েছেন। তাতেও ফল হয়নি।

প্রধান অমাত্য শল্য মহারাজের পক্ষ নিয়ে মিহির ও খনার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছেন মহারাজ অবশ্যই পুত্রসন্তানের পিতা হবেন। তবে কবে সেইদিন আসবে সেকথা সঠিকভাবে বলতে পারবেন আগামী চান্দ্র বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ার দিনে গণনা করে। ঊর্মিলা

ভাবেন, সে তো এখনো অনেক বিলম্ব। মহারাজা তাতেই সন্তুষ্ট। রাজমাতা সংবাদ শুনে আশ্বস্ত হলেন।

কয়েকমাস অতিবাহিত হয়। দেবযানীর অসুস্থতার নিবাময়ের কোন লক্ষণ নেই। একদিন তিনি ঘন ঘন অচেতন হয়ে পড়েন। মাঘ মাস। বর্ষণ হয়েছে বলে দিনের শীতলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তার জন্যই বোধহয় তাঁর অবস্থার অবনতি হয়েছে। জাহ্নবী তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। দেবযানীর প্রতি তার হৃদয়ের টান এত বেশি একথা সে নিজেও জানত না। দেবযানী ব্যতীত পৃথিবীতে তার দ্বিতীয় আকর্ষণ বল্লভ। যদিও বল্লভ সেকথা জানে না। তবু নিজের অজ্ঞাতে সে দেবযানীর সান্নিধ্যে নিশ্চিন্ত হয় একথা জাহ্নবী অনুভব করে। তবু ধরা দেয়নি জাহ্নবী। সে দেবযানীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

চেতনা ফিরলে দেবযানী তাকে বলেন—কেন এখানে পড়ে রয়েছিস? নিজেকে ওভাবে বঞ্চিত করতে নেই। নিজের ভবিষ্যৎ দেখ। আমার এখানে পড়ে থেকে লাভ নেই।

—তোমাকে অতশত ভাবতে হবে না। একটু বিশ্রাম নাও।

সেই সময় মহারাজা স্বয়ং রাজবৈদ্যকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করেন।

বৈদ্য দেবযানীকে নানা প্রশ্ন করেন। দেবযানী ধীরে ধীরে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেন। বৈদ্য কিছুক্ষণ চিন্তা করেন। তারপর বলেন—মহারানীর বিষয়ে আপনাকে কয়েকটি কথা বলব মহারাজ। ঔষধ আমি পরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

চন্দ্রকেতু বৈদ্যকে নিয়ে পার্শ্ববর্তী একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। নিজে একটি আসন গ্রহণ করে বৈদ্যকে সম্মুখের একটি আসন দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করেন। বৈদ্য সেখানে বলেন।

—এবার বলুন।

—মহারানীকে আমি প্রথম থেকেই দেখে আসছি মহারাজ। তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন অবনতি আমি দেখতে পাই না। এমনকি তাঁর রূপও হ্রাস পায়নি। শুধু একটু রক্তাল্পতা লক্ষিত হয়। সেটা এমন কিছু গুরুতর নয়।

মহারাজা নিজেও লক্ষ্য করেছেন, দেবযানী আগের মতই রূপসী। ওই রূপ নির্বিকার চিত্তে দেখতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। তিনি বৈদ্যকে প্রশ্ন করেন—তাহলে অমন অচেতন হয়ে পড়েন কেন?

—মানসিক বিপর্যয়ের ফলে এই রোগ।

—তিনি কি উন্মাদ হয়ে যেতে পারেন?

—না। তাঁর মনে অনেক চাপা আক্ষেপ রয়েছে। অনুশোচনাও হয়ত রয়েছে। অভাব রয়েছে।

—অভাব? কিসের অভাব।

—অর্থের কখনই নয়। অন্য কিছুর।

—সেটা কী?

—আপনি দেশের মহারাজা। তবে আমি বৈদ্য? রোগীকে নিরাময় করে তোলা আমার ধর্ম, আমার কর্তব্য। তাই সত্য কথা বলতে হবে।

—তাঁকে নিরাময় করে তোলা আমারও কর্তব্য। আপনি দ্বিধা করবেন না।

—ওঁর দেহমনকে ভরিয়ে তুলুন। উনি বুভুক্ষু।

মহারাজা স্তব্ধ হয়ে যান।

রাজবৈদ্য বলেন—আমি এখনি গিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—হ্যাঁ।

চন্দ্রকেতুগড় থেকে অনেক দূরে আরও উত্তরে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পাশে বিশাল আম্রকানন রয়েছে। সেখানে মহারাজা একটি কাষ্ঠনির্মিত কুটির নির্মাণ করে রেখেছিলেন। সেখানে বিদ্যাধরীর পরিবর্তে পাশ দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে। স্থানটি মহারাজের অতি প্রিয়। নিজে তিনি মৎস্য শিকারে সিদ্ধহস্ত। তাই তিনি গঙ্গার ধীবরদের সঙ্গে সুহৃদ চিত্রককে নিয়ে মৎস্য শিকার করেন মাঝে মাঝে এসে। পার্শ্ববর্তী বনাঞ্চলে গিয়ে মৃগয়াও করেন। একবার তিনি ঊর্মিলাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বেশ কয়েকদিন খুব আনন্দ করেছিলেন। ঊর্মিলা সেকথা প্রায়ই বলেন। দিনগুলোর কথা তিনি ভুলতে পারেন না। চন্দ্রকেতু মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, এবারে দেবযানীর পালা। তবে এবারে শুধু জাহ্নবী আর অচঞ্চল ব্যতীত আর কেউ যাবে না। শুধু শল্য আর ধনুর্ধরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে কয়েকজন অশ্বারোহী দূত থাকবে।

মহারাজ আবার আম্রকাননে যাচ্ছেন একথা রাজপুরীতে রটে যায়। ঊর্মিলা উৎফুল্ল হয়ে মহারাজাকে বলেন—সেখানে আবার যাব আমরা?

মহারাজা ঊর্মিলাকে বলেন—এবারে তুমি নও। এবারে দেবযানী। আনন্দের জন্য নয়, চিকিৎসার জন্য। রাজবৈদ্যের পরামর্শে যাচ্ছি আমরা। বলেছেন স্থান পরিবর্তন করে মনের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পাবলে ভাল হতে পারে। দেখা যাক কী হয়?

ঊর্মিলার মুখ নিমেষে বিবর্ণ হয়ে যায়।

সবাই জানল, এবারে বড়রানী যাচ্ছেন মহারাজের সঙ্গে। কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। এতই অবিশ্বাস্য যে স্বয়ং রাজমাতা অম্বিকা পুত্রকে ডেকে বলেন—এতদিন পরে আবার ওকে কেন?

—অপরাধ করেছি, প্রায়শ্চিত্ত করব না? ও হয়ত অল্প বয়সে অন্যায় করেছিল, তাই বলে এই পাঁচ বছরে আমিই বা কি ন্যায় করলাম ওর প্রতি? নিজেকে একটু সংশোধন করতে চাই। ওর হয়ত ভালই হবে। যে কোন মানুষ নিঃসঙ্গ অবস্থায় এতদিন থাকলে উন্মাদ হয়ে যায়। ও তো শুধু অচেতন হয়ে পড়ছে। দেখি যদি আরোগ্য লাভ করে।

অম্বিকা দেবী পুত্রের মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলেন—ঠিক বলেছ। আমার আশীর্বাদ রইল। ও যেন ধীরে ধীরে ভাল হয়ে ওঠে। এখানে ওর তো আর কেউ নেই। আমরাই ওর আপনজন।

জাহ্নবীর খুব আনন্দ হয়। সে বুঝতে পেরেছিল, দেবযানী এভাবে বেশিদিন থাকলে উন্মাদিনী হয়ে যাবে। সে তাই নিজের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ নিবৃত্ত করে এমনকি নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে একাগ্র চিত্তে সখীর সেবায় নিমগ্ন হয়। কিছু দিন পূর্বেও বল্লভ ছিল তার জীবনের ধ্রুবতারা। সে জানে গুণবানের স্ত্রী দোপাটি নানাভাবে বল্লভকে দারপরিগ্রহের জন্য অনুরোধ করেছে। ফল হয়নি। শেষে সে ব্যর্থ হয়ে একবার জাহ্নবীকে ডেকে বলে—আপনি ওঁকে বুঝিয়ে একটা ব্যবস্থা করুন। ওঁকে দেখলে আমার কষ্ট হয়। ঠিকমত খাওয়া দাওয়া হয় না। এভাবে চললে যে শরীর ভেঙে পড়বে। আমার কোলে ছেলে এসেছে। আমিও পারি না। আপনি চেষ্টা করলে হবে।

জাহ্নবী বলে—আমার বলা শোভা পায় না। আপনি তো বোঝেন। তাছাড়া আমি কীভাবে

চেষ্টা করব?

দোপাটি তখন গম্ভীর হয়ে বলে—আপনি তো কত আসেন। ওঁকে দেখে আপনার মন কাঁদে না?

—কাঁদে। কিন্তু কি করব।

—আপত্তি না থাকলে, আপনি ওঁর স্ত্রী হন।

—আমি!

—হ্যাঁ, আপনি। আমি জানি আপনি ওঁকে অপছন্দ করেন না। অস্বীকার করবেন না। নারীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এক নারীর মনের কথা অন্য নারী অনেক সহজে বুঝতে পারে।

দোপাটির কথায় জাহ্নবী কিছুক্ষণ মূক হয়ে যায়। তারপর বলে—যত সহজে কথাটা বললেন, বাস্তবায়িত করা তত সহজ নয়। প্রথমত একজন শিল্পীর জীবনে বাড়তি চাপ কেন সৃষ্টি করব? উনি নিজের সৃষ্টি নিয়ে শান্তিতে আছেন, আনন্দে আছেন। তার মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করব কেন?

—এর চেয়ে বিশৃঙ্খল জীবন আমি দেখিনি। দেখলে চোখে জল আসে।

—বুঝলাম সবই। কিন্তু ওঁর নিজের ভাললাগা না লাগা নেই? আমাকে কেন ঘরে নেবেন?

—ঠিক নেবেন। এটুকুও বোঝেন না নারী হয়ে? আপনি ওঁর ঘরে এলে উনি নিশ্চিত হবেন।

—আপনি ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ বলছি। আমি ওঁকে খুব কাছ থেকে অহরহ দেখার সুযোগ পাই। আপনার প্রসঙ্গ এলে ওঁর চোখেমুখে একটা প্রশান্তি ফুটে ওঠে। আপনার হাতির দাঁতের কাজের কত উন্নতি হয়েছে সেকথা বলতে খুব উৎসাহ পান।

—একথা বলেন নাকি?

—বলেন। ওঁকে মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণে আপনি সাহায্য করেন তাও বলেন। আমার দৃঢ় ধারণা উনি আপনাকে খুব ভালবাসেন। তবে সেকথা নিজেও হয়ত জানেন না।

জাহ্নবী দোপাটিকে কথা দেয় সে একটু ভেবে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

যেদিন এইসব কথা বলে ফিরল সেই দিনই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সেই দিনই প্রথম তার চোখের সামনে দেবযানী অচেতন হয়ে পড়লেন। সংবাদ শুনে মহারাজা ছুটে এলেন। রাজবৈদ্য ছুটে এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি। কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। মহারাজকে বললেন—হঠাৎ এমন হওয়ার তো কোন কারণ নেই। নাড়ীর গতি অস্বাভাবিক নয়। অন্য কোন অসুস্থতাও নেই। তবে যে কয়েকবার এসেছি ওঁকে মনমরা দেখেছি। আমি ওঁর শরীর সম্বন্ধে যখনই জানতে চেয়েছি হেসে বলেছেন তিনি, যে সুস্থ আছেন।

এরপর তো আরও কয়েকবার হল। শেষে বৈদ্য অনেক ভেবেচিন্তে পুঁথি ঘাঁটাঘাঁটি করে যা বুঝতে পেরেছেন সেকথা মহারাজকে অকপটে বলেছেন। তার জন্য গঙ্গাতীরবর্তী আম্রকানন সংলগ্ন নিবাসে যাত্রার আয়োজন। তাঁর জন্য জাহ্নবীর জীবনের একটা সদ্য গড়ে ওঠা স্বপ্নের বোধহয় অবসান ঘটতে চলল। স্বপ্ন সত্য হল না। বল্লভ সহসা যেন শতযোজন দূরে চলে গেল। জাহ্নবীর দীর্ঘায়ত ছায়াও তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। তার হৃদয়ে সঙ্গীতের যে সুর সবে মাত্র বাজতে শুরু করেছিল সেই সুর-লহরীর পরপারে রয়ে গেল তার সবচেয়ে প্রিয় পুরুষটি। পৃথা জীবিত থাকলে হয়ত অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু সে

আর নেই। তার মনে কি জ্বালা ছিল কে জানে। হয়ত সেই জ্বালাকে ভুলতে লুকিয়ে লুকিয়ে মধু খেত।

কিন্তু দেবযানী নিজে কি জানেন তাঁকে সুস্থ করে তোলার জন্য মহারাজের উদ্যমের কথা? তিনি কি জানেন মহারাজা শুধু তাঁকেই নিয়ে যাবেন সেই আম্রকাননে যেখান থেকে আনন্দ-উদ্ভাসিত মুখ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন ঊর্মিলা? জানেন না নিশ্চয়। জানলে জাহ্নবীকে অন্তত বলতেন। জাহ্নবী ভাবে, মহারাজা নিজেই নিশ্চয় বলবেন। আজ কিংবা কাল। কারণ যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে পরশু। তাকেও যেতে হবে, একথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে বুঝতে পারে না, দেবযানীকে একথা তার বলা উচিত হবে কি না। শেষে স্থির করে না বলা ভাল। একথা জানানো তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

সন্ধ্যার পর মহারাজা দেবযানীর কক্ষে প্রবেশ করেন। জাহ্নবী তাঁকে দেখে বাইরে চলে আসে। তারপর পৃথা যে স্থানে বসত সেখানে এসে বসে। আজই প্রথম বসল। বসেই মনে প্রশ্ন জাগল, পৃথা কি কাউকে ভালবেসেছিল? জাহ্নবীকে ওখানে বসতে দেখে ঊর্মিলার পরিচারিকা বিস্ময়ে বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে। তাই দেখে জাহ্নবী তার দিকে এগিয়ে যায়।

—ভাল আছ বিনীতা?

—হ্যাঁ। তুমি ওখানে বসলে কেন? কখনো বসতে দেখিনি।

—প্রয়োজন হয়নি। আজ হয়েছে। তুমি তো দেখলে মহারাজ গিয়েছেন রানীর কুশল জানতে।

—আমি তোমাকে দেখে প্রথমে চমকে উঠেছিলাম। তুমি কিছু মনে করো না, আমি ভেবেছিলাম বুঝি পৃথা।

—অমন ভুল হয়। এতে মনে করার কী আছে? তোমার রানীর সখী চন্দ্রমুখী কোথায়?

মুখ ভার করে বিনীতা বলে—সে তো মাঝে মাঝে দেশে যায়। রানী তাকে পাঠান।

—ও। আচ্ছা চলি।

জাহ্নবী তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে।

মহারাজা যখন প্রবেশ করেন, তার আগে জাহ্নবী কক্ষের প্রদীপগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিছিল। দেবযানী অন্যমনস্কভাবে সেইগুলো চেয়ে দেখছিলেন। মহারাজকে একাকী দেখে তিনি বুঝতে পারেন না কি বলবেন। তাড়াতাড়ি বেশবাস ঠিক করতে চান।

মহারাজ বলেন—অত ব্যস্ত হয়ো না। আমি তোমার সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলতে এসেছি।

জাহ্নবীকে কক্ষের বাইরে যেতে দেখে, তিনি তার বুদ্ধির প্রশংসা করেন মনে মনে। অবশ্য তার গুণের কথা তাঁর কানে এসেছে আগেই।

—তোমার পরিচারিকা বুদ্ধিমতী।

দেবযানী অত্যন্ত নিম্নস্বরে বলে—এখন বলতে দ্বিধা নেই, ও আমার বাল্যসখী।

—সত্য! এতদিন জানতে পারিনি। জানলে অনেক বেশি সম্মান পেত।

—ও চায়নি সম্মান। আমার জন্য ও নিজের জীবন নষ্ট করল। অশুভ লগ্নে আমার জন্ম, সবার ক্ষতিই করে গেলাম শুধু।

—ও কথা বলো না দেবযানী। কেউ কারও ক্ষতি করতে পারে না। সব কিছু অদৃষ্টে লেখা থাকে।

—আপনার জীবনেও আমি অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছি। তবু রানী ঊর্মিলা আসায়

আপনি রক্ষা পেয়ে গিয়েছেন।

মহারাজা দেবযানীর পাশে পালঙ্কে বসে তাঁর কটিদেশ বাঁ হাত দিয়ে বেষ্টন করে সুমিষ্ট কণ্ঠে বলেন—আমার জীবনে তুমি অভিশাপ নও।

—না হলে ঊর্মিলার আসার প্রয়োজন হত না হয়ত।

—ওসব পুরোনো কথা ভুলে যাও রানী। তুমি প্রথম থেকেই আমার পাটরানী। তোমার সেই মর্যাদা বরাবর অটুট।

—সে আপনার মহত্ত্ব। সবাই জানে আমাদের সম্পর্কের কথা।

চন্দ্রকেতু ভাবতেও পারেননি দেবযানী এত কথা বলবেন। তিনি আতঙ্কিত ছিলেন যে রানী হয়ত চুপ করে থাকবেন। হয়তো বা অচেতন হয়ে পড়বেন। রানীকে এভাবে কথা বলতে দেখে তিনি স্বস্তি পান। এও লক্ষ্য করেন যে তাঁর পূর্বেকার উগ্রতা একেবারে নেই। তাঁর কি অনুশোচনা হয়েছে? সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে এই পরিবর্তন?

এবারে চন্দ্রকেতু তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। বলেন—কিছু দিন ধরে তুমি সুস্থ নও। এর জন্য আমি শান্তি পাচ্ছি না। তোমার কাছে আসার অভ্যাস নেই বলে দ্বিধা রয়েছে মনে। অথচ মনের মধ্যে সব সময় তোমার চিন্তা। আমার মনে হয় অত দূর দেশ থেকে তোমাকে এনে আমি অপরাধ করেছি।

—না। সব কিছুর মূলে আমি। আপনার কোন দোষ নেই। আপনি নিজেকে দায়ী ভেবে কষ্ট পাবেন না।

—আমি তোমাকে নিয়ে পরশু সেই আম্রকাননে যাব। তুমি হয়ত জান না সেটি কোথায়। এখান থেকে উত্তর দিকে গঙ্গার তীরে বিশাল এক আম্রকানন। সেখানে আমার একটি ক্ষুদ্র নিবাস রয়েছে। সম্মুখে সীমাহীন প্রান্তর পশ্চাতে আম্রকানন। তার পাশ দিয়ে প্রবাহিনী গঙ্গা। সেখানে কিছুদিন থাকলে তুমি সজীব হয়ে উঠবে।

—আমার সঙ্গে জাহ্নবীকে পাঠাবেন তো? অত দূরে বলে জানতে চাইছি। একা যেতে আমি ভয় পাই না। কারণ মৃত্যুভয় আমার চলে গিয়েছে। দিন যাপন করা নিয়ে কথা। তাই সঙ্গে জাহ্নবী থাকলে ভাল লাগবে।

—আর আমি? আমি তো ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসব।

—আপনি? ও তাহলে সবাই যাবেন? ঊর্মিলাও যাবে?

—না দেবযানী। ঊর্মিলা এখানে থাকবে। আর কেউ যাবে না। শুধু তুমি আর আমি। জাহ্নবী অবশ্য সঙ্গে থাকবে।

দেবযানী স্বামীর দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার কপোল যেন একটু রক্তিম হয়ে ওঠে।

মহারাজ বলেন—তুমি সম্মত তো?

দেবযানী এই প্রথম মহারাজকে মহারাজ বলে ভাবতে ভুলে যায়। তাঁকে মনে হয় তার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তার অনুরাগের একমাত্র পাত্র। সে বলে—তুমি সঙ্গে যাবে, একথা ভাবিনি। আমাকে তুমি তাহলে ততটা ঘৃণা কর না।

—তোমাকে কোনদিন ঘৃণা করিনি। নিজের স্ত্রীকে ঘৃণা করা পাপ।

—তুমি আঘাত পাওনি আমার কাছ থেকে?

—পেয়েছি। তুমি তো জানই পেয়েছি। তাই বলে তো ঘৃণা করতে পারি না। আমি তাহলে গিয়ে আয়োজন করি?

—রাত্রি হয়ে এল। এখন আয়োজন করবে কী করে। কাল করো।

মহারাজের মনে হয় রাজবৈদ্যের অনুমান যথার্থ। দেবযানী অপরিসীম নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন। সেই নিঃসঙ্গতা তাঁর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। হয়ত তিনি সত্যই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠবেন।

কবে সেই উজ্জয়িনী থেকে চন্দ্রকেতুগড়ে এসেছিলেন দেবযানী। তারপর থেকে এ পর্যন্ত বলতে গেলে রাজপুরীতে স্বেচ্ছায় বন্দিনী হয়ে ছিলেন। গঙ্গাতীরবর্তী এই নতুন স্থানের দৃশ্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন।

—তোমার রাজ্যে এত সুন্দর জায়গা রয়েছে?

—শুধু আমার রাজ্য নয়, তোমারও রাজ্য।

—উর্মিলারও।

—তা তো বটেই। তবে তুমি মহারানী।

—এত নৌকো গঙ্গায়?

—হ্যাঁ, স্রোত থাকলেও এই নদী শান্ত।

—ওতে ওঠা যায়?

—যাবে না কেন? তুমি উঠবে? আমার বজরা রয়েছে এখানে।

—অনেকক্ষণ থাকা যায়?

—হ্যাঁ, দিনের পর দিন। তুমি সেই কাশী থেকে এসেছিলে মনে নেই?

—তখন আমার মন আমার মধ্যে ছিল না। সেই সব দিনের কথা ভুলতে চাই। মনে হলে কষ্ট হয়।

—তাই ভাল। ভুলে যাও। কাল মধ্যাহ্নে বজরায় উঠব। সারাদিন থাকব।

—সারা রাত?

—হ্যাঁ, রাতেও থাকা যায়। থাকবে?

—থাকব। কিন্তু খাওয়া দাওয়া?

—সে সব চিন্তা করো না। সব ব্যবস্থা রয়েছে।

পরদিন বজরায় উঠলেন দুজনা। জাহ্নবী দেবযানী রওনা হওয়ার আগে তাঁকে বলে—আমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তুমি একাই থাকতে পারবে। দেখো ভাল লাগবে।

মহারাজা জাহ্নবীর কথা জিজ্ঞাসা করলে, দেবযানী বলেন—সে বলল, তার যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

—তোমার কোন অসুবিধা হবে না তো?

—ও বলল আমি একাই থাকতে পারব। ও সব জানে।

চন্দ্রকেতুর দ্বিধা ছিল। দেবযানী সুস্থ নন। তাছাড়া নিজের সব কিছু একা করার অভ্যাস নেই। তবু রানীকে কিছু বলতে পারেন না। এ পর্যন্ত তো অচেতন হয়ে পড়েননি একবারও। তাঁর সঙ্গ বোধহয় রানীর ভাল লাগছে। রানীর ভেতরে যে অনেক পরিবর্তন হয়েছে এতো রাজধানীতেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি।

বজরার রজ্জু খুলে জলে ভাসাল দাঁড়ি মাঝিরা। দেবযানী ভুলে গেলেন তিনি এই রাজ্যের রানী, ভুলে গেলেন মহারাজা অনতিদূরে দণ্ডায়মান। ভুলে গেলেন যে তিনি বালিকা বা কিশোরীও নন। তিনি আনন্দে করতালি দিয়ে উঠলেন। মহারাজা সচকিত দৃষ্টিতে রানীর

দিকে চাইলেন। শেষে কি মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিল? মাঝি পেছনে হাল ধরে বসে ছিল। সে দেখতে পায়নি কিছু। দাঁড়িরা দেখল, কিন্তু রাণীর উচ্ছ্বাসের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু লক্ষ্য করেনি। তারা শুধু ভাবল মহারানী তাহলে তাদের বাড়ির মেয়েদের মত হাততালি দেন আনন্দে। তাদের খুব ভাল লাগল। ঘরে ফিরে বলবে, মহারানী তাদের মতই সরল সহজ। রানীদের সম্বন্ধে সবার যা ধারণা তিনি তেমন নন।

দাঁড়িদের কথা মহারাজের মনে হয়নি। কারণ তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে খুব মেশেন। নিজেকে গজদন্তের চূড়ায় রাখতে চান না। ধীবরদের সঙ্গে, মাঝিদের সঙ্গে কত রাত কাটিয়েছেন নদীবক্ষে। রানীর অস্বাভাবিক আচরণ দেখে প্রথমে তাঁর যে আশঙ্কা হয়েছিল ধীরে ধীরে তা কেটে যায়।

রানী তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বলেন—আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু ওদের সামনে আমি বোধহয় তোমার সম্মান রাখতে পারলাম না।

—কেন?

—করতালি দেওয়া আমার বোধহয় ঠিক হয়নি। আমি যে রানী।

—একটুও ভুল হয়নি। আমি তো প্রজাদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখি না। আমার রানী হয়ে তুমিও রাখনি। তুমি যোগ্য রানী। অনেক মহারাজা তাঁর স্বাভাবিক অভিব্যক্তি দমন করে কৃত্রিম ব্যক্তিত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেন। রানীদেরও সেইভাবে চলতে তিনি নির্দেশ দেন। এই কৃত্রিমতা ভাল নয়। শৈশবের শিক্ষার মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হতে থাকে। সেই ব্যক্তিত্বের উপাদান কিন্তু জন্মগত। উপাদান না থাকলে বাইরে থেকে আরোপিত ব্যক্তিত্ব মানুষের মনকে পঙ্গু করে দেয়। সেই কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব যদি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি আয়ত্ত করে তাহলে তার কুপ্রভাব আশেপাশের অনেকের অনেক কিছু নষ্ট করে দেয়। তুমি নিজের মত চল দেবযানী। আমার খুব ভাল লাগছে।

—তুমি এত জান?

মহারাজা হেসে নিম্নকণ্ঠে বলেন—কিছুই জানি না। জানলে তোমার মন জয় করতে ব্যর্থ হতাম?

দেবযানী কি বলবেন, ভেবে উঠতে পারেন না। তিনি করুণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে থাকেন।

মহারাজা তাঁকে বলেন—অনেকক্ষণ বাইরে রয়েছ। চল ভেতরে যাই।

ভেতরে গিয়ে রানীর পাশে বসে চন্দ্রকেতু বলেন—আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেললাম?

—কেন?

—আগের কথা মনে করিয়ে দিলাম। তোমার কোন দোষ নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব একটা কল্পনা থাকে। তোমার কল্পনার পুরুষের সঙ্গে আমার মিল ছিল না। তাই আমাকে ভাল লাগে না। সবাই তো সবার জন্য নয়।

দেবযানী জীবনে এই প্রথম অশ্রুসিক্ত নয়নে চন্দ্রকেতুকে জড়িয়ে ধরে বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলেন। কি বলছেন, নিজেই জানেন না। শুধু তাঁর চোখের জলে চন্দ্রকেতুর বুক ভাসে।

—অমন করো না দেবযানী। শান্ত হও। তোমার সব কথা আমি বুঝেছি। কিছু বলতে হবে না। নিজেকে অত যন্ত্রণাও দিতে হবে না।

বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শান্ত হন রানী। বজরার ভেতরে একটা প্রদীপ জ্বলছিল। এই প্রদীপ অপরাহ্নের আগেই জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দুটি এখনো জ্বালানো হয়নি। অন্ধকার হয়ে আসছে। নদীর তরঙ্গে বজরা দুলছিল। সেই দোলায় প্রদীপের আলোও দোদুল্যমান। চন্দ্রকেতু ভাবেন এবারে বোধহয় দেবযানী সত্যই সুস্থ হয়ে উঠবেন। অশ্রুতে মনের অনেক ক্লেদ ধুয়ে যায় বলে কথা আছে। এমন অনেক কথাই লোকে জানে যা অতি সত্য বলেই লোকের মুখে মুখে ঘোরে। দেবযানী রূপসী চিরকাল। কিন্তু আজকের সৌন্দর্যের যেন তুলনা নেই। রাণী সত্যই সুস্থ হয়ে ফিরলে তিনি বিবেক দংশন থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। রানীকে আনন্দ আর উৎসাহের মধ্যে রাখতে তিনি সবরকম চেষ্টা করে যাবেন এই কদিন।

পরদিন তাঁরা আম্রকাননে ফিরলেন মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে। জাহ্নবী দেবযানীর দিকে চেয়ে থাকে। সখীর কথাবার্তা, চলাফেরার মধ্যে কৈশোরের চাপল্য। যেন অন্য কোন দেবযানী। এক রাতের নৌকা বিহারে এত পরিবর্তন! তবে কি সে মহারাজের মন পেয়েছে? কিংবা মহারাজ তার?

মহারাজা এই কয় বছর জাহ্নবীর সঙ্গে একদিনও কথা বলেননি। রানীর পরিচারিকার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখন তিনি জেনেছেন জাহ্নবী রাণীর সখী। পরিচারিকা হয়ে রয়েছে। এই আম্রকাননের আবাসে কয়েকদিন থাকা হয়ে গেল। জাহ্নবীর প্রশংসাও দেবযানীর কাছে কয়েকবার শুনেছেন। নিজেও তার বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ পেয়েছেন।

তিনি একদিন জাহ্নবীকে দেখে ডাকলেন। সে তখন দেবযানীর কাছে যাচ্ছিল। জাহ্নবী থতমত খায়। মহারাজের এই আহ্বান অপ্রত্যাশিত। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রকেতুর সামনে দাঁড়ায়।

—আমি জেনেছি, তুমি মহারানীর শৈশবের সখী।

—হ্যাঁ, মহারাজা।

—তাঁকে তোমার চেয়ে কেউ বেশি চিনবে না এখানে। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এইখানে ভ্রমণে এসে তাঁর শরীরের এবং মনের কোন উন্নতি হয়েছে? কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি?

জাহ্নবী বলে—ওঁকে এত সুস্থ উজ্জয়িনীতেও দেখিনি। এই নতুন জায়গায় এসে একদিনও চেতনা লোপ পায়নি। আর কখনো উনি অচেতন হবেন বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস বৈদ্য নিশ্চয় বলবেন যে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

—তাহলে ওকে এখানে নিয়ে আসা যথার্থ হয়েছে বলতে চাও?

—হ্যাঁ মহারাজা, এর চেয়ে সঠিক আর কিছু হতে পারত না। আপনি ওকে এখানে নিয়ে এসে নতুন জীবন দিয়েছেন, নতুন মন দিয়েছেন।

—তুমি নিজের পরিচয় গোপন রাখার জন্য দ্বিতীয় রানীর সখী চন্দ্রমুখীর মত মর্যাদা পাওনি। সেজন্য আমি দুঃখিত। আমি জানতাম না।

—আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই মহারাজ। আপনার মত মানুষ অন্যকে হীন চোখে দেখতে পারেন না।

—তোমার সঙ্গে রাজধানীতে ফিরে গিয়ে কথা বলব একদিন।

জাহ্নবী নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে দেবযানীর কক্ষের দিকে চলে যায়।

দেবযানী ফিরলেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। রাজবৈদ্য অবধি দেখে বিস্মিত হন। স্থান পরিবর্তনে

স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় একথা সবাই জানে। তাই বলে এত উন্নতি?

সেই রাতে ঊর্মিলা স্বামীকে পেয়ে আনন্দ বিহ্বল। যেন কতদিন পরে দয়িতকে ফিরে পেয়েছেন। তিনি নানাভাবে স্বামীর কাছ থেকে দেবযানীর সঙ্গে তাঁর এই কদিনের সম্পর্কের কথা জানার চেষ্টা করেন। দেবযানী কি পূর্বের মতই পাষাণ? তাঁর শরীরের রক্ত উচ্ছলিত হয়ে ওঠে না? এতদিন যখন তেমন থাকতে পেরেছেন অবশিষ্ট জীবন সেভাবে থাকলেই বা ক্ষতি কি? ঊর্মিলার মনোভাব যেমনই হোক মুখে তো বলতে পারেন না। তাই তাঁর সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে সারারাত স্বামীর আচরণ অনুধাবন করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মহারাজ মধ্যরাত্রের অনেক পূর্বেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁর নিদ্রিত মুখমণ্ডলেও প্রগাঢ় তৃপ্তির প্রকাশ। ঊর্মিলা বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেন নিদ্রামগ্ন স্বামীর পাশে বসে থেকে। একবারও নিদ্রাভঙ্গ হয় না তাঁর। রহস্য রহস্যই থেকে গেল। বধূরূপে তিনি যথেষ্ট তৃপ্ত। কিন্তু যে তৃপ্তি সন্তান দিতে অক্ষম সেই তৃপ্তিতে তো ষোলকলা পূর্ণ হয় না। সেই তৃপ্তি ছলনাময়ী।

ওদিকে একই রাতে দেবযানী পালঙ্কে একাকী ছট্‌ফট্ করেন। এই কদিনে তিনি স্বামীর মূল্য বুঝেছেন। নারীত্বের আস্বাদন পেয়েছেন। এক একবার মনে হয়েছে ছুটে যান স্বামীর কক্ষে। কিন্তু সেখানে কি তিনি আছেন? নিশ্চয় ঊর্মিলার শয্যায় রাত অতিবাহিত করছেন। তাই তো স্বাভাবিক। তাঁর চোখে জল আসে। ভাবেন তিনি কত বুদ্ধিহীনা। ঊর্মিলা আসার পূর্বে দেড় বছরের অধিক সময় মহারাজ একান্তভাবে তাঁরই ছিলেন। যদি তিনি প্রকৃত নারী হতেন, তাহলে মহারাজের ওপর তাঁর অধিকার অবিভক্ত থাকত। নিজের বুদ্ধিহীনতার জন্য সেই অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত। জীবনে কোনদিনই আর স্বামীকে সেভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে পাবেন না। জাহ্নবী কতবার বলেছে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে। তিনি চাননি। নিজেকে ছোট করতে তাঁর আত্মমর্যাদায় ঘা লাগবে ভেবেছিলেন। এখন সেই অন্তঃসারশূন্য আত্মমার্যদা তাঁকে সারাজীবন এই ভাবে পীড়া দেবে। তিনি স্থির করেন মহারাজের যাতে তাঁর প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় সেজন্য মিহির খনার বিষ্ণুমন্দিরে পূজা দেবেন। সবাই বলে খনা-মিহির হলেন আদর্শ দাম্পত্য জীবনের নিদর্শন। তিনি রানী হয়ে আসার কত পরে তাঁরা দুজনা তাঁরই দেশ থেকে এসে এদেশের কত আপন হয়ে উঠেছেন। হ্যাঁ ওখানেই পূজা দেবেন তিনি। ওখানে বিষ্ণু রয়েছেন, সূর্যও রয়েছেন বরাহ হয়ত সূর্যের উপাসক ছিলেন। তাই পুত্রের নাম রেখেছিলেন, মিহির। তবে মনের কোন্ কামনা পূর্ণ হওয়াব আশায় এই পূজা তিনি পৃথিবীর কাউকে বলবেন না। এমনকি জাহ্নবীকেও না। বলবেন শুধু বিষ্ণুকে। তাঁর কাছে কামনা করবেন, তিনি যেন সন্তানবতী হন।

বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হয়। দেবযানীর কল্পনার খেই থাকে না। সেই সময় জাহ্নবী দেবযানীকে পালঙ্কে দেখে একটু অবাক হয়। কারণ এতক্ষণ তিনি শুয়ে থাকেন না। একটু ম্রিয়মাণও দেখতে লাগে তাঁকে।

জাহ্নবীর হাতে একটি থলি ছিল। তাই দেখে দেবযানী বলেন—ওতে কি এনেছ জাহ্নবী?

—বলছি। তার আগে বল, এতক্ষণ শুয়ে আছ কেন? শরীর ভাল তো?

—খুব ভাল। নানা কথা ভাবছিলাম। উঠতে ইচ্ছে করছিল না।

—এখানে ফিরে এসে তোমার ভাল লাগছে?

—তাই কি লাগে? ওখানে চিরকাল থাকতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত।

—জানি। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। রাজাকে রাজধানীতেই থাকতে হয়। এই নাও।

দেবযানী দেখে, একটি রক্তবর্ণের মৃত্তিকা ফলক।

—এটা কি?

—মিথুন। তুমি তো টাঙিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার পেটিকার মধ্যে লুকিয়ে রাখ।

—ব্যবসায়ীরা সমুদ্র যাত্রার সময়ে নিয়ে যায় বলে শুনেছি। বাণিজ্য ভাল হয়।

—শুধু বাণিজ্য নয়, দাম্পত্য জীবনের জন্যও খুব শুভ। দেখে বুঝতে পার না?

—কোথায় পেলে?

—অনেক আগে বল্লভ দিয়েছিল। আমার কাছে ছিল। এতদিনে মনে হল তোমাকে দিলে তুমি নেবে। আগে দিলে হয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আরও দুটো রয়েছে। সেই দুটো একান্ত আমার।

দেবযানী আগ্রহভরে সেটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সযত্নে নিজের সুদৃশ্য পেটিকায় রেখে দেয়।

জাহ্নবী ভাবে, এই কদিনে আমূল পরিবর্তন হয়েছে দেবযানীর মনের। সে বলে—তোমার রূপ হঠাৎ বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে যেন। আমারই লোভ হয়।

—তোমার লোভ হয়ে লাভ কী? মহারাজ তো এলেন না রাতে।

—এখানে তুমি একা নও।

—আমি ঠিক করেছি বিষ্ণুমন্দিরে পূজো দেব।

জাহ্নবী উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠে—সত্যি? খুব ভাল হবে। কবে দেবে?

—এসব কাজে সময় নষ্ট করতে নেই। যত শীঘ্র সম্ভব পূজা দিতে হবে। সম্ভব হলে আগামী কাল।

—খুব ভাল। মহারাজকে যে বলতে হবে।

—তাই তো ভাবছি।

—আমি মহারাজকে বলতে পারি না। তবে রাজমাতাকে গিয়ে বলতে পারি। তিনি তাঁর পুত্রকে বলে নিশ্চয় ব্যবস্থা করে দেবেন।

—বেশ। তাই বল।

জাহ্নবী সঙ্গে সঙ্গে রাজমাতার কক্ষের দিকে যায়। তাঁর দাসী বিমলার সঙ্গে তার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। যে কোন কারণেই হোক জাহ্নবীকে বিমলার ভাল লাগে। প্রকৃত কারণ হল, বিমলা সব কথা নিজের মনে বানিয়ে বলতে ভালবাসে। কেউ শুনতে চায় না। কিন্তু জাহ্নবী মন দিয়ে শোনে এবং ভান করে যে সব কিছু বিশ্বাস করছে।

জাহ্নবী তাকে গিয়ে রাজমাতার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, সে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি নিয়ে আসে। জাহ্নবী মাতা অম্বিকার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে নত হয়ে প্রণাম জানায়।

অম্বিকা দেবী বলে ওঠেন—ও তুমি। বড়রানী কেমন আছেন?

—সম্পূর্ণ সুস্থ।

—রাজবৈদ্যও বললেন সেকথা। আশ্চর্য ঘটনা। কি করে এমন হল বলতে পার? তুমি তো সঙ্গে গিয়েছিলে।

—স্থান পরিবর্তন। প্রকৃত কারণ মহারাজের সান্নিধ্য।

—ও তো মহারাজের সান্নিধ্য প্রত্যাখ্যান করত।

—নারীর মন। আপনাকে আর কি বলব। কতভাবে পরিবর্তন হয় কারণে অকারণে। বেশিরভাগ নারী নিজেকে নিজে চেনে না।

—তুমি খুব ভাল কথা বল দেখছি। আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ কেন?

—রাণী বিষ্ণুমন্দিরে নিজে গিয়ে পূজা দিতে আগ্রহী হয়েছেন। আপনার আর মহারাজের অনুমতির প্রয়োজন। আপনারা সম্মত হলে আগামীকালই পূজা দেবেন।

—খনা-মিহিরের বিষ্ণু মন্দিরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কী হতে পারে? সে নিজে যাবে বলেছে?

—হ্যাঁ।

—খুব ভাল। আমি চন্দ্রকে বলে ব্যবস্থা করে দেব। কালই যেতে চাইছে?

—বলেছেন, কাল হলে সব চেয়ে ভাল হয়। তিনি অপেক্ষা করতে চান না।

—ঠিক আছে। তুমি তাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বল। দেশের রানী মন্দিরে পূজা দিতে চেয়েছেন শুনে সবাই খুব আনন্দ পাবে। তারাও হয়ত সেই সময়ে গিয়ে উপস্থিত হবে।

জাহ্নবী রানীর কক্ষে ফিরে যায়। দেবযানী উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বলে ওঠেন—কী হল?

—রাজমাতা তোমার কথা শুনে খুব আনন্দিত। বলেছেন, আগামী কালই তুমি যেতে পারবে। সব ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি।

—আমি সকাল থেকে উপবাসে থাকব।

—সেকি! যদি বিলম্ব হয়?

—তুমি তো জান, আমার মা কোন ব্রত পালন করলে সারাদিন অনাহারে থাকতেন। জলগ্রহণও করতেন না।

—তোমার অভ্যাস নেই। তাছাড়া কিছুদিন থেকে শরীর ভাল নেই।

—খুব ভাল আছে। এর চেয়ে বেশি ভাল কি থাকবে? তুমি তো নিজের চোখেই দেখলে আম্রকাননে গিয়ে।

পরদিন মধ্যাহ্নের পূর্বে পূজার ব্যবস্থা হয়। পুরোহিত থাকবেন। মিহির ও খনাকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁরা দুজনই খুব আনন্দিত। মিহির জানতেন দেবযানী এদেশের রাজা থেকে শুরু করে কাউকে সহ্য করতে পারেন না। এ দেশের সব কিছু তাঁর নিকট অসহ্য। সহসা এত পরিবর্তন হল কি করে? এই মন্দিরে তিনি পূজা দেবেন, একথা তো ভাবা যায় না। তবে কি তিনি রানীর দেশের মানুষ বলে দ্বিধা নেই অতটা? অথবা সত্যই কোন পরিবর্তন হয়েছে? তাঁর গণনা নিষ্ফল হয়েছে কি? হলে, তাঁর চেয়ে বেশি আনন্দিত কেউ হবে না। যক্ষ অনেকবার এসে বলেছে, মহারাজা মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত। সুতরাং গণনা মিথ্যা হয়নি। তিনি পুত্রবতী হলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু তিনি তো নিঃসন্তান। যা হোক মহারাজের সুকৃতি তাঁর ভাগ্যের পরিবর্তন এনেছে। তিনি খুবই উন্নত মনের ব্যক্তি এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর স্পর্শে পাষাণও স্বর্ণে রূপান্তরিত হতে পারে। রানী তো মানবী মাত্র।

যথা সময়ে রানী দেবযানী মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন বেশ সমারোহের সঙ্গে। তিনি এমন চাননি। কিন্তু রাজমাতা অম্বিকার নির্দেশ এখানে চূড়ান্ত। মহারাজারও কিছু বলার নেই। রাজমাতার অভিমত, এই প্রথম গঙ্গারিদির কোন মহারানী মন্দিরে যাচ্ছেন স্বয়ং দেবতাকে পূজা দিতে। স্মরণকালে এমন হয়নি কখনো। তিনি নিজেও কখনো যাননি। কারণ এমন পাকাপোক্ত মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল না তাঁর সময়ে। তাঁর সময়ে এবং তারও পূর্বে রাজপুরীর একটি নির্দিষ্ট কক্ষকে দেবালয় বলা হত। সেখানে বিশেষ কোন দেবতার প্রতিমা

থাকত না। রানীরা নিজেদের বিশ্বাস অনুযায়ী পট এনে কিংবা মূর্তি গড়ে পূজা করতেন। কিন্তু খনা-মিহিরের মন্দির তো তেমন নয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত দেবতা রয়েছেন। তাই দেখতে কত পুণ্যার্থীর আগমন ঘটে। আজকের পুণ্যার্থী হলেন স্বয়ং মহারানী দেবযানী।

মন্দিরের বাইরে বহু মানুষ জড়ো হয়েছে। মন্দির দ্বারে খনা ও মিহির অপেক্ষমান। রানীর শকট থামতে তাঁরা দুজনই সহাস্যে এগিয়ে যান। রানী সহসা তাঁদের উভয়ের সামনে নত হয়ে চরণ স্পর্শ করেন।

উভয়ে সচকিত। মিহির বলেন—একি করলেন?

দেবযানী উঠে দাঁড়িয়ে স্মিত হেসে বলেন—ভুল করিনি। আপনারা জীবন্ত দেবদেবী। আপনারা প্রগাঢ় পণ্ডিত বরাহের পুত্র ও পুত্রবধূ। আপনাদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও সবার জানা। আমি এখানকার রানী মাত্র। আমার নিজের কী গুণ রয়েছে?

খনা বলেন—আমরা আপনার আশ্রিত।

—আমি সব শুনেছি। আপনি সিংহল রাজের কন্যা। আপনি ছিলেন প্রকৃত রাজকন্যা। আমি তো তা নই। আপনি প্রাজ্ঞবান স্বামীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে সম্ভাব্য দুঃখবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রাজপুরী ছেড়ে এসেছিলেন। আমি রাজকুমারী হলে কখনো পারতাম না। রাজরানী হয়েও নিজের অহংকার পরিত্যাগ করতে পারিনি।

মিহির নিজে অবন্ত্যক। রানীও অবন্তীদেশের কন্যা। তাঁর রূপের কথা তাঁরা দুজনা দেশে থাকতেই শুনেছিলেন। কিন্তু সেই রূপের ছটা যে এতবেশী তাঁদের ধারণা ছিল না। মিহিরের মনে সংশয় জাগল তিনি কি ভুল কোন কোষ্ঠীর বিচার করেছিলেন? এত বিনয় যাঁর মধ্যে, যাঁর এত বৈদগ্ধ তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই বিচার কেন তিনি করলেন?

ওঁরা সবাই মন্দিরে প্রবেশ করেন বিমুগ্ধ প্রজাকুলের চোখের সামনে। তারা রাণীকে এই প্রথম দেখল। পুরোহিত রানীকে দেবতার সম্মুখে একটি কুশাসনে বসতে বলেন। তারপর শুরু হয় পূজা। পুরোহিত উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। দেবযানীর নিকট মন্ত্রের সুর অত্যন্ত শ্রুতিমধুর বলে অনুভূত হয়। কিন্তু দেবভাষায় তিনি ধীরে ধীরে সাধারণ কথা বলতে পারলেও মন্ত্রের ভাষা তাঁর আয়ত্তে নেই। তিনি একদৃষ্টে মূর্তির দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর নিজের একান্ত কামনার কথা বলতে থাকেন অনুচ্চারিত স্বরে। তাঁর কামনার কথা পৃথিবীর কেউ শুনবে না, শুনবেন শুধু দেবতা।

বাইরের মানুষের মধ্যে যক্ষও ছিল। রাণীর কথা ও ব্যবহার লক্ষ্য করে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে একসময় মিহিরের কাছে গিয়ে একান্তে বলে—মহারাণীর স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। কোন মন্ত্রশক্তির জোরে কিনা জানি না। তাছাড়া আর কি হতে পারে আচার্য?

মিহির বলেন—জানি না। পরে দেখব। তবে আমি খুবই আনন্দিত।

—আমিও!

পূজা একসময় শেষ হয়। রানী হৃষ্টচিত্তে শকটের দিকে এগিয়ে যান। সেখানে একটি শিবিকাও ছিল। তিনি শিবিকায় গিয়ে বসেন। সঙ্গে জাহ্নবীকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু জাহ্নবী চোখের ইঙ্গিতে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মানা করল। মহারানীর শিবিকা মন্দির প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলে গেল। প্রজারা এতদিনে স্বচক্ষে দেখেছে রাণীর রূপ। এত রূপ যে মানুষের দেহে থাকতে পারে ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি কখনো। এতদিন শুধু কানে শুনেছে বটে যে মহারানী অসাধারণ সুন্দরী। কানাঘুষো শুনেছে রানীর সঙ্গে রাজার ভাব নেই। কিন্তু এত রূপ যাঁর

তাঁকে মহারাজা ভালবাসেন না একথা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে না তারা। সবই মন্দ লোকের রটনা।

ওরা ভাবে, এমন রানী সাগ্রহে যাঁদের চরণ স্পর্শ করেন তাঁরা কত বড়। ইতিমধ্যে ওরা শুনে ফেলেছে যে খনা এখানে সাধারণভাবে থাকলেও তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তিনি এক বিশাল রাজ্যের রাজকন্যা। সবাই থ হয়ে গিয়েছে। রানীর শিবিকা চলে গেলে সবাই খনা ও মিহিরের সামনে এসে লুটিয়ে পড়ে।

মিহির ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন—একি করছ তোমরা? রানী তো চলে গেলেন।

একজন বলে—আমরা আপনাদের দুজনকে প্রণাম করছি।

—হঠাৎ প্রণাম কেন?

—আমাদের চোখ আগে কিছুটা খুলেছিল, আজ একেবারে খুলে গেল।

খনার দিকে চেয়ে একজন বলে—আমাদের দেশে আগে নিয়মিত ভাবে তেমন ধান হত না। কলা হলেও মাঝে মাঝে মড়ক লাগত কলা গাছে। এখন ওসব আর কিছু হয় না। শালি ধান এত বেশি হচ্ছে যে গোলা উপচে পড়ছে।

খনা বলেন—এসব তো তোমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল।

—পরিশ্রম আমরা চিরকালই করি। কিন্তু আগে করতাম অন্ধের মত। আজকাল করি আপনার বচনের নির্দেশে।

—সেগুলো তো সবাই জানে না।

—কে না জানে। পরখ করুন।

মিহির হেসে বলেন—ঠিক আছে। আমি পরীক্ষা নিচ্ছি। বলতো চাষের আগে কখন তোমরা প্রস্তুতি নেবে?

একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে ঃ

কোদালে কুড়লে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।।
বলগে চাষায় বাঁধতে আল।
আজ না হয় হবে কাল।।

এবারে খনা বলেন—এই সম্বন্ধে আমার স্বামীর পিতাকে সম্বোধন করেও একটা ছড়া করেছি। তোমাদের মধ্যে কেউ বলতে পারবে?

একজন কিশোর ছুটে সামনে এসে বলে—আমি জানি। আমি বলব?

বিস্মিত খনা বলেন—তুমি জান?

—হ্যাঁ। যখন বছর বছর মহারাজের লোকের গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ওই সব বচন সুর করে বলে তখন আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনি। ওরা অনেকবার বলে। তাই তো মনে থেকে যায়।

—বেশ, বলতো?

কিশোরটি হাসতে হাসতে বলে ঃ

কি কর শ্বশুর লেখা জোকা।
আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা।।
যদি বর্ষে মুষল ধারে।
মাঝ সমুদ্রে বগা চরে।।

যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা।
পর্বতে হয় মীনের ঘটা।।
যদি বর্ষে ঝিমিঝিমি।
শস্যের ভার না সহে মেদিনী।।
হেসে চাকি বসেন পাটে।
চামার গরু বিকায় হাটে।।

খনা আর মিহিরের আনন্দের সীমা থাকে না। তাঁরা বুঝতে পারেন যেকোন গুণের জন্যই হোক এ রাজ্যের অধিকাংশ মানুষের মেধার অভাব নেই। খনার মনে পড়ে তাঁর পিতৃরাজ্যের কথা। সেখানে শৈশবে শুনেছিল, ও দেশের মানুষের অধিকাংশইও মস্তিষ্ক-সম্পন্ন। অনেকে হেসে বলত, সামুদ্রিক মৎস্য ভক্ষণের জন্য তারা বুদ্ধিমান। গঙ্গারিদি রাজ্যের মানুষের কাছেও মৎস্য প্রিয় খাদ্য। হয়ত এরমধ্যে কোন সত্যতা নেই। কিন্তু অদ্ভুত কাকতালীয় ব্যাপার। তাঁরা উভয়েই মৎস্য ভক্ষণ করেন। সিংহলে এ বিষয়ে কোন বাধা ছিল না। তবে উজ্জয়িনীতে গিয়ে এই অভ্যাস তাঁদের বর্জন করতে হয়েছিল। কারণ ওদেশের অধিবাসীরা মৎস্যভোজীদের ঘৃণার চোখে দেখে। তারা কল্পনা করতে পারে না একজন অভিজাত পরিবারের মানুষ মৎস্য খায়। কিন্তু এখানে এসে তাঁরা আবার পুরাতন অভ্যাসে ফিরে এসেছেন।

সারা দিনের এত কিছুর পরেও যখন তারা সবাই চলে গেল, খনা লক্ষ্য করেন, তাঁর স্বামী কিছুটা অন্যমনস্ক।

—কি ভাবছ?

—ভাবছি রানীর কথা। এত সুন্দর স্বভাব। অথচ কোষ্ঠী অনুসারে তেমন হওয়ার কথা নয়।

—কোষ্ঠী তৈরীতে ভ্রম থাকতে পারে।

—তাঁর পিতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনুমতি নিয়ে রাজজ্যোতিষীকে দিয়ে ওটি করেছিলেন।

খনা হেসে বলেন—রাজজ্যোতিষী আর যাই হোন বরাহ কিংবা মিহির নন। এছাড়া ভুল সবার হতে পারে।

—জন্ম লগ্নে ভুল হয় কী করে?

—এক পল বা দণ্ডের ভুলেও সবকিছু বিপরীত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য সহস্রে একটি ক্ষেত্রে তেমন হতে পারে।

—সহস্র কেন, তেমন মুহূর্ত কোটিতে একজনের ভাগ্যে হয়ত ঘটে। প্রকৃত ঘটনা হল, আমার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি পেল। আমি খুবই আনন্দিত। তাই দেখতে চাই শেষ পর্যন্ত কী হয়।

চিত্রাক্ষ আর দ্বিজন্মের কর্মতৎপরতা সহসা বৃদ্ধি পায়। বিদ্যাধরীর ঘাটে পর পর দুটি বিদেশী পোত এসে ভিড়েছে। এত বেশি শ্বেতবর্ণের মানুষকে চন্দ্রকেতুগড়ে অনেকদিন দেখা যায়নি। রাজধানীর অধিবাসীরা শুনেছে বহু বছর আগে থেকেই মাঝে মাঝে একাধিক অতিবৃহৎ জলযান এখানে আসে। তারা অনেক সময় মাসাধিককাল কিংবা তারও বেশী সময় থেকে যায়। শূন্য পোত নিয়ে তো ফিরে যাওয়া যায় না। যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার ওরা নিয়ে আসে সেগুলো নানা ব্যক্তির কাছে খুচরা বিক্রি করা সম্ভব নয়। চিত্রাক্ষ বরাবর সেগুলো ক্রয়

করে নিত। তারপর এখানকার ব্যবসায়ীদের কাছে ধীরে ধীরে বিক্রয় করত। এবারে দুটি পোত একসঙ্গে এসেছে। তাই দ্বিজন্মেরও ভাগ্য খুলল। চিত্রাক্ষ দ্বিজন্মের আগমনে ঈর্ষাবোধ করে না। সে কনকধ্বজ নয়। তার বিশ্বাস যে যার ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়। কারও উন্নতি দেখলে হিংসা করার অর্থ দেবতাদের বিরোধিতা করা।

কনকধ্বজ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। তাছাড়া সে এতবেশি ভূসম্পত্তির অধিকারী যে বাণিজ্যের প্রতি তার আকর্ষণ ততটা নেই। এর জন্য তার স্ত্রী মূলত দায়ী। সে জানে তার স্বামীর অন্য নারীর প্রতি দুর্বলতা একটু বেশি। বিদেশে না গিয়েও কনকধ্বজ এমন সব অবাঞ্ছিত কর্ম করে ফেলে যার ফলে তার স্ত্রীর মুখ দেখান ভার হয়। একটি ঘটনা তো রাজসভায় উত্থাপিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অনেক কষ্টে কনকধ্বজের স্ত্রী মন্ত্রী শল্যের সাহায্য নিয়ে সেই যাত্রায় উদ্ধার পায়। শল্যের কন্যা তার বাল্যসহচরী।

কনকধ্বজ সুস্থ থাকলে যে কোন প্রকারে দ্বিজন্মকে এই সুযোগ গ্রহণে বাধা দিত। তবে দ্বিজন্ম তার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ধরে। তার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ইতিমধ্যে তার পোত জলধিশত্রুকে নিয়ে সে দুইবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে এসেছে। সে বাণিজ্য খুব ভাল বোঝে। রসকষও কম। তার স্ত্রী নটী কাঞ্চনমালার বান্ধবী অথচ সে কাঞ্চনমালার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করেনি। চিত্রাক্ষ একথা জেনে অবাক হয়। চরিত্রবান হওয়া ভাল। কিন্তু এমন নীরস চরিত্র নিয়ে অর্থ উপার্জনের আসক্তি ছাড়া অন্য কিছুরই আস্বাদন পাবে না। কখনো বুঝবে না পৃথিবী কত সুন্দর কত মধুর, একথা ভাবা যায় না। তবু কনকধ্বজের চেয়ে ভাল। অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না। নারীর প্রতি কনকধ্বজের মাত্রাতিরিক্ত লোলুপতা পশুর জন্মগত শৃঙ্খলাবোধেরও সীমা ছাড়ায়।

নদীর ঘাটে স্নানের জন্য যুবতী আর কিশোরীদের সংখ্যা কয়েকদিন হল বৃদ্ধি পেয়েছে নগরীর ভেতরে তিনটি বড় বড় পুষ্করিণীও রয়েছে। সেখানে সাধারণ অনেক রমণী স্নান করে। কারণ স্নানের ঘাটে বসন পরিবর্তনের জন্য আড়াল করা স্থান রয়েছে। নদীতে সবার আসা সম্ভব নয় দূরত্বের জন্য। কিন্তু কদিন হল দূর থেকেও অনেকে আসছে। একটা সুবিধা রয়েছে যে স্নানের ঘাটের অদূরে বৃক্ষপরিবেষ্টিত একটি স্থান রয়েছে। সেখানে নারীদের সিক্তবস্ত্র পরিবর্তনের কোন অসুবিধা হয় না। সবাই বড় বেশি জলকেলিতে ব্যাপৃত হয়। তবে সবাই এর মধ্যে বারবার আড় চোখে দেখে নিচ্ছে, শিকল দিয়ে নামানো অঙ্কুশ যে দুটি বিদেশী পোতকে নদীবক্ষে অনড় রেখেছে সেই দিকে। সেখানে আদুড় গায়ে শ্বেতবর্ণের নাবিকেরা কর্মব্যস্ত। মাঝে মাঝে তারাও মুখ ফিরিয়ে এদিকে চেয়ে হেসে হাত নাড়ে।

একজন কিশোরী বলে ওঠে—কী অসভ্য।

আর একজন বলে—ওই যে মোটা মত দেখছিস, কালকে হাত দিয়ে ডাকছিল আমাকে

—কী করে বুঝলি?

—নিজের চোখে দেখলাম।

—না তাকালেই দেখতে পেতিস না।

—লোকে তো চোখ বন্ধ করে থাকে না। তুই তাকাচ্ছিস কেন?

—আমি তো বলছি না আমাকে ডাকছিল।

—সবাইকে কি ডাকে? বেছে বেছেই ডাকে।

—ইস্, কী রূপ। যেন ফেটে পড়ছে।

—তুই আর বলিস না। এক ক্রোশ দূর থেকে নদীতে চান করতে এসেছে। তার চেয়ে

মরণ ভাল।

—তোর বাড়ি যেন দুহাত দূরে। সব জানা আছে।

অন্যেরা জলকেলি বন্ধ করে ওদের ঝগড়া শুনছিল। বুঝে গেল এই নিয়ে মন্তব্য করা নিরাপদ নয়। বেশি ভালমানুষ হতে গিয়ে বিপদে পড়ে যাবে। তারা জানে এই জলক্রীড়াই তাদের সাহসিকতার শেষ গণ্ডি। এর বেশি অসমসাহসিকতা কেউ দেখাতে পারবে না। বিদেশীরা মাঝে মধ্যে যখন গ্রাম্য পথে ঘুরে বেড়ায় তখন এরাই রাংচিতার বেড়ার আড়াল থেকে এদের স্বাস্থ্য আর যৌবন দেখে বাইরে আসতে সাহস পায় না। হ্যাঁ, এক আধজন সাহস পায়। অতীতেও পেয়েছে। এখনো পায়। সবাই তাদের দুর্নাম রটায় আবার সবাই তাদের সমীহ করে। গতবারে যে বিদেশীর সঙ্গে ঘুরল ফিরল বিম্ব নামে মেয়েটা তার কী সুন্দর একটা ছেলে হল। ঠিক ওদের মত গায়ের রঙ। নাম রেখেছে গোমো। ওর বাবার নামও নাকি ওই ধরণের ছিল। সারাজীবন কি করে চলবে? বিম্বর বিশ্বাস গোমোর বাবা আবার ফিরে আসবে। সে নাকি বলে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত এখানে এসেই থাকবে। অনেক অর্থ দিয়ে গিয়েছে। এখানকার কয়েকজন তাকে ওই অর্থের লোভে বিয়েও করতে চেয়েছিল। ও সম্মত হয়নি। গোমের পিতা এখনো তার হৃদয় জুড়ে। চার বছর তো কেটে গেল, বিম্বর প্রিয়তম কবে ফিরবে সে জানে না। তবু পথ চেয়ে বসে রয়েছে। এখানকার সাধারণ অল্পবয়সী মেয়েরা ভাবে, শুধু চোখে দেখে আশা মেটানোই ভাল। তার বেশী এগোলে একটা গোমোকে নিয়ে আনিশ্চয়তার জীবন কাটাতে হবে। তার চেয়ে বারাঙ্গনাদের পল্লীতে ওরা যেমন যায় তেমনি যাক। আর একজন বিম্ব হয়ে লাভ নেই।

গোমোর পিতা এবারে আসেনি। সে মহারাজকে পর্যাপ্ত সুরা এনে দেবে বলেছিল। তবে সে না আসলেও নাবিকদের বলে দিয়েছিল। তাই তারা অনেক অলিঞ্জর পূর্ণ সুরা এনেছে মহারাজের জন্য। চিত্রাক্ষের মহা আনন্দ।

সেই সময় বিম্ব একদিন চিত্রাক্ষের গৃহে তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে। বিম্ব তার পরিচিত কেউ নয়। সে তাই বলে—আপনি আমাকে চিনবেন না। আগে যে পোত এসেছিল তার যিনি কর্তা ছিলেন, আমি তাঁর সন্তানের মা।

—সে কী?

—হ্যাঁ, ছেলেটি তাঁর মতই দেখতে হয়েছে। তিনি বলেছিলেন এখানে এসে আমার কাছে থাকবেন শেষ জীবনে। কিন্তু তিনি তো এলেন না। হয়ত ওখানে তাঁর সংসার রয়েছে। আমি সেজন্য কিছু বলছি না। আমি শুধু তাঁকে জানাতে চাই যে তাঁর একটি পুত্রসন্তান রয়েছে গঙ্গেতে। তিনি নিশ্চয় জানেন না সেকথা। আমার নাম বিম্ব। এই নামটা তিনি জানেন। ওদেশের নাবিকেরা তো এসেছে, যদি তাদের এই কথা আপনি বলে দেন।

চিত্রাক্ষ সব শুনে বলে—আমি অবশ্যই বলব। দেখব কি করা যায়। আমি জানতাম না।

বিম্ব কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চিত্রাক্ষের গৃহ থেকে চলে যায়। চিত্রাক্ষ সেই দিনই ওদের জলযানে উঠে সবাইকে ডেকে সবিস্তারে সব কিছু বলে। ওরা বিস্ময়াভূত হয়।

চিত্রাক্ষ বলে—নামটা ঠিক মনে নেই আমার। আমার সঙ্গেও খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল। নামটা বোধহয় গোল—

ওরা একসঙ্গে বলে ওঠে—গোলডোম। আমরা জানি, একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। কিন্তু ছেলে হয়েছে বলে জানি না। সেও জানে না। মেয়েটিকে খুব ভালবেসেছিল।

সেই তো রাজার জন্য সুরা নিয়ে আসতে বলেছিল।

একজন বলে—আমরা ওর ছেলেটিকে দেখতে যাব। ওর মাকে আমরা সাধ্যমত কিছু দিতে চাই।

—বেশ তো। তবে গোলডোমের ছেলের বাড়ি তো আমি চিনি না। জেনে নিয়ে লোক পাঠাব তোমাদের কাছে।

একজন হেসে বলে—এবারে সুরার স্বাদ কেমন লাগছে?

—চমৎকার। মহারাজ নিজে প্রশংসা করেছেন। আমাদের এখানে আঙুর হয় না। তাই এত স্বাদ হয় না সুরায়।

—তোমাদের দেশে মাটিতে আঙুর হবে বলে মনে হয় না। পাহাড় নেই। ভিজে মাটি।

—হয়তো তাই।

—আঙুর নেই তো কি হল? এত কলা তোমাদের দেশে। আমরা ভাবতে পারি না। তোমাদের দেশের আমের কথা শুনেছি। অমন মিষ্টি আর সুস্বাদু ফল হয় না। একবার সেই সময়ে আসার ইচ্ছা আছে। তবে আমাদের আপেল তোমরা পাবে না।

চিত্রাক্ষ এতক্ষণ কথা বলছিল শুকনো মুখে নয়। হাতের সামনে রাখা পাত্র থেকে একটু পর পর একটু একটু করে সুরা পান করছিল। তারপর একসময়ে উঠে এল।

নীচে নেমে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখে অদূরে একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিম্ব দাঁড়িয়ে রয়েছে, সঙ্গে ধপ্‌ধপে ফর্সা একটি ছেলে। অনেকে এই পথে যাচ্ছিল আর ছেলেটির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। কয়েকজন নিম্নকণ্ঠে আলোচনা করছিল। একজন বলল— মেয়েটার বর এসেছে বোধহয় ওই পোতে।

চিত্রাক্ষ শুনতে পায়। সে ভ্রূক্ষেপ না করে বিম্বের সামনে গিয়ে বলে—তুমি এখানে?

—এদিকে আসি। ভাবি, সে হয়ত এসেছে। আমাকে ভুলে গিয়েছে। কত দেশে যায় ওরা।

চিত্রাক্ষ বলে—না গোলডোম আসেনি।

বিম্ব উৎসাহিত হয়ে বলে—হ্যাঁ, ওর নাম গোলডোম। আসেনি তাহলে? আপনি বলেছিলেন?

—বলেছি। ওরা এর বাবাকে গিয়ে সব বলবে। তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক। তোমার পক্ষে জলযানে ওঠা ঠিক হবে না। ওখানে মেয়েদের যেতে নেই।

—হ্যাঁ। ও আমাকে সেকথা বলেছিল। খারাপ মেয়েরা ওখানে যায়।

—ওরা তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার ছেলেকে দেখে আসতে চেয়েছিল। আমার মনে হয় তোমাকে সাহায্যও দেবে। একটু দাঁড়াও।

কিছুক্ষণ পরে সাতজন নাবিক চিত্রাক্ষের সঙ্গে নেমে আসে। তারা বিম্বর ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে খুব আনন্দ করে। নিজেদের মধ্যে অনর্গল কথা বলে যায়। তারপর তিন বছরের ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে সবাই আদর করে। গোমো কি বুঝল, সেই জানে। ওদের সঙ্গে খুব হাসাহাসি করল। তবে ওদের কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। বিম্বও বোঝে না স্বামীর দেশের কথা দুচারটে শিখেছিল। ভুলে গিয়েছে।

তারপর গোমোর নাম জিজ্ঞাসা করল ওরা। বিম্ব নাম বলে। ওরা অট্টহাসি হেসে ওঠে বিম্ব ভাবে, নামটা কি খারাপ রাখা হয়েছে।

চিত্রাক্ষ ওদের জিজ্ঞাসা করে, নাম শুনে ওরা এত হাসল কেন?

—নামটা শুনতে খুব মিষ্টি লাগছে। ওর বাবাকে গিয়ে বলতে হবে। আর বলব, সুন্দর দেখতে হয়েছে গোমোকে, ওর বাবার চেয়েও সুন্দর।

একজন একটি ক্ষুদ্র থলি বের করে বলে—আমরা সবাই মিলে আমাদের দেশের স্বর্ণমুদ্রা কিছু কিছু করে সংগ্রহ করলাম গোলডোমের ছেলের জন্য। পৃথিবীর সর্বত্র সোনার মূল্য রয়েছে। এটি আমরা গোমোর জন্য দিতে চাই।

চিত্রাক্ষ থলিটির আয়তন দেখে বুঝল ওতে সপুত্র বিম্বের অনেক বছরের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। গোলডোমও কিছু দিতে পারে ওদের কাছে। সে এই বিদেশীদের উদার মনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়। একজন সহকর্মীর বিদেশী প্রণয়িনীর গর্ভজাত পুত্রের জন্য কিছু করা তারা কর্তব্য বলে ভেবেছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা এগুলো সংগ্রহ করল। তার জন্যে ওদের আলোচনায় বসতে হয়নি। যার প্রাণে যা চেয়েছে তাই দিয়ে দিয়েছে।

বিম্বর চক্ষু অশ্রুসিক্ত। তাই দেখে সবাই কলরব করে ওঠে। একজন বলে ওঠে—ওকে কাঁদতে মানা করুন। আমরা কিছুই করতে পারলাম না। গোলডোম শুনলে নিজেই সঙ্কুচিত হবে। আমরা জানি প্রথম সুযোগেই সে এদেশে আসবে। ওকে বলুন, সে অবিবাহিত। আমাদের দেশের মেয়েকে তার ভাল লাগে না। ও একটু অন্যরকমের। আমাদের ওসব কিছু নেই। নানা দেশে ঘুরে বেড়াই। যেখানকার যেটুকু মজা লুটেনি। শুধু আমাদের রাজার কড়া নির্দেশ বারবনিতা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের গায়ে হাত দেওয়া চলবে না। হাত কেটে শাস্তি দেওয়া হয়। কিংবা সিংহের খাঁচায় ফেলে দেওয়া হয়।

চিত্রাক্ষ মোটামুটি সব কথা বিম্বকে বলে। বলে, তার স্বামীর অন্য কোন স্ত্রীলোক নেই। বিম্ব হাসিমুখে বিদায় নেয়। ওরা ছেলেটির গাল টিপে দেয়।

রটে যায়, গোমোর বাপের দেশের লোকে তার সঙ্গে দেখা করে অনেক অর্থ দিয়ে গিয়েছে। বিম্বর আর ভাবনা নেই।

রাজমাতা অম্বিকা শয্যাশায়ী ছিলেন সাধারণত বাতের ব্যথায়। তাঁর অন্য কোন উপসর্গ ছিল না। কিন্তু কয়েকদিন আগে রাজবৈদ্য তাঁর নাড়ীর গতি দেখে চিন্তিত হন। গতি অনিয়মিত। কখনো দ্রুত, কখনো ধীর। বৈদ্য বুঝলেন, শমনের ডাক আসতে বোধহয় বিলম্ব নেই। রাজমাতার শরীরের সব কিছু ঠিকভাবে কাজ করছে না।

অম্বিকাদেবী দু একদিন হল অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। তিনি বৈদ্যকে ম্লান হেসে বলেন—আমি বুঝতে পারছি যে আমার ডাক এসেছে। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল না।

—কোন্ আকাঙ্ক্ষা মা?

—চন্দ্রের উত্তাধিকারী কে?

রাজবৈদ্য নীরব থাকেন। তিনি সাতদিন পূর্বেই দুই রানীকে দেখেছেন। তেমন কোন লক্ষণ নেই। তিনি ভাবেন, দুই রানীই বন্ধ্যা হলেন কি করে? অবশ্য বড় রানীর কথা স্বতন্ত্র। রাজমাতা তাঁকে একদিন বলেছিলেন, বড় রানীর সঙ্গে তাঁর পুত্রের কোন সম্পর্ক নেই। কথাটা আগেও বাতাসে ভাসত। তবে রাজমাতার মুখে শোনার আগে বিশ্বাস করতেন না। এমন না হলে তিনি হয়ত রাজমাতা এবং প্রজাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারতেন। মহারাজা শেষ পর্যন্ত হয়ত তৃতীয় রানীকে আনতে বাধ্য হবেন। প্রজাদের দাবি অস্বীকার করতে পারবেন না।

বৈদ্য অম্বিকা দেবীর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার কিছু পরে রানী ঊর্মিলা এসে তাঁর

শয্যাপার্শ্বে দাঁড়িয়ে মধুর স্বরে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

রাজমাতা বলেন—শোন মা, আমি আমার দেহের কথা একটুও ভাবি না। নিজের যন্ত্রণাকে মুখ বুজে সহ্য করতে পারি। কিন্তু আমার মন অশান্ত। এই দশা কেন হয়েছে তোমাকে নিশ্চয় বলতে হবে না।

ঊর্মিলা অধোবদন হন। তারপরে বলেন—আমার দুর্ভাগ্য।

—শুধু তোমার নয়। এই পরিবারের এবং সারা রাজ্যের দুর্ভাগ্য।

ঊর্মিলা একটু নীরব থেকে বলেন—আমি সমস্ত দেবতার কাছে প্রার্থনা করেছি। উপবাস করেছি, পূজা করেছি। এখন আমার মনে হয় এ আমার পূর্বজন্মের কোন পাপের কর্মফল।

—তোমার এত সুন্দর স্বভাব দেখে আমার মনে আশা জেগেছিল। আমি জানতাম যে তোমার গর্ভের পুত্রসন্তান চন্দ্রের মত দীর্ঘদেহী নাও হতে পারে। কারণ, জানি তোমার পিতা কিছুটা খর্বকায়। তবু উত্তরাধিকারী তো লাভ করত চন্দ্র। পিতার মত দীর্ঘদেহীও হতে পারত সেই সন্তান। বৈদ্য বলেছিল, রানী সুন্দরী আর দীর্ঘদেহী দেখে আনলেই হয় না, দেখতে হয় রানীর পিতা ও মাতাও দীর্ঘদেহী এবং গৌরবর্ণযুক্ত কিনা। তাদের গাত্রবর্ণ থেকে শুরু করে অনেক কিছু নবজাতক পেতে পারে। আর একজনকে তো এনেছিলাম সর্বাঙ্গসুন্দর। তার পরিবারও সেই রকমই। কিন্তু সে তো শুনি বিবাহিতা কুমারী। তুমি কী মনে কর?

—আমি বলতে পারি না।

—তুমি নিজের কথা না ভেবে মহারাজকে বলতে পার না বড়রানীর ঘরে যেতে?

—আমি বলব কেন? আমার কি শোভা পায়? তিনি তো বড়রানীকে নিয়ে ঘুরে এলেন কয়েকদিন। আমি বাধা দিইনি।

—সে তো তার স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বাধ্য হয়ে গিয়েছিল। ওকে প্রথম যখন আনা হল তার কিছুদিন পর থেকেই চন্দ্রের মুখের দিকে চাইলে আমার কান্না পেত। পরে অবশ্য সবই সয়ে যায়। কিন্তু তার পর থেকেই ও অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল। তুমি এলে বলে ও বাঁচলো। তবু শেষ রক্ষা তো করতে পারলে না। তাই ভাবছি—

—আমিও ভাবছি।

—কি ভাবছ?

—ওকে বলব নতুন রানী আনতে।

রাজমাতার কণ্ঠস্বরে উৎসাহ ঝরে পড়ে— পারবে? সত্যি পারবে বলতে?

—পারব। তাঁর আর দেশের মঙ্গলের জন্য সব পারব।

—তোমাকে আমি আশীর্বাদ করি। বড়রানী যখন বিষ্ণুমন্দিরে গেল তখন আমি ভেবেছিলাম তার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু না। তার অহমিকা এখনো রয়েছে। নইলে চন্দ্রকে কাছে টানল না কেন?

—উনি মাঝে মাঝে বড়রানীর কক্ষে যান।

—রাতে যায়?

—হ্যাঁ। বলেন, তাঁকে একেবারে স্বাভাবিক করে তুলবেন।

—গেলেই তো হল না। কতক্ষণ থাকে?

—তা তো জানি না।

—তোমার কাছে ফিরে আসে?

—সেই রাতে আর আসেন না। নিজের কক্ষে বোধহয় চলে যান। আমার কাছে গিয়েও অনেক দিন নিজের কক্ষে চলে যান।

রাজামাতা তাঁর স্বামীর কথা স্মরণ করার চেষ্টা করেন। তিনিও বেলা অবধি তাঁর ঘরে থাকতেন না। অন্য কারও সামনে রানীর কক্ষ থেকে বের হতে বোধহয় সঙ্কোচ হত। খুব স্বাভাবিক।

—তোমাকে বড়রানীর কথা কিছু বলেছে?

—কদিন আগে বলেছিলেন, বড়রানী একেবারে স্বাভাবিক হয়েছেন বলে মনে হয়। তাতে ওঁরও খুব আনন্দ হয়েছে।

—হ্যাঁ, আমাকে বলেছিল যে দেবযানীকে বড় বেশি অবহেলা করে ফেলেছে। অন্যায় করেছে।

এরপর এক পক্ষকাল অতিক্রান্ত হল। রাজমাতার অবস্থা একই রকম। রাজবৈদ্য নিয়মিত এসে দেখে যান। একদিন অম্বিকাদেবী রাজবৈদ্যকে বলেন—ভাল চিকিৎসকেরা শুনি রোগীর মুখচোখ দেখেও বলে দিতে পারেন, কি অসুখে ভুগছে।

—পারেন বৈকি। বেশির ভাগ সময়েই পারেন।

—আপনি পারেন না?

—অনেক ক্ষেত্রে পেরেছি। কখনো পারিনি।

—রানীদের দেখে তো বলতে পারেন না।

রাজবৈদ্য হতভম্ব হয়ে যান। বলেন—তাঁরা তো সম্পূর্ণ সুস্থ।

রাজমাতা উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন—যে নারী সন্তানবতী হতে পারে না সে কি সুস্থ? আপনি আজই দুজনকে দেখে আমাকে বলুন তাদের ত্রুটি কোথায়? আপনার মতামত জেনে আমি তৃতীয় রাণী আনার ব্যবস্থা করব।

রাজবৈদ্য গম্ভীর হয়ে যান। রাজমাতার আদেশ পালন করতেই হবে। রানীদেব পরীক্ষা করে ফিরে এসে যদি বলেন—আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের কোন ত্রুটি নেই। তাহলে তিনি এত উত্তেজিত হয়ে উঠবেন যে তাঁর হৃদ্‌পিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাবে। অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে তিনি অন্যমনস্তভাবে চলতে থাকেন রাণীদের কক্ষের দিকে।

দাসী বিমলা রাজমাতার সঙ্গে রাজবৈদ্যের কথোপকথন সবই শুনেছিল। সে আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আগে এসে সবই জানিয়ে গেল চন্দ্রমুখী আর জাহ্নবীকে। দুজনেই দুই রানীর কক্ষের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছিল পরস্পরের সঙ্গে। বিমলার কথা শুনে তারা বিমর্ষ বোধ করল। কিন্তু ঠিক করল কোন রানীকেই কিছু জানানো হবে না।

রাজবৈদ্য প্রথমে আসেন রানী ঊর্মিলার কক্ষে। প্রবেশের আগে তিনি হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে চন্দ্রমুখীকে বাইরেই থাকতে বললেন। বৈদ্য জানেন, চন্দ্রমুখীর সামনে সব কথা বলা, সব প্রশ্ন করা ঠিক হবে না। ঊর্মিলাও সঙ্কোচবোধ করবেন। সম্ভাবনা যদি কিছু থাকে, এখানেই তার লক্ষণ মিলবে। তবে বৈদ্য বিস্মৃত হয়েছিলেন যে তাঁর আগমনবার্তা রানীকে জানানো উচিত ছিল প্রবেশের পূর্বে। তিনি সহসা প্রবেশ করতে ঊর্মিলা অপ্রস্তুত হয়ে যান।

রাজবৈদ্য বলেন—আমার ভুল হয়েছিল। আপনাকে আমি জানাতে বলিনি আমি যে আসছি আপনাকে দেখতে। বয়স হয়েছে বলে অনেক কিছু এমন ভুল হয়।

ঊর্মিলা পালঙ্কের ওপর উঠে বসে স্মিত হাস্যে বলেন—তাতে কী হয়েছে? আপনি আমার পিতার মত।

বৈদ্যের মনও ওঁর কথায় গভীর মমতায় ভরে ওঠে। পিতার মতই বটে। তাঁর কন্যার বয়সেরই হবেন রানী। তিনি অনেকক্ষণ ধরে রাণীকে নানা প্রশ্ন করেন। তাঁর নাড়ীর গতি অনুভব করেন। চোখের পাতা টেনে দেখেন। তাঁকে দাঁড় করিয়ে পায়ের পাতা দেখেন।

উর্মিলা বলেন—আপনি আজ আমাকে এত পরীক্ষা করছেন কেন? আমার কি কিছু হয়েছে?

—না মা, আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। আচ্ছা, আপনার কি কোন বিষয়ে সামান্যতম কোন অসুবিধা রয়েছে?

—না।

—ধরুন তলপেটে কিংবা ওইরকম কিছু? আপনি কি নিয়মিত ভাবে ঋতুমতী হন?

রানী উর্মিলার কপোল রাঙা হয়ে ওঠে। তিনি মৃদুস্বরে বলেন—আমার কোন অসুবিধা নেই।

—ঠিক আছে মা। আমি এখন আসি।

বৈদ্য জানতেন, তিনি কোন আশার আলো দেখতে পাবেন না। তবু উর্মিলার কক্ষ থেকে বাইরে আসার সময় হতাশায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়। তবু বড় রানীর প্রকোষ্ঠে যেতে হবে। উর্মিলার কক্ষের বাইরে চন্দ্রমুখী অপেক্ষা করছিল। বৈদ্যকে সে কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পায় না।

দেবযানীর কক্ষের বাইরে জাহ্নবী অপেক্ষা করছিল। সাধারণত সে বাইরে থাকে না। দেবযানীর কাছেই থাকে। আজ রাজবৈদ্যের আসার কথা শুনে দাঁড়িয়ে ছিল। বৈদ্যের অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখ দেখে সে কিছু অনুমান করতে পারে না।

—রানী মা আছেন?

—হ্যাঁ।

—বল, আমি তাঁকে দেখতে এসেছি।

জাহ্নবী ভেতরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে এসে বলে—আসুন।

রাজবৈদ্য প্রবেশের সময় জাহ্নবীকে অনুসরণ করতে দেখে বলেন—না, তুমি বাইরে অপেক্ষা কর।

জাহ্নবী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বৈদ্য ভেতরে প্রবেশ করেন। রানীর রূপ দেখে তিনি প্রতিবারই মুগ্ধ হন। ভাবেন, এমন একজন নারীর সন্তান নেই একথা ভাবতে কষ্ট হয়। মনটা যদি তাঁর রূপের মত সুন্দর হত তাহলে তিনি হয়ত মহারাজকে উত্তরাধিকারী উপহার দিতে পারতেন।

জাহ্নবী বাইরে অপেক্ষা করে। একটু পরে চন্দ্রমুখী একপা একপা করে তার কাছে এসে দাঁড়ায়। সে ফিস্‌ফিস্ করে জানায় রাজবৈদ্য উর্মিলাকে কী কী প্রশ্ন করেছিলেন। জাহ্নবী হাসে। চন্দ্রমুখী ছোটরানীর সখী বলে স্বাভাবিকভাবে সব কথা তাঁর সঙ্গে বলতে পারে।

একসময় জাহ্নবী বলে ওঠে—এতক্ষণ ধরে রাজবৈদ্য কি করছেন?

—তাই তো, অনেকক্ষণ হয়ে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য দেবযানীর প্রকোষ্ঠ থেকে ঝড়ের গতিতে বাইরে এসে দ্রুতপদে চলতে থাকেন। জাহ্নবী উৎকণ্ঠিত হয়ে দেবযানীকে দেখতে ভেতরে যায়। চন্দ্রমুখী রাজবৈদ্যের পেছনে পেছনে গিয়ে দেখে তিনি রাজমাতার কক্ষে প্রবেশ করেন। সে তাঁর

দাসী বিমলাকে দেখতে পায় না সেখানে। তবু অপেক্ষা করে বিমলার জন্য। বোধহয় ভেতরে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সে দেখে বিমলা অন্য দিক থেকে হাতে একটি পাত্রে রাজমাতার জন্য খাদ্য নিয়ে আসছে।

—তুমি কোথায় গিয়েছিলে বিমলা?

বিমলা হাতের পাত্র দেখায়।

—রাজবৈদ্য বড়রানীর ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে এখানে ঢুকেছেন।

—আবার?

—হ্যাঁ। তাই তো তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। একটু দেখে এসে আমাকে বলবে?

বিমলা এক মুহূর্তও দেরি না করে রাজমাতার কক্ষে প্রবেশ করে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই রাজবৈদ্য রাজমাতার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন। চন্দ্রমুখীর প্রবল ইচ্ছা হলেও বৈদ্যকে কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পায় না।

বিমলা একটু পরেই বাইরে এসে কোমর দুলিয়ে নাচতে থাকে। তবে নিঃশব্দে। রাজমাতা শব্দ ভালবাসেন না। তার এই অভব্যতায় চন্দ্রমুখীর মুখ কঠোর হয়ে ওঠে। এই ধরনের নারীদের সঙ্গে সে মিশতে অভ্যস্ত নয়। তবু রাজমাতার দাসী বলে কথা। কাজে অকাজে তাকে প্রয়োজন হতে পারে।

বিমলা অনুচ্চকণ্ঠে সুর করে কি যেন গাইছিল। চন্দ্রমুখী তাকে বলে—তোমার এই বিশ্রী নাচ কেউ সুনজরে দেখবে না।

বিমলা হাসতে হাসতে বলে—সবাই দেখবে। সবাই দেখবে। তারাও নাচবে আমার সঙ্গে। যাই সুহস্তকে গিয়ে বলি। রাজবৈদ্য নিজেই তো ছুটলেন মহারাজকে জানাতে।

চন্দ্রমুখী ধৈর্য ধরতে না পেরে বলে—হয়েছে কী?

—কী আবার হবে? মহারাজা সন্তানের মুখ দেখবেন। যাকে সামনে পাব, তাকেই বলব।

চন্দ্রমুখী এই সুসংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছোটে ঊর্মিলার কাছে। ভাবল, এত আনন্দের কথা রাজবৈদ্য তাকেও বলতে পারতেন। গিয়ে দেখে ঊর্মিলা চুপ করে বসে রয়েছেন। তাঁকে সে বলে—রাজবৈদ্য এতবড় সুসংবাদ তোমাকে বলে গেলে পারতেন।

—কী বলবেন?

—তুমি গর্ভবতী?

বিস্মিত ঊর্মিলা বলে ওঠেন—কে বলল?

—বিমলা।

—বিমলা? রাজমাতার কাছে যে থাকে?

—হ্যাঁ।

—সে জানল কী করে?

—বৈদ্য রাজমাতাকে গিয়ে বলেছেন। আমার সামনে দিয়েই গেলেন তাঁর কাছে। আমি তাঁকে যেতে দেখে বিমলাকে পরে পাঠালাম সংবাদ জানতে। রাজবৈদ্য তখন নাকি ছুটলেন মহারাজকে এই সুসংবাদ জানাতে। বিমলা রাজমাতার কক্ষ থেকে বাইরে এসেই কোমর দুলিয়ে নাচতে শুরু করল।

—কী শুনতে কী শুনেছ। ছি ছি। সবাই কী ভাববে।

চন্দ্রমুখী তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। দেখে জাহ্নবী চলেছে সামনে দিয়ে। চন্দ্রমুখী তাকে দেখে বলে—বিমলা এক কাণ্ড করেছে।

—কী করেছে?

—সুহস্ত আর সবাইকে বলতে ছুটেছে যে মহারাজের সন্তান হবে।

—বিমলা জেনে গিয়েছে? সব কথাই ও আগে জেনে যায়। যাক ভালই হয়েছে।

চন্দ্রমুখী ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলে—কিন্তু কথাটা তো সত্য নয়।

—কে বলল, সত্য নয়? রাণী দেবযানী তো তখন থেকে একবার হাসছেন, একবার কাঁদছেন। তাই চলেছি বৈদ্যের কাছে। যদি কোন ওষুধ দেন।

চন্দ্রমুখীকে বজ্রাহতের মত দেখায়। এই বজ্রপাত বিনা মেঘেই হয়েছে। জাহ্নবী ধীরে ধীরে তার দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বুঝতে তার একটুও অসুবিধা হয় না যে বড়রানীর আম্রকাননে বাস রীতিমত সফল। সেইখানেই মুকুলের উদ্‌গম। এর মধ্যেই কুশির পর্যায়। সে বিষণ্ণ চিত্তে ঊর্মিলার কক্ষে প্রবেশ করে থমকে যায়। ভাবে ফিরে আসবে। কিন্তু তিনি দেখে ফেলেছেন।

—কী হল? অমন থেমে গেলে কেন?

চন্দ্রমুখী বুঝে উঠতে পারে না কী বলবে। সে বুঝতে পারে, রাজ্যের সবাই উল্লসিত হবে এই সংবাদে। কিন্তু সে হতে পারছে না। তবে ঊর্মিলা তো তার মত সাধারণ নারী নন, তিনি অনেক সরল অনেক মহৎ আর উদার। মহারাজের মঙ্গল, রাজ্যের মঙ্গলকে তিনি নিশ্চয় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেবেন। আনন্দই হবে তাঁর।

সে ঊর্মিলার সামনে এগিয়ে গিয়ে বলে—সংবাদটি সত্য।

—কোন্ সংবাদ?

—বিমলা যা বলেছে।

—আমাকে গোপন করলেন কেন?

—তুমি তো নও। উনি।

—কী বললে?

—হ্যাঁ, বড়রানী গর্ভবতী।

ঊর্মিলা উদ্ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ চন্দ্রমুখীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁর মুখমণ্ডল মুহূর্তে রক্তশূন্য হয়ে যায়। তিনি চেতনা হারিয়ে পালঙ্কের ওপর লুটিয়ে পড়েন।

চন্দ্রমুখী ভীত হয়ে পড়ে। ভাবে, কী কববে এখন? বৈদ্যের কাছে ছুটবে? সেখানে জাহ্নবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে বড় লজ্জার বিষয় হবে। শেষে ঊর্মিলার চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়ে ব্যজন করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মেলেন রানী। চন্দ্রমুখী ভাবে, সব নারীই সমান। তার বাল্যসখীকে সে আজ প্রথম চিনল। সে অপাপবিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু তার ঔদার্যের সীমারেখা রয়েছে। নিজেকে সে দেবীর পর্যায়ে উন্নীত করতে পারল না। তাদের এতদিনের সখীত্বের ঘনত্ব একটু যেন তরল হয়ে গেল। সে জানে সে নিজে একজন উন্নতমনের রমণী নয়। তার মধ্যে হিংসা দ্বেষ ইত্যাদি যাবতীয় কু-এর প্রভাব রয়েছে। ঊর্মিলার প্রতি তার আকর্ষণের মূল কারণ সখীর হৃদয়ের স্বর্গীয় সুষমা। সহসা এক ঝটকায় সেই সুষমা উধাও হয়ে গেল। সখীও পরিণত হল সাধারণ রমণীতে।

ঊর্মিলা বলে—চন্দ্রমুখী, আমি পারলাম না।

চন্দ্রমুখী মনমরা হয়ে উত্তর দেয়—তাতে কী হয়েছে? মহারাজা তোমাকে কত ভালবাসেন।

—ভালবাসা? পুরুষের? ওই গনগনে রূপ, তার ওপর সন্তানের জননী। স্থান পরিবর্তনে মুহূর্তও বিলম্ব হবে না। আজ থেকে আমি দুয়োরানী।

রাজমাতা অম্বিকা দেবী এই সুসংবাদটি শোনার অপেক্ষায় বেঁচে ছিলেন। তিনি দেবযানীকে নিজের শয্যায় বসিয়ে তাঁর মাথায় হাত রেখে বারবার আশীর্বাদ করেছেন। বলেছেন তুমি বিষ্ণুর মন্দিরে গিয়েছিলে। তোমার ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েছেন। এবারে প্রার্থনা কর সন্তানটি যেন পুত্র সন্তান হয়। তোমার প্রার্থনা দেবতা শুনবেন।

—আমি অবশ্যই প্রার্থনা করব মা।

—আমার বড় সাধ ছিল এই বংশের জন্য তোমার গর্ভের সন্তান পেতে। সে কন্যা হলে অসামান্য রূপবতী হবে, পুত্র হলে অসাধারণ সুপুরুষ হবে। বিধাতা সেই সাধ পূর্ণ করলেন। পৃথিবীতে এর চেয়ে বেশি আশা করা যায় না। এবারে আমি শান্তিতে যেতে পারব।

এই কথোপকথনের পর তৃতীয় দিবসে তাঁর মৃত্যু হল। এ মৃত্যু অভাবনীয় ছিল না। তাই চন্দ্রকেতুগড়ের মানুষেরা বিষণ্ণ হলেও শোকাভিভূত হল না। তারা জানত এই দিন আসবে। প্রাসাদেও শোকের কোন প্রকাশ দেখা গেল না। পরিণত বয়সের মৃত্যুতে তেমন আলোড়ন জাগে না। কোন দেশেও নয়, কোন যুগেও নয়। তবে দু'একটি বিশেষ ব্যতিক্রম রয়েছে। চিরকালই তেমন থাকবে।

রাজপ্রসাদের একটি প্রকোষ্ঠ শুধু শূন্য হয়ে গেল। কয়েকদিন একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। দাসী বিমলা কর্মহীন হল না। বরং তার শাপে বর হল। সে ছিল রাজমাতার দাসী, এখন হল রানী দেবযানীর পরিচারিকা। এই ব্যবস্থার উদ্যোগ নিয়েছিলেন দেবযানী স্বয়ং জাহ্নবীর সহযোগিতায়। কারণ তিনি চাইছিলেন না যে তাঁর সখী তাঁর সেবার কাজ করুক। তিনি এতদিন অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। জাহ্নবী সখীব মনের এই অস্বস্তি অনুভব করলেও মুখে কিছু বলেননি। শেষে রাজমাতার মৃত্যুর দুদিন পরে তিনি জাহ্নবীকে বলেন বিমলাকে ডেকে দিতে। বিমলা সব শুনে হাতে স্বর্গ পেল। জাহ্নবী কিন্তু বারবার দেবযানীকে সাবধান করে দিয়েছিল। বিমলার স্বভাব সম্বন্ধে দেবযানীকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলেছিল—ও যেন শুধু পরিচারিকা হয়ে থাকে। ওর সামনে কোন আলোচনা কোন মন্তব্য করলে সেটি পথের মানুষও অচিরেই জেনে যাবে। ওর পেটে কথা দাঁড়ায় না। মন-গড়া কথা বলে কিনা তা অবশ্য জাহ্নবী জানে না। তাহলে তো আরও সর্বনাশ।

বিমলা পৃথার শূন্যস্থান পূর্ণ করল। জাহ্নবী কিছুটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। প্রাসাদের সীমানার মধ্যে তার নিজস্ব একটি ক্ষুদ্র কুটির রয়েছে। দেবযানীর প্রথম পদার্পণের দিনেই তার আর পৃথার জন্য সেটি নির্ধারিত হয়। তখন সবাই জানত সে ও পৃথা একই পর্যায়ের। তারপর পৃথার মৃত্যু হল। এখন সেটি তার নিজস্ব। কুটিরটি সে নিজের মত গুছিয়ে ও সাজিয়ে রাখে। ঘরের প্রাচীর গাত্রে সাজানো রয়েছে মিথুন আর যক্ষিনীর ফলক। বল্লভের নিজের হাতে গড়া বুদ্ধদেব ও বিষ্ণুমূর্তি রয়েছে। সে ও দুটি জাহ্নবীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাকে উপহার দিয়েছে। বল্লভের সব দ্রব্য তার কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তার ইচ্ছায় বল্লভ তাকে পাশের কোন গ্রাম থেকে একটি তাম্রমূর্তিও সংগ্রহ করে দিয়েছে।

এক বছর পূর্বে গুণবানের স্ত্রী দোপাটি তাকে ডেকে বলেছিল, কতদিন আর ওঁকে কষ্ট দেবে? নিজের হাতে ভার তুলে নাও না? চোখে যে দেখা যায় না। উনি সাধারণ মানুষ

হলে তোমাকে বলতাম না। অমন আপন-ভোলা বলেই বলছি। তুমি তো একবার বলেছিলে ভেবে দেখবে। ভাবা শেষ হল? ওঁর দিকে তাকাও না? নিজের চোখে দেখতে পাও না? যদি তোমার সাহস না থাকে, আমি মহারাজের কানে তুলব?

—জানি না।

—তুমি সবচেয়ে ভাল জান। সেইজন্যেই তোমাকে বার বার বলি। তোমার পায়ে ধরতে পারি, যদি রাজি হও।

জাহ্নবীর চোখে জল এসে গিয়েছিল।

এতদিনে বিমলা আসায় সে মুক্তি পেয়েছে। এবার কি বল্লভকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যায়? এবারে দেবাযানীও গর্ভবতী হয়েছেন। বাজমাতার মৃত্যুর পরেও সারা দেশ জুড়ে একটা প্রত্যাশা। সেই প্রতীক্ষা আনন্দের। হয়ত কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। তাতেও আশায় ভাটা পড়বে না। সে রমণী সন্তান ধারণে সক্ষম, সে একাধিকবার গর্ভবতী হতে পারে। মহারানির একটি ফুটফুটে অতি রূপসী কন্যা হলেও তো রাজ্যের প্রতিটি মানুষ গর্বিত হবে।

জাহ্নবী ভালরকম জানে, সমস্ত রাজ্য সমস্ত কুটির, সমগ্র প্রাসাদ যেখানে চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত সেখানে একটি মাত্র কক্ষ অমাবস্যার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। সেটি হল ছোটরানী ঊর্মিলার কক্ষ। মহারাজা চন্দ্রকেতু যখন রূপসী রাণীর কাছে প্রত্যাখ্যাত তখন এই ছোটরানী তাঁকে ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দেহমন দিয়ে। তিনিই মহারাজের ভালবাসার অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়েছিলেন। তাই তাঁর প্রতি মহারাজের আকর্ষণ কখনো নিঃশেষিত হবে না, আগের মত এখনো তিনি ঊর্মিলার কক্ষে যখন রাত্রিযাপনও করেন। তবু সবাই যেমন অনুভব করে, জাহ্নবীও করে, দেবযানীর প্রতি তাঁর বিরূপতা এখন বোধহয় বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই। প্রথমত দেবযানী তাঁর সন্তান গর্ভে ধারণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন, দ্বিতীয়ত দেবযানীর স্বভাবের কল্পনাতীত পরিবর্তন ঘটেছে, যাতে বাল্যসহচরী হয়েও জাহ্নবী বিস্মিত হয়। দেবযানীর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মহারাজও বুঝতে পারেন। এই দুটিই নারীর প্রধান সম্পদ। তার ওপর রয়েছে দেবযানীর কল্পনাতীত রূপলাবণ্য, যে রূপের প্রতি পুরুষের চিরকালের আকর্ষণ। জাহ্নবী জানে, ঊর্মিলা অত্যন্ত অনুভূতিসম্পন্না বুদ্ধিমতী নারী হয়ে এ সবই মর্মে মর্মে অনুভব করেন। তাই মহারাজের তাঁর কাছে যাতায়াতেও তিনি সান্ত্বনা পান না। তবে নিজে স্নিগ্ধ স্বভাবের বলে, এবং মহারাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেমের জন্য মহারাজের ভালবাসার প্রতিদান দিতে কার্পণ্য করেন না। চিরকাল দিয়ে যাবেন। কারণ একথা সত্য জীবনে তিনি পৃথিবীতে একটি পুরুষকেই ভালবেসেছেন।

অতি প্রত্যুষে কাঞ্চনমালা বিদ্যাধরীতে স্নানরতা ছিল। পূর্ব দিগন্তে তখনো সূর্যোদয় হয়নি। অন্ধকার সম্পূর্ণ রূপে অপসারিত হয়নি। কাঞ্চনমালার ভয় করে না। আগে করত। তখন নিজের দেহ রূপ যৌবন, সব কিছুর ওপর একটা মোহ ছিল। কিছুদিনের মধ্যে সব যেন হ্রাস পেয়েছে। উর্বশী একদিন এসে তাকে সাবধান করে বলেছিল—অত ভোরে যাসনে। সূর্য উঠলে যাস্।

—কেন?

—তুই একজন রূপবতী নারী একথা ভুলে যাস না।

—এই দেহ, এই রূপের কোন মূল্য নেই।

—কী বলছিস? দেশের দ্বিতীয় রূপসীর দেহের মূল্য নেই?

—আমি তো প্রথমটির মত প্রাসাদবাসিনী নই, সন্তানও ধারণ করব না। এ দেহ শিয়াল কুকুরে খায় খাবে।

উর্বশী চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল মহারাজের প্রতি তার গুপ্তপ্রেমের জ্বালা, তাকে অবসাদগ্রস্তা করেছে। তবু সে বারবার তাকে বুঝিয়েছিল নানা কথা বলে। উর্বশীকে এড়াতে সে কথা দিয়েছিল। কিন্তু সেই কথার মর্যাদা দেয়নি। আগের মত উষালগ্নেই স্নান করে। তার ধারণা তাকে কেউ কিছু করতে পারবে না। রাজমাতা যেদিন তাঁর কুটিরে পদার্পণ করেছিলেন সেদিন থেকে তার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল কিনা কে জানে। প্রাসাদে রাণীদের আগমনের পরে তার যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটা সঙ্কোচবোধ তাকে বাধা দিত। রাজমাতা বরাবর একইভাবে উষ্ণ ব্যবহার করেছেন তার প্রতি। কিন্তু বড়রানী প্রথম পরিচিত হওয়ার দিনে বোধহয় তাকে সহ্য করতে পারেননি। দ্বিতীয় রানীব ব্যবহার খুব ভাল। তবু কাঞ্চনমালা অনুভব করেছিল প্রাসাদে আর যাতায়াত না করাই ভাল। তবে রাজমাতা ডেকে পাঠাতেন কালেভদ্রে। তাঁর মৃত্যুর পরে তাও ঘুচল। ভালই হল। তাঁর মৃত্যুর দিনে সে প্রাসাদে গিয়েছিল। মহারাজা তাকে বলেছিলেন—মায়ের স্থান পূর্ণ হয় না কাঞ্চন। তুমি যদি সত্যই আমাকে ভ্রাতা বলে গণ্য কর, তাহলে তুমিও মাতৃহারা হলে। আজ তোমারও শোকের দিন।

কাঞ্চনমালা মহারাজের সামনে কেঁদে ফেলেছিল। সে বলেছিল—আমি বলে বোঝাতে পারব না মহারাজ। আমি শোকপালন করব নিষ্ঠাভরে।

—তোমায় এই কথা আমাকে যথেষ্ট সান্ত্বনা দিল।

সেইদিন রাজপুরীতে শেষবারের মত গিয়েছিল কাঞ্চনমালা।

স্নানরতা অবস্থায় এই সব চিন্তা করছিল সে। আরও কত সহস্র চিন্তা তার মাথায়। সে স্থান কাল সব কিছু বিস্মৃত হয়েছিল। সেই সময় সহসা ঠিক তার পশ্চাতে চাপা আর্তস্বর শুনে সে পেছনে ফিরে দেখে জলের কিনারায় একজন রমণী বসে পড়েছেন একটি পা হাত দিয়ে চেপে ধরে এবং তাঁর পেছনে একজন পুরুষ ঝুঁকে দেখছেন। দেখেই চিনতে পারে দুজনকে। খনা ও মিহির।

সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জল থেকে উঠে ছুটে যায় তাঁদের কাছে।

—কী হয়েছে মা?

—মনে হয় ভাঙা মাটির পাত্রের কানা বিঁধেছে পায়ে।

কাঞ্চনমালা ভাবে সে কি হাত দিয়ে খনাকে সাহায্য করবে? তিনি কিছু ভাববেন না তো!

সে বলে—আমি আপনাকে ধরব মা?

—তুমি তো কাঞ্চনমালা।

—হ্যাঁ।

—ধর।

কাঞ্চনমালা বিগলিত হয়। সে সযত্নে তাঁকে একটি ভাল জায়গায় বসায়। তারপর তাঁর পায়ে হাত দিয়ে দেখতে থাকে। সেই সময় মিহির এগিয়ে এসে খনার পায়ে হাত দিতে গেলে তিনি বলে ওঠেন—তুমি হাত দিচ্ছ কেন? আমি আর কাঞ্চন দেখছি।

মিহির সরে যান। কাঞ্চনমালা দেখে আঘাত সামান্য। রক্তপাতও হয়নি বলতে গেলে। সে আশ্বস্ত হয়। বলে— তেমন লাগেনি। মহাবাজের নির্দেশ আছে এসব যেন পথে বা

নদীতে ফেলা না হয়। তবু মানুষ পূজা দিতে এসে লুকিয়ে ফেলে।

—সবাই কি সমান হয়? তুমি এত ভোরে স্নান কর?

—হ্যাঁ।

—ভয় করে না?

—আগে করত। এখন আর করে না।

—হঠাৎ এত সাহস পেলে কী করে?

—জানি না।

—এত ভোরে না এসে একটু পরে এসো এবার থেকে। অনেক পশু মানুষের রূপ ধরে ঘুরে বেড়ায়।

—আমার সখীও অনেকবার একথা বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে তার স্বামীর কাছেও বলেছে নাকি।

—তাহলে তুমি খুব অবাধ্য মেয়ে বলতে হবে।

কাঞ্চনমালা হাসে। খনা নদীতে নামেন। কাঞ্চনও আবার নেমে কয়েকটা ডুব দেয়। তারপর উঠে আসে। মিহির একা পাড়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কাঞ্চনমালাকে কাছে ডাকেন। কাঞ্চন তাঁর দিকে এগিয়ে যায়।

—মুখ তোলো তো কাঞ্চন?

কাঞ্চনমালা মুখ তোলে। মিহির সেই মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কাঞ্চন তাকিয়ে থাকতে পারে না। তার মনে হয় উনি তার অন্তরের সব কিছু দেখে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে খনাও এসে দাঁড়িয়েছেন।

মিহির বলেন—কাঞ্চন, তুমি এখনি রাজধানী ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাও।

খনা প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন— সেকি! কোথায় যাবে?

—তা তো জানি না। কিন্তু ওর যাওয়া প্রয়োজন। খুবই প্রয়োজন।

—কেন?

—নইলে ওর চরম বিপদ অতি-আসন্ন।

—কি বিপদ।

—মৃত্যু।

খনা বলে ওঠেন—এই সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে উষালগ্নে অস্পষ্ট আলোয় তুমি ঠিক দেখেছ তো?

—হ্যাঁ, শুধু ওর বিপদ নয়। আমি ওর মাধ্যমে আরও দেখেছি এই চন্দ্রকেতুগড়েও দুঃসময় দ্রুত ঘনিয়ে আসছে।

—কী সব বলছ? ও একা অল্পবয়সী এক নারী। আত্মীয়-পরিজন বলতে কেউ নেই তা তো জান। তবু এভাবে ওকে ভীত করে তুলছ কেন?

—আমি ভীত করার কে? নিয়তির বিধান অমোঘ। কোন কিছু বিচার-বিবেচনার ধার ধারে না।

—ওকে আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি সেখানে বিষ্ণুমন্দিরে বসে ভালভাবে সব কিছু গণনা করে তারপর বল।

—ঠিক আছে, চলুক আমাদের সঙ্গে।

কাঞ্চনমালা দৃঢ়ভাবে বলে—না, আমি যাব না। আমার ললাটে বিধাতা যা লিখেছেন

তাই ঘটুক। তার জন্য আমি পালাব না।

মিহির বেদনার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—কাঞ্চন, আমার কথা শোনো। মৃত্যুই শুধু নয়।

—না হোক, আমি আমার কুটিরে থাকব।

—আমার ওখানে কয়েকদিন অন্তত থাক।

—কুটিরে আমার দেবতা রয়েছেন। তাঁকে রাতে একা ফেলে রেখে আমি বাইরে থাকব না।

খনা বোঝাতে চেষ্টা করেন নানা কথা বলে। কিন্তু তিনিও কাঞ্চনমালাকে সম্মত করতে সক্ষম হন না।

শেষে মিহির একটু আক্ষেপের স্বরেই বলে ওঠেন—থাকো তাহলে। কপালের লিখন কে খণ্ডাবে?

কাঞ্চনমালা তার কুটিরের সামনে এসে যায়। সেখানে সে ওঁদের বিদায় দেয়। তার মন বিষণ্ণ। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে খনাকে বলে—বাড়ি গিয়ে আপনার পায়ে ঔষধ দেবেন।

মিহির একটু দাঁড়ান। দু'পা কাঞ্চনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলেন—আমি তোমাকে পালাতে বলিনি। শুধু আজকের দিন আর রাতটা আমার ওখানে গিয়ে থাকো।

মিহিরের মত ব্যক্তির অনুরোধ অস্বীকার করা ধৃষ্টতা। অথচ সে স্থির করেছে কিছুতে যাবে না। সে কোনরকমে তাঁকে বলে—আপনি আমার প্রণম্য। আপনি জগদ্‌বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তি। আর আমি সাধারণ মানুষের চেয়েও নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব। তবু আমি অপারগ। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার গৃহদেবতাকে ছেড়ে অন্য কোথাও থাকতে আমি অভ্যস্ত নই।

—তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারি না। আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। তোমার আসন্ন ভবিষ্যতের কথা তোমাকে জানিয়েছি। তারপরেই তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছ। আমি তো জোর করতে পারি না। তবে একটা কথা বলে দি, তেমন মুহূর্ত কখনো যদি আসে তাহলে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে। ছুরিকা আছে? কিংবা বিষ?

খনা বলে ওঠে—এসব কি বলছ? নদীতে স্নান করতে কখনো আসি না। আজ ইচ্ছা হল বলে হঠাৎ এলাম। আর তুমি এই ব্রাহ্মমুহূর্ত থেকে কি শোনাচ্ছ?

—তুমি আসোনি খনা। তোমাকে আনা হয়েছে। তোমার সঙ্গী হয়ে আমাকেও আসতে হয়েছে। আর সেই একই মুহূর্তে কাঞ্চনমালা স্নানরতা ছিল। আমরা ক্রীড়নক মাত্র।

পথ চলতে চলতে খনা প্রশ্ন করেন—কী দেখেছ তুমি?

পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্বেই ওর মৃত্যু। আর সেই মৃত্যু স্বাভাবিক হবে না।

—ওকি আত্মহত্যা করবে?

—না না, ওকে হত্যা করা হবে।

—এমন কে ওর শত্রু থাকতে পারে যে ওকে হত্যা করবে?

—বুঝতে পারিনি। তবে সে একজন পুরুষ। এর বেশি বলতে পারব না।

খনা মিহিরের বিদায়ের পরে বিক্ষিপ্ত মন নিয়ে কাঞ্চন পুষ্পচয়ন করল, দেবতাকে পূজা দিল। মনে মনে বলল—জীবনকে আর উপভোগ করার স্পৃহা আমার তেমন নেই। তবু এত তাড়াতাড়ি মরতে ইচ্ছা হয় না। মহারাজের সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে কয়েকমাস পরে তাঁর রূপসী রাণীর গর্ভে। সেই শিশুর মুখদর্শনের বড় আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বিগত যৌবনা হয়ে বাঁচতে চাই না একথাও সত্য। কারণ আমার কোন মূল্য থাকবে না তখন। আমার

নৃত্যকুশলতা অন্তর্হিত হবে। আমি ভালভাবে জানি, মানুষকে মুগ্ধ করতে হলে নৃত্যকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও প্রয়োজন। একজন রূপহীনা নারী যতবড় নৃত্য পটিয়সী হোক না কেন, তার নৃত্যে ষোলকলা পূর্ণ হয় না।

দেবতার সামনে এসে বসে কাঞ্চনমালা। তার দেহে স্বল্প বাস। এই সময়ে কুটিরে কারও আসার সম্ভাবনা থাকে না বলে এভাবে থাকতে অসুবিধা নেই। একটু পরেই কাজের স্ত্রীলোকটি আসবে।

এমন সময় দ্বার খুলে গেল। চমকে উঠে বস্ত্রাঞ্চল টেনে নেওয়ার চেষ্টা করতে উর্বশীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—তুই ভয় পেয়েছিস তাই না?

—পাব না? কি অবস্থায় আছি দেখতে পাচ্ছিস। এই সময়ে কখনো তো আসিস না।

সেই সময়ে উর্বশীর পেছনে শিশু ক্রোড়ে একজন পুরুষ এসে দাঁড়ায়।

উর্বশী বলে—কাকে নিয়ে এসেছি দেখ।

সখীর চিন্তাহীন কর্মে কাঞ্চনমালা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়। তার চেয়েও সে হয় লজ্জিত। কি করবে ভেবে পায় না! দিনটা খুব বিশ্রীভাবে শুরু হয়েছে।

উর্বশী তাড়াতাড়ি পেছনে ফিরে বলে ওঠে—দাঁড়িয়ে দেখছ কি? একটু বাইরে যাও। এখনি হয়ে যাবে।

পুরুষটি থতমত খায়।

—কী হল? যাও।

উর্বশীর স্বামী ভালমানুষ দ্বিজন্ম তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়।

কাঞ্চনমালা উঠে গিয়ে একটি পরিধেয় বস্ত্র পরে নিয়ে বলে—এই তোর আসার সময় হল? জীবনে তুই একাও তো কখনো এসময়ে আসিস না।

—আমি অত ভাবিনি। ও আজ দূরে চলে যাবে। গতকাল বলল, তোর সঙ্গে এবারেও পরিচয় হল না। আমার কাছে তোর রূপ আর গুণের কথা তো প্রত্যেকবারই শোনে। গতবার বাণিজ্য করতে কৌশাম্বীতে গিয়েছিল নদীপথে। সেখানকার রাজার আমন্ত্রণে ও আর ওর বন্ধু রাজনর্তকীর নাচ দেখেছিল। তার রূপ দেখে ও সেই বন্ধুকে বলেছিল, নর্তকীর এত রূপ থাকে সে জানত না। উত্তরে ওর বন্ধু বাঁকা মুখে বলেছিল, আমাদের কাঞ্চনমালার পায়ের যোগ্যও নয়।

— তোর স্বামী এসব দেখে জানতাম না তো।

—এমনিতে দেখে না। তবে রাজা কিংবা ধনী মানুষেরা ডাকলে যেতে হয়। নইলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। কনকধ্বজও ওকে একথা বলেছে।

—উন্নতি হয়েছে তাহলে।

—তা বলতে পারিস। প্রথমে তো মুখ-চোরা ছিল। ওকে এবার ডাকব?

কাঞ্চনমালা একটু দ্বিধাভরে বলে—নারে, যেভাবে আমাকে দেখে ফেলেছে তার পরে তোর স্বামীর সামনে আজ আমি সহজ হতে পারব না। কাল নিয়ে আয়।

—আজই তো চলে যাবে বিকেলে।

—তাহলে পরের বার পরিচয় হবে।

—ভরতকেও দেখবি না?

—ওকে দুদিন পরে আনিস। আমি একটু সহজ হই।

—তুই বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস। ও ভাববে তুই ওকে অপমান করছিস।

—আমি তোর সখী। বুঝিয়ে বলিস। ঠিক বুঝতে পারবে।

—মহারাজা কিন্তু ওকে পছন্দ করেন।

—তাই কি?

—না, সেই কথাই বলছিলাম। ওর সুনাম আছে।

—সে কথা তো জানি। তুই সুখী বলে আমারও আনন্দ হয়।

—বড় মুখ করে এনেছিলাম। এভাবে ফিরিয়ে দিস্‌না।

—তুই আমার কথা একটু বুঝতে চেষ্টা কর। আমার কথাও ভাব। আজ আমি কিছুতে ওর সামনে যেতে পারব না।

উর্বশী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—নটী হয়েও তোর এত লজ্জা? বিশ্বাস করতে হবে?

কথাটা শুনে কাঞ্চনমালার মনে প্রবল ঝাঁকি লাগে। স্বামী-গর্বে গরবিনী সখী উন্মত্তের মত আচরণ করছে। ওকে এখন বুঝিয়ে লাভ নেই। পরে সব বুঝবে। তাই সে নীরব থাকে। অতি প্রত্যুষে মিহিরের ভবিষ্যদ্‌বাণী, তার পরে আবার এই ঘটনা, নিজেকে অভিশপ্ত বলে মনে হয় কাঞ্চনমালার। সে উর্বশীকে ছেড়ে মনকে শান্ত করার জন্য দেবতার সামনে গিয়ে বসে পড়ে। কথা বলারও ইচ্ছা চলে যায়। পৃথিবীতে তার একমাত্র আশ্রয়স্থল এই দেবতা। আর একজনও রয়েছেন। কিন্তু তিনি মনুষ্যরূপী দেবতা। তাঁর কাছে গিয়ে নিজের জন্য কিছু বলতে সঙ্কোচ হয়।

কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পরে চোখ মেলে চেয়ে দেখে তার কাজের স্ত্রীলোকটি এসে এটা ওটা করছে। উর্বশী চলে গিয়েছে। কাজের লোকটির দুর্ভাগ্য তার জিহ্বা অসাড়। কৈশোরে কোন অসুখ হয়েছিল। তারপর থেকে ঠিকভাবে জিভ নাড়াচাড়া করতে পারে না। কথা বলতে গেলে অদ্ভুত স্বর বের হয় শুধু। প্রথম যেদিন বুঝল যে সে বোবা হয়ে গিয়েছে। সেদিন থেকে ক্রমাগত পনেরো দিন শুধু কেঁদেছে। কত চেষ্টা করছে জিভকে স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া করার। পারেনি। শেষে সামলে নিয়েছে নিজেকে। বুঝে গিয়েছিল, তার মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন কেউ তার কিছু করতে পারবে না। বোবা মেয়ের বিবাহ হয় না। হলেও দাসীবৃত্তি করানোর জন্য কোন বৃদ্ধ বিবাহ করতে পারে। সে বুঝে গিয়েছিল নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সেই ভাবেই চলছে সে। মা বাবা মরে গিয়েছে। আপন বলতে কেউ নেই। সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে শুধু একটা কলাগাছের ক্ষেত। বছরের উৎপাদন, আর কাঞ্চনের সাহায্যে তার দিন ভালভাবেই চলে যায়।

কাঞ্চনমালা তাকে ডাকলে সে কাছে এসে দাঁড়ায়। কাঞ্চনমালা তাকে বলে—চিন্তামণি, আজ তুমি আর বাড়িতে যেও না। কাল কাজের পরে বিকেলে যেও। আজ আমার কাছেই থাক।

চিন্তামণি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জানতে চায়, হঠাৎ থাকতে হবে কেন?

কাঞ্চন একটু দ্বিধাভরে বলে—আজ আমার ভয় করছে। দিনটা ভাল যাচ্ছে না।

চিন্তামণির মুখ বিষাদে ভরে ওঠে। সে জানায়—দুদিন পর সে থাকতে পারবে। আজ আর কাল পারবে না। তার দূর সম্পর্কের এক ভাই তার বউকে নিয়ে এসেছে বাঁশপোতা থেকে।

—তবে থাক।

চিন্তামণি ইঙ্গিতে উর্বশীর থাকার কথা বলে। কাঞ্চনমালা বলে—ও কী করে থাকবে?

ওর স্বামী আজ বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাছাড়া ওর ছেলে রয়েছে।

—ব্যবস্থা করে নিক।

— তোমার আর ভাবতে হবে না।

চিন্তামণি তখন মহারাজকে বলতে বলে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

চিন্তামণি যতই সঙ্কেতে বলুক, কাঞ্চনমালার বুঝতে অসুবিধা হয় না।

—ঠিক আছে। তুমি তোমার কাজ কর।

একটু পরে চিন্তা এসে জানতে চায় আনাজ কিংবা অন্য কিছু আনতে হবে কিনা।

—না।

—কিছু তো নেই।

—ওতেই চলে যাবে।

চিন্তামণি পাশে মাটিতে বসে পড়ে বলে—তোমার কিসের ভয়? কখনো তো এমন কথা বলো না।

—এমনি মনে হয়েছিল। ওসব ভুলে যাও। চিরকাল একাই তো থাকি।

—আমার খুব খারাপ লাগছে। কখনো তো থাকতে বলো না।

—তোমার দোষ নেই। বাড়িতে আত্মীয় এলে কী করবে? আমার ভয় অহেতুক। শত হলেও নারী তো? একথা সেকথা মনে পড়ে যায়। তোমার এমন হতো না?

চিন্তামণি ঘাড় কাত করে বলে—হতো। কিছুদিন আগেও হতো। এখনো হয় মাঝে মাঝে।

কাঞ্চনমালা কদিন আগে চিন্তামণিকে সামনে বসিয়ে নানা প্রশ্ন করে গণনা করে দেখেছে যে ওর বয়স এখন চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তার চেয়ে অন্তত এগারো বছরের বড়।

সেদিন চিন্তামণি সন্ধ্যার অনেক পরে বাড়িতে গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেল। যেতে না হলে যেন শান্তি পেত। কাঞ্চনমালা একা বসে থাকে। মহারাজা নিজের হাতে তাকে দেবী শ্রীর ফলক দিয়েছিলেন। প্রদীপের আলোয় একা একা বসে সেটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। ফলকে মহারাজের স্পর্শ রয়েছে। সে ফলকটি গালে স্পর্শ করে। শ্রী হলো ধন সম্পদের দেবী। মহারাজা বলেছিলেন তোমার মত সম্পদশালী আর কে? তোমার শিল্পই তোমার সম্পদ। মাতা অম্বিকা দেবীর সামনে মহারাজা ওটি দিয়েছিলেন। প্রদীপটি নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে দেখে একটু তেল ঢেলে সেটিকে উস্‌কে দিয়ে ফলকটি আবার দেখতে থাকে। অন্যদিন এসময়ে কি করে তার মনে পড়ে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল মিহিরের কথা। তেমন সময় হলে অন্তত আত্মহত্যা করতে হবে। হ্যাঁ, একথা সে বহুদিন থেকেই ভেবে রেখেছে একাকী কুটিরে থাকে বলে। ছুরিকা আছে। রাত্রে নৃত্যের প্রতিটি আসরেই সঙ্গে করে নিয়ে যায়। আজ সেটিকে বাড়িতে থেকেও নিজের সঙ্গে রাখতে হবে। ওটিকে কত নিপুণভাবে ব্যবহার করা যায় সে বারবার অভ্যাস করেছে। তার মা মৃত্যুর পূর্বে তাকে দিয়েছিল। কঠোর মুখে বলেছিল সে একবার ব্যবহার করেছে। ব্যর্থ হয়নি। তাম্রের হাতল যুক্ত লোহার ছুরিকা। সে ছুরিকাটি নিয়ে এসে তার দেহের অভ্যস্ত স্থানে গুঁজে রাখে।

আরও রাত হলে সামান্য ফলাহার করে একটু গুড় মুখে দিয়ে জলপান করে শুয়ে পড়ে।

সেই রাতে মধ্যরাতের পূর্বে খনা মিহিরকে প্রশ্ন করেন—আজ রাতের কথাই বলেছিলে? নাকি আগামী কালের রাত?

—আজ রাতের কথা বলেছিলাম।

—তাহলে?

—তাহলে কী?

—আমি শান্তি পাচ্ছি না। তুমি আবার বললে চন্দ্রকেতুগড়েরও ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।

—অবশ্যই। এখন মনে হচ্ছে কাঞ্চনমালাকে দিয়ে বোধহয় শুরু।

—কীভাবে?

—হয় মড়ক কিংবা প্লাবন। অথবা ভূকম্প। আমি জানি না।

—কাঞ্চনমালার বিষয়টা মহারাজকে বললে না তো?

—গণনায় যদি ভ্রান্তি থাকে? আমি বিধাতা পুরুষ নই খনা। মহারাজা আমাকে যতই বিশ্বাস করুন গণনার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখতে পারতেন না হয়ত।

—তবু বলতে পারতে।

—এখন সেকথাই মনে হচ্ছে। আরও মনে হচ্ছে মহারাজা কেন, আমরা দুজনেই গিয়ে ওখানে থাকতে পারতাম। গণনা ভুল হলেও ক্ষতি ছিল না। তুমি সম্মত হতে?

—অবশ্যই।

—চল।

খনা সঙ্গে সঙ্গে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

ওঁরা দুজনা বাইরে আসেন। পথ চন্দ্রালোকিত। সুষুপ্ত নগরী। চাঁদের আলো গাছের পাতা চুইয়ে নীচে পড়ে অস্পষ্ট আলপনা এঁকে রেখেছে।

মিহির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—গণনার ভুলে আমাদের উজ্জয়িনী ত্যাগ করতে হয়েছিল চিরকালের জন্য।

খনা বলেন— সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। বরং আনন্দিত।

—আমিও তোমার দলে। তবে বৃদ্ধ পিতাকে ত্যাগ করতে হল তাঁর শেষ বয়সে।

—আমার জিহ্বা কর্তন করে পিতার কাছে থাকতে পারতে?

—ও কথা থাক। আমার আজকের গণনা যদি ভ্রান্ত হয়, তাহলে খুব আনন্দ হবে আমার।

—আমারও। কিন্তু তোমার গণনায়, তোমার চেয়ে আমার বিশ্বাস একটু বেশি।

—তাহলে সেই গাভীর বৎসতরী প্রসবের সময় আমি যখন আমার অমূল্য পুঁথিপত্র বিসর্জন দিলাম তখন বাধা দিলে না কেন?

—তখন আমি কিশোরী ছিলাম। স্বামীকে যে সুপরামর্শ দেওয়া যায় সেই জ্ঞান ছিল না। স্বামী স্বর্গের দেবতা নন, মানুষ-রূপী দেবতা এই জ্ঞান পরে হয়েছে। সেদিন সেই ঘটনার পরমুহূর্ত থেকেই আমার অনুশোচনা শুরু হয়েছিল।

দুজনে কিছুক্ষণ পরে কাঞ্চনমালার কুটিরের সামনে আসেন। আঙিনার চতুর্দিক পুষ্প বৃক্ষের বেষ্টনী দ্বারা আড়াল করা। বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না। ওঁরা আঙিনায় প্রবেশ করেন।

একেবারে সামনে আসতে খনা অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন। মিহির তাড়াতাড়ি এসে দেখেন কাঞ্চনমালার কুটিরের দ্বার উদঘাটিত। তাঁরা উভয়ে তাড়াতাড়ি গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নেই! কাঞ্চনমালা সেখানে নেই। তার শয্যা শূন্য।

ওঁরা ত্রস্তপদে বাইরে আসেন।

মিহির বলেন—এত শীঘ্র ঘটে গেল নাকি কিছু?

খনা বলে ওঠেন—এখন?

—চল প্রথমে নদীর তীরে খুঁজি।

নদীর তীরে কিছুই দেখা যায় না। তারপর উভয়ে ঘাটের দিকে যান। খনার পায়ে গতকাল ভোরে যেখানে ভাঙা মৃৎপাত্রের আঘাত লেগেছিল সেখানে দেখতে পান তাঁরা। সেখানে কাঞ্চনমালা পড়ে রয়েছে, প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায়। আর দুপা এগোলেই নদীর জল স্পর্শ করত। খনা কেঁদে ওঠেন। কাঞ্চনমালার অনাবৃত দেহ দেখে তিনি সইতে পারেন না। তাড়াতাড়ি তার পরিধেয় বস্ত্র টেনে নিয়ে তার দেহ ঢেকে দিতে পাশে বসে পড়েন। তখন লক্ষ্য করেন তার বক্ষ অক্ষত নয়। মুখেরও একপাশে কয়েকটি রক্তচিহ্ন। চাঁদের আলোয় ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও অনুমান করেন দংশনের আঘাত। তবে বেশী নয়। একটি বা দুটি। আর তার ডানহাতের নীচে দেখা যায় একটি ছুরিকার প্রান্তভাগ। তিনি অতি মমতায় কাঞ্চনমালার হাত আস্তে সরিয়ে দেখেন সেটি রক্তাক্ত। তবে কি সে নিজেকে লাঞ্ছনা আর অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে আত্মহত্যা করল? তাঁর স্বামী তো তেমন কথাই বলেছিলেন গতকাল শেষ বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে।

—শুনছ, কাঞ্চনমালা কথা রেখেছে। সে বোধহয় আত্মহত্যা করেছে। যে পশু তাকে আঁচড়েছে কামড়েছে সে জীবিত কাঞ্চনমালাকে পায়নি।

মিহিরও ঝুঁকে পড়েন। তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে কাঞ্চনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তারপর সব দেখে বলেন—কিন্তু ওর বক্ষে তো কোন ছুরিকাঘাত নেই। ও অক্ষত রয়েছে। এখুনি রাজপুরীতে সংবাদ পাঠাতে হবে। এভাবে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। একজনকে এর কাছে থাকতেই হবে। শৃগাল কুকুর আসতে পারে। তোমাকে একা রেখে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

—দূরে ওই কুটিরে গিয়ে বললে হয় না? কাঞ্চনমালাকে কে না চেনে? ওরা তো প্রতিবেশী। সংবাদ পেলে তারা সঙ্গে সঙ্গে অনেককে ডেকে নিয়ে আসবে। প্রাসাদে সংবাদ পাঠাতে লোকের অভাব হবে না।

মিহির বলে—তাই যাই।

তিনি উঠে দাঁড়াতেই অদূরে একটা কিছু পড়ে থাকতে দেখে বলে ওঠেন—ওখানে কি পড়ে রয়েছে?

—কোথায়?

মিহির সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলেন—ওই তো।

খনা উঠে আসেন। তাঁরা আর একটি মৃতদেহের সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এটি পুরুষের। তার হৃদপিণ্ডের কাছে গভীর ক্ষত। সেই ক্ষত দিয়ে রক্তধারা বেরিয়ে বালিমাটিতে জমাট বেঁধে রয়েছে।

খনা উন্মাদিনীর মত চেঁচিয়ে ওঠেন—কাঞ্চন প্রতিশোধ নিয়েছে। তুমি ওকে বলেছিলে আত্মহত্যা করতে। ও তো দুর্বল নয়। আত্মহত্যা করে দুর্বলেরা। এই নরপশুকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে।

নদীর তীরে রজনীর তৃতীয় প্রহরে খনার কণ্ঠস্বর থরথর করে কেঁপে ওঠে আবেগে আনন্দে।

মিহির গিয়ে প্রথম কুটিরে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে জ্যোৎস্নার অস্বচ্ছ আলোয় দল বেঁধে ছুটে আসে স্ত্রী ও পুরুষ।

কাঞ্চনমালার প্রাণহীন দেহের অদূরে এসে তারা থেমে যায়। স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেকে সিক্ত তীরভূমির ওপর বসে কান্নায় ভেঙে পড়ে। পুরুষেরা মূক। সবাই জানত নটী কাঞ্চনমালা সাধারণ শ্রেণীর নারী নয়। তার জন্য চন্দ্রকেতুগড়ের সবার মনে গর্ব ছিল। সেই গর্বের বস্তুটির এহেন পরিণতিতে তাদের হৃদয়ে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেই শূন্যতা তাদের পীড়া দেয়। মিহির তাদের বলেছিলেন, কাঞ্চনমালা অপরাধীকে নিজের হাতে শাস্তি দিয়েছে। তাই তাদের মনে প্রতিহিংসার রোষানল সেভাবে প্রজ্জলিত হতে পারল না। কিন্তু তারা চাপা ক্রোধ নিয়ে এগিয়ে গেল দ্বিতীয় দেহটির দিকে। কেউ চিনতে পারে না। মুখ থুবড়ে পড়েছে বলে মুখটা বালিমাটির মধ্যে ঢুকে রয়েছে। ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তাই নানাভাবে দেখার চেষ্টা করে। মুখ দেখলে হয়ত কেউ চিনতে পারবে। অথচ স্পর্শ করতে চায় না কেউ।

মিহির বলেন—আমি মুখ ঘুরিয়ে দেব?

সবাই সায় দেয়।

মৃতদেহ চিৎ করে দেওয়া খুব সহজ নয়। তবু বলিষ্ঠ মিহির সহজেই সেটি করেন। এতক্ষণে দেহটিকে ধরে তিনি বুঝতে পারেন এই ঘটনা তাঁরা দুজনে এখানে আসার সামান্য পূর্বে ঘটেছে। কারণ দেহ এখনো আড়ষ্ট হয়ে যায়নি। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকেন তিনি। সমস্ত ঘটনার জন্য তিনি মনে মনে নিজেকে সর্বাংশে দায়ী করেন। মহারাজকে বলতে পারতেন তাঁর গণনার কথা। বলতে পারতেন গণনা মিথ্যা হতে পারে। তবু তাঁর মনে সংশয় জেগেছে বলে, তিনি অনুরোধ করছেন রাতের জন্য কুটিরের পাশে প্রহরার ব্যবস্থা করতে। মহারাজা অবশ্যই সম্মত হতেন।

একজন যুবতী আর্তস্বরে বলে ওঠে—একি! এযে উর্বশীর স্বামী দ্বিজন্ম। এতো খুব ভালমানুষ। এ কেন এই কাজ করতে যাবে?

একজন বৃদ্ধ বলে ওঠে—মানুষের মন। পাল্‌টাতে সময় লাগে না। দুর্জন সাধু হতে না পারলেও, সাধুর দুর্জন হতে বেশি বিলম্ব হয় না।

আর একজন মন্তব্য করে—বিদেশে কত প্রলোভন। বিদেশী পোত এলে শ্বেতকায়রা কোন্ পাড়ায় যায়, সবাই দেখে।

রাজপুরীতে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা হয়।

মহারাজ চন্দ্রকেতু শোকসন্তপ্ত। তাঁর বিবেকের কোথায় যেন দংশনের জ্বালা। সম্প্রতি তিনি কাঞ্চনমালার প্রতি অমনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পরে তাকে দেখেনও নি। অথচ সে মায়ের কত প্রিয় ছিল। তারও কি নয়? তার হৃদয়ের এক নিভৃত কোণে সঙ্গোপনে তার জন্য একটু স্থান দিয়ে ফেলেছিলেন একথা তো তিনি অস্বীকার করতে পারে না। আজ তাই তার এই বীভৎস মৃত্যুতে তিনি এত বিচলিত। রাজধানীও শোকাভিভূত। কাঞ্চনমালা সবার অজ্ঞাতে তাদের গর্বের বস্তু হয়ে উঠেছিল। আজ সেদিক শূন্য হয়ে গেল। অখ্যাত দ্বিজন্ম সহসা বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়ে সবার পরিচিত হয়ে উঠছিল। উর্বশীর ভাগ্য দেখে অনেক নারী রীতিমত ঈর্ষাবোধ করতে শুরু করেছিল। তাদের এখন পাগলিনী উর্বশীকে দেখে বুক ফেটে যায়। তার পুত্র ভরত এখন চরম অবহেলিত। উর্বশীর বৃদ্ধ মাতাপিতা কতটুকু দেখবে? লজ্জায় তারা নিজেদের গৃহবন্দী করে রাখে।

মিহির বিমর্ষ কণ্ঠে খনাকে বলেন—এখন তো সবে শুরু হল। আরও অনেক কিছু ঘটবে। তুমি লেখাজোকা না করলেও ছক দেখে তো বুঝতে পার।

—পারি। নইলে গুনব কী করে?

মিহির চন্দ্রকেতুগড়ের ওপর গ্রহনক্ষত্রের কিরকম প্রভাব পড়েছে, তার একটা ছক তৈরি করেছিলেন। সেটিকে তখন খনার দিকে এগিয়ে দেন।

খনা এক ঝলক দেখেই চমকে ওঠেন। বলেন—একি! এই বিপদ থেকে যে রাজপরিবারেরও পরিত্রাণ নেই। কারও নেই। আমাদেরও।

—হ্যাঁ। শুধু মড়ক নয়, অন্য পরিবর্তনও ঘটে চলেছে।

—কিসের পরিবর্তন?

—নদীর গতিপথের। গঙ্গার মূলপ্রবাহ থেকে বিদ্যাধরী ক্রমশ বঞ্চিত হচ্ছে। বিধ্যাধরীর সঙ্গে তার আগের মাখামাখি আর নেই। বর্ষাকালেও কদাচিৎ। আমরা প্রথম এসে নদীর মাঝখানে যে ক্ষুদ্র চর দেখতাম তার আয়তন ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই নদীর ভবিষ্যৎ ভয়াবহ। জানি না এইভাবে চলবে কি না। যদি চলে তাহলে বিদ্যাধরী বিশুষ্ক হয়ে যাবে। তবে আমাকে আর একবার সব কিছু ভালভাবে দেখতে হবে। আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যাতে আমার গণনা ভ্রান্ত হয়।

খনা দৃঢ় কণ্ঠে বলেন—হবে না। সবই ফলবে।

—হ্যাঁ। তবু আমাদের নীরব থাকতে হবে। এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা সাধারণ মানুষ জানতে পারলে তারা সইতে পারবে না। তাদের কাজকর্ম সব বন্ধ হয়ে যাবে। মাঠে চাষ হবে না। শালিধানের ক্ষেত খাঁ-খাঁ করবে। নদীতে জাল পড়বে না। কলাগাছ লাগানো বন্ধ হবে। কলা ফলবে না।

—হ্যাঁ। কাঞ্চনমালা যেন ছিল চন্দ্রকেতুগড়ের শ্রীদেবী।

মিহির চমকে উঠে বলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। কী বললে? কাঞ্চনমালা ছিল চন্দ্রকেতুগড়ের দেবী শ্রী?

—নিশ্চয়। এতে চমকে ওঠার কি হল?

—বল্লভ তাহলে মিথ্যা বলেনি? সে শিল্পীর মন দিয়ে সঠিক অনুমান করেছিল?

—বল্লভ আবার কী বলল?

—আমি কাঞ্চনমালার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ওর পুতুল ঘরে গিয়েছিলাম। ও আগ্রহভরে আমাকে একটি বড় প্রতিমা দেখিয়ে বলেছিল সেটি শ্রীদেবীর প্রতিমা। আমাদের বিষ্ণুমন্দিরে স্থায়ীভাবে স্থাপন করার বড় সাধ তার। আমি মূর্তিটির মুখের দিকে চেয়েই রূঢ়স্বরে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তার প্রস্তাব।

খনা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন—বল্লভের মত মানুষের প্রতি রূঢ় ব্যবহার? তোমার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছিল? কী অপরাধ করেছিল সে?

—আমি তাকে বলেছিলাম, মানুষের প্রতিমা দেবালয়ে প্রতিষ্ঠা করার দুঃসাহস দেখান তার উচিত হয়নি।

—মানুষের প্রতিমা! ও যে তোমাকে বলল ওটি শ্রীদেবীর?

—কিন্তু মুখের আদল একেবারে কাঞ্চনমালার মত।

—ছি ছি। তুমি এতবড় আঘাত দিলে ওই সরল শিল্পীকে? তোমার কথা শুনে সে কী বলল?

—তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল, পৃথিবীর কোন নারীর মূর্তি সে গড়েনি। সে তার কল্পনায় ওটি গড়েছে তিল তিল করে। ওই মূর্তির মুখের ছাঁচও করে রাখেনি।

—সে অতি সত্য কথা বলেছে। চল আমরা দুজনা ওর কাছে গিয়ে মূর্তিটি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করি। নইলে আমি শান্তি পাব না। এখন মাঘ মাস চলছে। প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করার কোন অসুবিধা নেই।

—বৃষ্টি হচ্ছে যে।

—খুব ভাল লক্ষণ। যদি বর্ষে মকরে, ধান হয় ঠেকরে।

—তোমার ওই সব বচন আমি বুঝি না। এর মধ্যে এদেশের এত সব কথা শিখে গেলে কি করে?

—এদেশের কথা তো শুধু 'ঠেকরে'। তার মানে হল উচ্চভূমি। তুমি তো জান মাঘ মাসে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করে। তখন বৃষ্টি হলে উঁচু ক্ষেতেও ফসল ফলে।

—বুঝলাম। তুমি সত্যি যাবে?

—আশ্চর্য! কী করে ভাবলে যে আমি পরিহাস করছি?

—না, না, পরিহাস নয়। কিন্তু বল্লভের কাছে যেতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে।

—খুব স্বাভাবিক। সেইজন্য আমি যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।

ওঁরা উভয়ে বল্লভের আঙিনায় প্রবেশ করেন। বল্লভ তখন দাওয়ায় বসে অভিনিবেশ সহকারে একটি ফলক নির্মাণে ব্যস্ত ছিল। ওঁদের উপস্থিতি সে লক্ষ্য করেনি। খনা এগিয়ে গিয়ে দাওয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর ছায়া পড়তে বল্লভ কাজ বন্ধ করে দৃষ্টি ফেরায়। দুজনকে দেখে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

খনা বলেন—ব্যস্ত হয়েও না বল্লভ। এটি কী করছ?

বল্লভ ম্লান হেসে বলে—বৃষ মেষ ইত্যাদি রাশির একটি ফলক।

—সুন্দর হচ্ছে। তোমার কোন্ কাজই বা সুন্দর নয়?

বল্লভ মিহিরকে দেখিয়ে বলে—আমার সব কাজ সুন্দর নয়। উনি জানেন।

খনা দৃঢ়স্বরে বলেন—আমি বিশ্বাস করি না। শিল্পী কখনো ভ্রান্ত হয় না। পণ্ডিতেরা হলেও হতে পারে। আমার স্বামী মহাপণ্ডিত। তবু পৃথিবীর যে কোন পণ্ডিত ভুল করতে পারেন। কিন্তু তুমি ভুল করতে পার না। কারণ তোমার সৃষ্টি মস্তিষ্ক দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে।

মিহির—আচ্ছা বল্লভ, তুমি কাঞ্চনমালাকে দেখেছ কখনো।

—আজ নদীর তীরে ওঁকে শেষ দেখলাম। গুণবানও সঙ্গে ছিল। ওঁকে কখনো ভুলব না। মহৎ শিল্পী ছিলেন।

—সেদিন ছাড়া আগে কখনো ওকে স্বচক্ষে দেখেছ?

—একবার দেখেছিলাম। মহারাজের যখন প্রথম রানী এলেন, তখন রানীর সহোদর এখানকার নৃত্যকলা দেখতে চেয়েছিলেন। মহারাজা গুণবান আর আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আমাদের তো দেখার অভ্যাস নেই। গুণবান যাচ্ছে শুনে ভরসা পেয়েছিলাম। দুজনা পাশাপাশি বসে দেখলাম। নৃত্যের আমি কিছু বুঝি না। কিন্তু ভঙ্গি বুঝি, ছন্দ বুঝি। আমাদের দুজনার খুব ভাল লেগেছিল। মনে হচ্ছিল, উনি যেন দেবতার সামনে নৃত্যরতা। ওঁর চোখে মুখে এক স্বর্গীয় দ্যুতি দেখতে পেয়েছিলাম। আমাদের দুজনারই ইচ্ছা হয়েছিল ওঁকে প্রণাম করতে। ওঁর এভাবে মৃত্যু হল, আমাদের দুজনার মন খুব খারাপ। ওঁর বালিকা বয়সে ওঁকে আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু বাল্যকাল আর যৌবন তো এক নয়।

সেই সময় মিহির বলেন—বল্লভ, সেদিন আমার মাথা ঠিক ছিল না। তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলাম।

—আমার সঙ্গে? কবে?

—যেদিন আমাকে মূর্তিটি দিতে চেয়েছিলে।

—হ্যাঁ, সেদিন আমার দুঃখ হয়েছিল খুব। কিন্তু আপনি তো দুর্ব্যবহার করেন নি। আপনি সত্য কথা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। নিশ্চয় ওই প্রতিমাকে এই জগতের কোন নারীর মূর্তি বলে মনে হয়েছিল। আমি ওই প্রতিমায় দেবত্ব আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।

খনা বলে ওঠেন—না না বল্লভ, উনি ভুল করেছিলেন। তোমার গড়া প্রতিমা যথার্থ দেবী মূর্তি। সাক্ষাৎ শ্রী তিনি।

—আপনি তো দেখেন নি। উনি দেখেছেন।

—আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি।

বল্লভ বলে ওঠে—একি বলছেন! আপনারা কত মহান। আপনাদের জ্ঞানের সীমা পরিসীমা নেই। আপনাদের কথা দেশের ঘরে ঘরে। আপনাদের জন্য দেশ আজ খাদ্য শস্যে পরিপূর্ণ। আমি সামান্য একজন মানুষ। আপনারা আমাকে এভাবে বলবেন না। বিধাতার অভিশাপ বর্ষিত হবে আমার ওপর। আমি আর কখনো শ্রীদেবীর রূপ কল্পনা করব না।

খনা বলে ওঠেন—তুমি যা কল্পনা করেছ তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই বল্লভ। তোমার কল্পনা যথাযথ। আমি ওই প্রতিমা বিষ্ণু মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব বলে এসেছি। তুমি আমাদের ওটি দাও।

বল্লভ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

—দাও বল্লভ। তোমার প্রতিমার অমর্যাদা হতে আমরা দেব না।

ভাবলেশহীন কণ্ঠে বল্লভ বলে—সেটি নেই।

—নেই? কাকে দিলে?

—কাউকে নয়।

—তবে?

—বিদ্যাধরীতে বিসর্জন দিয়ে এসেছি গুণবানকে সঙ্গে নিয়ে।

বল্লভ উদ্গত আবেগ সংযত রাখতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠে। সে নিমীলিত চক্ষে অন্তরের মধ্যে শ্রীদেবীর সেই রূপ নিরীক্ষণ করে কিছুটা শান্ত হয়।

মিহির আর্তস্বরে বলে ওঠেন—আমার নিজের দোষ। আমি মহাপাতকী হলাম।

—না, না, তা হবেন কেন? সেই মুখ তো আমার অন্তরে আর অধরা নেই। আমার কল্পনা তো তাকে রূপ দিয়ে ফেলেছে। তবে আমি হয়ত প্রতিমা গড়ব না।

—না বল্লভ না। তাহলে আমার পাপের স্খলন হবে না।

—দেবী শ্রী আমার অন্তরেই রয়েছেন। ওঁকে আর প্রতিমার রূপ আমি দেব না।

খনা বলেন—কবে বিসর্জন দিলে?

—ওই তো সেদিন, যেদিন কাঞ্চনমালার দেহ নদীতীরে শায়িত ছিল। আমরা দুজনে বিসর্জন দেওয়ার সময় ভীড় দেখেছিলাম। সেখানে গিয়ে তাঁকে দেখলাম। মনে মনে প্রণাম করলাম। পুরুষ বলেই বোধহয় কাঁদতে পারলাম না।

মহারানীর প্রসব বেদনা শুরু হয়েছে শেষরাত্রি থেকে। বৈদ্য ধাত্রী পরিচারিকারা সবাই উপস্থিত। জাহ্নবী মহারানীর পার্শ্বে দণ্ডায়মান। বিমলা বাইরে রয়েছে। মহারাজা ঘন ঘন সংবাদ দিতে বলেছেন তাঁকে। তিনি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছেন। কাঞ্চনমালার মৃত্যুতে তিনি যেরকম অস্থির হয়েছিলেন আজকের অস্থিরতা সেরকম নয়। কাঞ্চনমালার সংবাদ

শোনার পর করার কিছু ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন নয়। তাই এই অস্থিরতার গুরুত্ব অনেক বেশি। পার্থক্যও রয়েছে। কাঞ্চনমালার গুরুত্ব যতই থাক। রক্তের সম্পর্ক নেই কোন। সবচেয়ে বড় কথা ভাবী শিশু যদি পুত্র হয়, তাহলে সে হবে এদেশের ভাবী অধীশ্বর। ভাবী সন্তানের জননী রূপে দেবযানীর প্রতি তাঁর অনুরাগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে সম্প্রতি। অবশ্য এখন তিনি বুঝতে পারেন অনুরাগ তাঁর বরাবরই ছিল।

রানী তীব্র যাতনা ভোগ করছেন, অথচ সন্তান ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। বেলা বাড়ছে। জাহ্নবী সখীর এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছে না। জননী হতে হলে প্রসব বেদনা সহ্য করতে হয় একথা তার জানা। তবে সেই বেদনা যে এত তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হয় এই ধারণা তার ছিল না। সে বুঝতে পারে দেবযানী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি রূপবতী হলেও স্বাস্থ্যবতী। সহজে দুর্বল হয়ে পড়ার কাঠামো তাঁর নয়। অথচ এখন তাঁর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে আসছে। একবার ইচ্ছা করে অদূরে উপবিষ্ট রাজবৈদ্যকে প্রশ্ন করে। কিন্তু তাঁর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে প্রশ্ন করতে সাহস হয় না। তবে কি দেবযানীর মৃত্যু হতে চলেছে?

কথাটা মনে হতেই অস্থির হয়ে সে বৈদ্যকে বলে ওঠে—রানী তো দুর্বল হয়ে পড়ছেন। উনি কি বাঁচবেন না?

—আমি জানি না।

—মহারাজকে তাহলে ডাকতে হয়। তিনি এসে দেখুন।

—বল।

মহারাজ দ্রুতপদে এলেন। মহারানীর শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর ডান হাত নিজের দু'হাতে তুলে নিয়ে ডাকলেন। মহারানী সামান্য একটু চোখ খোলার চেষ্টা করেন মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রবল যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যান।

মহারাজা হতাশ হয়ে থমথমে কণ্ঠে বলেন—আপনি কী মনে করেন?

—দুজনাকে একসঙ্গে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। কাকে বাঁচিয়ে রাখব? আমি দ্বিধায় আক্রান্ত। জানি না, পুত্র কি কন্যা। যদি পুত্র হয়? তাকে তো মারা যাবে না।

—আপনি এসব কি বলছেন? রানীকে বাঁচান। তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অদেখা পুত্রকে বাঁচাতে চাই না। আমি রানীর জীবন চাই।

সঙ্গে সঙ্গে রাজবৈদ্য ধাত্রীদ্বয় ব্যতীত সবাইকে কক্ষ থেকে বের করে দিলেন। মহারাজকে বিনীতভাবে বললেন—আপনাকেও যেতে হবে।

মহারাজা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে চলে গেলেন। জাহ্নবীকে বলে গেলেন, সংবাদ দিতে। শ্রদ্ধায় অবনত মস্তকে জাহ্নবী মাথা হেলায়।

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ। শুধু মহারানীর অতি দুর্বল বেদনার্ত স্বর মাঝে মাঝে ভেতর থেকে ভেসে আসে। এক সময় তাও স্তব্ধ হয়ে যায়। জাহ্নবী দুহাত দিয়ে নিজের কণ্ঠ চেপে ধরে থাকে। বাইরের বৃক্ষরাজির অজস্র পাতায় কোন স্পন্দন নেই। ধরিত্রী বায়ুহীন বলে মনে হতে থাকে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসার অবস্থা।

অনেকক্ষণ পরে রাজবৈদ্য বাইরে আসেন। তিনি নিশ্চয় অশ্রুবিসর্জন করেছেন। চক্ষুদ্বয়ে তার স্পষ্ট চিহ্ন। দেবযানী তাহলে নেই?

বিমলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—মহারানী নেই?

রাজবৈদ্য কক্ষের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে চলে যান মহারাজকে বলতে। সঙ্গে সঙ্গে জাহ্নবী আর বিমলা সবেগে কক্ষে প্রবেশ করে। তারা দেখে মহারানী শায়িত রয়েছেন

শয্যায়। চক্ষুদ্বয়, নিমীলিত। ধাত্রীদ্বয়, বড় বড় পাত্রে উষ্ণ জলে হস্ত প্রক্ষালন করছে। পাশে একটি বৃহৎ বস্ত্রখণ্ডে রক্তাক্ত কিছু জড়ানো রয়েছে।

জাহ্নবী জিজ্ঞাসা করে—শিশু?

ধাত্রীদের একজন বস্ত্রে জড়ানো বস্তুটির দিকে দেখিয়ে নিম্নস্বরে বলে—রাজবৈদ্য অত্যন্ত বিচলিত। শিশুটি পুত্র। ঠিক যেন দেবপুত্র। এমন শিশু পৃথিবীর জন্য নয়। তাই ফিরে গেল নিজের আলয়ে।

জাহ্নবী মহারাজের মন্তব্য শুনেছিল। তাই শিশুর জন্য খুবই দুঃখ হলেও, দেবযানী রক্ষা পেয়েছেন জেনে নিশ্চিত হল। অদেখা শিশুর মুখ সে আর দেখতে চাইল না। জানে সহ্য করতে পারবে না। বিমলা বারবার দেখতে চাইল, ধাত্রীরা অস্বীকার করল খণ্ডিত শিশুকে দেখাতে।

একটু পরে মহারাজা এলেন। সোজা রানীর পাশে গিয়ে দাঁড়ান। কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে একভাবে চেয়ে রইলেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য তাঁর বক্ষের উত্থানপতন লক্ষ্য করলেন। সন্তানের কথা একবারও জানতে চাইলেন না।

বেলা পড়ে এলে ছোটরানী ঊর্মিলা এসে প্রবেশ করেন। ততক্ষণে মৃত শিশুর দেহ অপসারিত হয়েছে। ঊর্মিলা তাঁর সখী চন্দ্রমুখীকে নিয়ে এসেছেন। জাহ্নবীর কেন যেন একে কোনদিনই ভাল লাগে না। কথা বলতে হয় তাই বলে। সারা মুখে তার কুটিলতার প্রকাশ। অথচ ঊর্মিলা কত সরল, কত সহজ। মনে হয় চন্দ্রমুখী ঊর্মিলার ওপর একটা কুপ্রভাব ফেলার চেষ্টায় সতত সচেষ্ট। ঊর্মিলা কতবার তাঁর সখীর বিবাহের জন্য চেষ্টা করেছেন। সে সম্মত হয়নি। লোকে বলে সেনাপতি ধনুর্ধরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ওপর তার দৃষ্টি পড়েছে। সে সুদর্শন এবং পরবর্তী সেনাপতি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। চন্দ্রমুখী ভেবেচিন্তে এগোয়। ওর মধ্যে আবেগ উচ্ছ্বাস আছে বলে মনে হয় না জাহ্নবীর।

দেবযানীর কক্ষের এই বিষণ্ণ পরিবেশে সে হঠাৎ বলে ওঠে—আবার আর একটি হবে। রানী তো বেঁচে রইলেন।

ধাত্রীরা অদ্ভুত দৃষ্টিতে চায়। জাহ্নবীর কানেও কথাটি বড্ড বেশি বাজে। সে দেখল রানী ঊর্মিলা চন্দ্রমুখীর মন্তব্যে সঙ্কুচিত হলেন। তিনি তার দিকে অসন্তুষ্টির চাহনিতে চেয়ে এগিয়ে গিয়ে বড়রানীর ললাটে করস্পর্শ করেন। জাহ্নবীকে জিজ্ঞাসা করেন—কথা বলেছেন?

—না। একইভাবে রয়েছেন।

—বৈদ্য কী বললেন?

—এখানে কিছু বলেননি। মহারাজকে কিছু বলেছেন কি না জানি না। ধাত্রীরা জানতে পারে।

একজন ধাত্রী বলে—বিপদের আশঙ্কা সম্ভবত নেই। রাজবৈদ্য আর এক প্রহর দেখতে চান।

ঊর্মিলা একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান। চন্দ্রমুখী তাকে অনুসরণ করে।

একজন ধাত্রী বলে—ছোটরানীর সঙ্গে যে এসেছিল সে ভাল নয়। এভাবে কেউ বলতে পারে না।

দ্বিতীয় ধাত্রী ঠোঁটকাটা। সে বলে—একথা মহারাজের কানে তুললে এই মেয়ে মানুষটার গলায় কলসী বেঁধে বিদ্যাধরীতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। এই রাজবংশের কেউ অমানুষকে দেখতে পারে না। আমার মা, আমার দিদিমাও এই রাজপুরীতে একই কাজ করতেন।

জাহ্নবী ধাত্রীর মুখের দিকে ভালভাবে তাকায়। দেখতে পায় কণ্ঠস্বর সংযত হলেও তার মুখ ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে বিমলা এখানে নেই। থাকলে কথাটা অবশ্যই মহারাজের কানে যেত। দেবযানীও অচেতন। চন্দ্রমুখীর ভাগ্য ভাল।

সেই রাতে মহারাজা চন্দ্রকেতু তাঁর নিজস্ব শয়নকক্ষে শুয়েছিলেন। তাঁর মস্তিষ্কে নানা চিন্তা। বৈদ্য তাঁর সামনে এসে যখন অশ্রুবিসর্জন করে বলল যে, সেটি পুত্রসন্তান ছিল এবং দেবশিশুর মত রূপ ছিল তার, তখন তাঁর মনে কোন আক্ষেপ হয়নি। তিনি শুধু জানতে চেয়েছিলেন বড়রানী বাঁচবেন কিনা। তবে মুহূর্তের জন্য বড়রানীর ক্রোড়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর শিশুটিকে শোভিত হতে দেখেছিলেন। কিন্তু কল্পনার সেই দৃশ্য ক্ষণিকেই মিলিয়ে যায়। রাজবৈদ্যের আন্তরিক শোককে গুরুত্ব না দিয়ে তাই তিনি শুধু বড়রানীর কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বৈদ্য যখন বললেন যে তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা এখন প্রায় নেই তখন তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। এই নিশ্চিন্ততা কোন পরিকল্পনা প্রসূত নয়। এই নিশ্চিন্ততা তাঁর অন্তরের এক বিশেষ তন্ত্রীপ্রসূত বলা যেতে পারে। সেই তন্ত্রীতে শুধু প্রেমের ঝংকার ওঠে। এই সত্য আজ তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন। তারপর থেকে তিনি দেবযানীকে চন্দ্রকেতুগড়ে নিয়ে আসার পর থেকে এযাবৎকাল প্রতিটি দিনকে তন্ন তন্ন করে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তিনি একটা বিষয় হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে নারীর রূপকে তাঁর অন্তর অত্যন্ত প্রাধান্য দেয়। এর কারণ বোধহয় তাঁর নিজের মা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন বলে। দেবযানীকে প্রথম দর্শনেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারপর থেকে তাঁর রূঢ়তা, তাঁর অহমিকা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সেই দিনগুলো ছিল অত্যন্ত অভিশপ্ত। তিনি এত বেশি আহত হয়েছিলেন যে তাঁর ভয় হয়েছিল যে তিনি উন্মাদ হয়ে যাবেন। তিনি একদিন শান্তভাবে বহুক্ষণ স্থির হয়ে বসে তাঁর পরবর্তী জীবনের কথা ভেবেছিলেন। শেষে তাঁর মনে হয়েছিল, সবার সব সাধ পূর্ণ হয় না। পৃথিবীতে সবাই সুখী হবে একথা ভাবা অবাস্তব। তবে তিনি স্থির করেছিলেন দেবযানীকে তাঁর মর্যাদা নিয়েই থাকতে দেবেন। এটা তাঁর কর্তব্য।

এরপর ঊর্মিলা এলেন। তাঁর স্বভাবের তুলনা নেই। জীবনে প্রথম বুঝতে পারলেন নারীর ভালবাসা কাকে বলে। তাঁর মত অনেক অভাগা রয়েছে পৃথিবীতে যারা সারাজীবন স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করেও নারীর ভালবাসায় স্বাদ পায়নি। তারা ভাবে, ভালবাসা বুঝি ওই রকম। তাঁর ধারণা হয়েছে অধিকাংশ নারী রেখে ঢেকে ব্যবসায়িক ভিত্তিক ভালবাসে তাদের স্বামীকে।

সুহৃদ চিত্রকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনা করে তাঁর তেমন মনে হয়েছে। তার স্ত্রীর প্রতি গভীর অনুরাগ বোঝা যায় না। অথচ সে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ নয়। বরং তার প্রশংসা করে মাঝে মাঝে। কিন্তু ঊর্মিলাকে ঘরে এনে মহারাজা বুঝলেন যে প্রাণঢালা ভালবাসা কাকে বলে। তাতে তিনিও প্লাবিত হলেন। কিন্তু আজ তাঁর মনে ভিন্ন প্রশ্ন। আজ প্রশ্ন হল, কারও প্রাণঢালা ভালবাসার ঠিক সেইরকম প্রতিদান দেওয়া কি সম্ভব? ঠিক ততখানি? দেবাযানীকে ঊর্মিলার পাশাপাশি রেখে এই প্রশ্ন অত্যন্ত স্পটভাবে তাঁর মনে জাগল। আজ তিনি বুঝলেন অবচেতন মনে দেবযানীর ভালবাসা পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর বরাবরই ছিল। তারপর একদিন বুঝতে পারলেন দেবযানীর অন্তরের পরিবর্তনের কথা। সেই সময়ে তাঁদের গঙ্গাতীরবর্তী আম্রকাননে গমন। সেই প্রথম দেবযানীর ভালবাসার অঙ্কুরোদগম এবং অচিরেই তা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে মহীরূহ। দেবযানীর এতদিনের সেই রুদ্ধ ভালবাসার প্রবল প্লাবনে তাঁরা দুজনা আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলেন।

মধ্যরাত্রের পূর্বে মহারাজা দুবার দেবযানীকে দেখে এলেন। তিনি একইভাবে শুয়ে রয়েছেন। তবে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস অনেক স্বাভাবিক। রাজবৈদ্য উপস্থিত রয়েছেন একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে। তাঁকে মহারাজা বলেছেন, কোন বিশেষ সংবাদ দিতে হলে নির্দ্বিধায় তিনি তাঁর কক্ষে গিয়ে নিদ্রাভঙ্গ করতে পারেন।

তিনি রানীকে দেখে আসার পরে একটু নিদ্রাবোধ করছিলেন। সেই সময়ে বৈদ্য এসে ডাকলেন

মহারাজা তাড়াতাড়ি উঠে বসেন—কী হয়েছে?

—চিন্তিত হবেন না মহারাজ। মহারানী জল চেয়ে পান করেছেন।

—সত্যি? আমি তাহলে গিয়ে দেখে আসি।

—না মহারাজ। এখন যাবেন না। উনি উত্তেজিত হবেন। যখন সময় হবে আমি এসে বলব। আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান।

মহারাজা শুয়ে পড়েন। শেষের সংবাদটি পেয়ে চোখদুটি ঘুমে জড়িয়ে আসে। সেই সময় কে যেন তাঁকে স্পর্শ করে। চমকে জেগে ওঠেন তিনি।

শয্যাপার্শ্বে রানী ঊর্মিলা দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

—তুমি!

—তুমি একা রয়েছ। উদ্বিগ্ন চিত্ত। আমি আর থাকতে পারলাম না। যদি তোমার কোন কাজে আসি।

মহারাজা মনে মনে বিরক্ত হন। কিন্তু মৃদু হেসে শান্ত স্বরে বলেন—না, উদ্বিগ্ন আর নই আমি। বৈদ্য বলে গেলেন দেবযানীর প্রাণের আশঙ্কা আর নেই।

ঊর্মিলাও নিশ্চিন্তবোধ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমুখীর পরামর্শের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেন—পুত্রসন্তানটি এভাবে নষ্ট হল। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি।

রানীর কথা মহারাজের অসহ্য মনে হয়। উর্মিলা এ ধরনের কথা কখনো বলেন না। মনে হল এ যেন অন্য কেউ বলছে। তিনি বলেন—আমি খুব ক্লান্ত ঊর্মিলা। কাল তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি শুধু শুধু রাত জেগো না।

রানী ঊর্মিলার অভিমান হয়। তারপর মনে হল চন্দ্রমুখীর শেখানো কথা বলা ঠিক হয়নি। কথাটা উচ্চারণ করতে তাঁর নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। তাঁর সম্বন্ধে মহারাজের বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হল নিশ্চয়। তিনি ধীরে ধীরে নিজের কক্ষে চলে যান।

আট-নয় মাস অতিবাহিত হয়। বড়রানীর গর্ভে এখনো কোন সন্তান আসেনি। রাণী ঊর্মিলা যে বন্ধ্যা এ বিষয়ে কারও মনে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর সঙ্গে মহারাজের সম্পর্কও ঠিক যে আগের মত নেই একথা বাইরের কেউ বুঝুক আর না বুঝুক চন্দ্রমুখী এবং জাহ্নবী বুঝতে পারে। যার কাছে কোন প্রত্যাশা থাকে না তার সঙ্গে সম্পর্কের গভীরতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, এটাই স্বাভাবিক। মহারাজার মনে যে শান্তি নেই একথা সত্য। কিন্তু সেজন্য তাঁর প্রতিদিনের কাজকর্মের কোন ত্রুটি নেই। তাঁর এখন সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা বিদ্যাধরীকে নিয়ে। তাব বক্ষের চড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধীবরেরা উদ্বিগ্ন মুখ নিয়ে এসে বলছে অন্য কিছু কিছু জায়গাতেও গভীরতা কমে যাচ্ছে। নৌকো চালাতে গিয়ে মাঝ নদীতেও লগি ঠেকে যায় অনেক জায়গায়। চন্দ্রকেতুর কাছে তারা যখন অসহায় ভাবে

এসব কথা এসে জানায় তখন তিনি ততোধিক অসহায় বোধ করেন। প্রকৃতির এই আকস্মিক মতিগতির পরিবর্তন ঘটানোর সাধ্য তাঁর আয়ত্তের বাইরে। শেষে একদিন তিনি মিহির ও খনাকে প্রাসাদে আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

তাঁরা আসেন। রাজপরিবারের সমস্ত ঘটনা তাঁদের জানা। তাঁদের দেশের কন্যার স্বভাবের পরিবর্তনের কথা যেদিন প্রথম জানতে পারেন সেদিন উভয়ের আনন্দের অবধি ছিল না। মিহির তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন যে তাঁর গণনা সত্য হলেও শেষ পর্যন্ত এই যে অভাবনীয় পরিবর্তন হল একথা তাঁর গণনায় ধরা পড়েনি। এখন ভালভাবে বিচার করে একটি অস্পষ্ট আভাস পান। কিন্তু তার ওপর নির্ভর করে আগে থেকে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা যায় না। তবে তাঁর গণনা যদি প্রথম থেকে ভ্রান্ত হত তাহলে তাঁর আনন্দ আরও বেশী হত। বিশেষ করে মহারাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পরে। এমন একজন সর্বগুণ সম্পন্ন তরুণ নরপতি ভূ-ভারতে আর আছেন কিনা সন্দেহ।

মহারাজকে তিনি পূর্বে জানিয়েছিলেন যে গঙ্গা এখন আর অকৃপণভাবে বিদ্যাধরীকে তার জলধারার ভাগ দেয় না। একথা তিনি আগেই অনুমান করেছিলেন। কিন্তু পরে খনার কাছে জেনে নিশ্চিত হন। কারণ খনার কাছে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো থেকেও অনেক কৃষক আসে কৃষিবিষয়ে পরামর্শ নিতে। তারা বেশ কয়েক বছর ধরে বলে আসছে যে গঙ্গার ধারা দ্রুত তার গতি পরিবর্তন করছে। মাঝখানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দ্বীপের সৃষ্টি করে চলেছে। সুতরাং সব কথা আগে থেকে মহারাজ জানেন। গতকাল মহারাজের পক্ষ থেকে যখন আমন্ত্রণ এল তখন তাঁরা উভয়ে সবকিছু একবার ভালভাবে পর্যালোচনা করে নিয়ে রাজপুরীতে এসেছেন।

ওঁরা এসে আসন গ্রহণ করলে মহারাজা বলেন—আলোচনা শুরুর আগে আমার কিছু অনুরোধ রয়েছে।

খনা বলেন—অনুরোধ কেন? আপনার ইচ্ছাই যথেষ্ট।

—দেবযানী আপনাদের সাক্ষ্যাৎ প্রার্থিণী।

খনা বিস্মিত হন। মিহিরেরও বিস্ময়ের অবধি থাকে না। তিনি বলেন—এ সুযোগ পেলে আমাদের আনন্দের সীমা থাকবে না। যেবার মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন সেইবার শুধু কথা হয়েছিল। তারপর আপনাদের জীবনে কত কিছু ঘটে গেল। উনি আমাদের দেশের কন্যা। ওঁর প্রতি আমাদের অন্তরের এক বিশেষ টান রয়েছে।

—আপনারা অনুমতি দিলে দেবযানী আসতে পারে।

—অবশ্যই।

মহারাজা মহারাণীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। একটু পরেই দেবাযানী প্রবেশ করেন। তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে উভয়কে প্রণিপাত করেন। তাঁরা হতচকিত হন। ব্যস্ত হয়ে মিহির বলে ওঠেন—একি করলেন? আমরা—

দেবযানী সুমিষ্ট হেসে বলেন—মন্দিরে গিয়েও আপনাদের প্রণাম করেছিলাম। আমি জানি আপনি আমার পিতার চেয়ে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ। তবু আপনি তাঁর বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। আপনি আমার পিতাকে আমার সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সে কথা আমার মা আমাকে বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তবু মানুষ তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না। আমিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

খনা হেসে বলেন—কথাটা সত্য। কিন্তু কদাচিৎ যে তার ব্যতিক্রম ঘটে, আপনি তার

প্রমাণ।

দেবযানী বলেন—আমি জানি, আপনি একটি দেশের রাজকন্যা। অথচ তার জন্য আপনার মনে বিন্দুমাত্র অভিমান নেই, অহমিকা তো দূরস্থান। কৈশোরেই আপনি আপনার স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন। আপনি আমার প্রেরণা। যদিও আপনার তুলনায় আমি অতি নগণ্য। আমি রাজকুমারী নই। আমার পিতার সঙ্গে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সম্পর্ক রয়েছে মাত্র।

খনা বলেন—ওসব কথা থাক। আগেও বলেছেন। আপনি যে সুখী হয়েছেন, এতেই আমরা আনন্দিত।

দেবযানী সহসা অশ্রুমোচন করে বলেন—আমি সন্তান হারিয়েছি।

মিহির বলেন—একটি সত্য কথা আপনাকে বলতে পারি। দেশের অবস্থা যেমনই হোক আপনি আবার সন্তানবতী হবেন।

—হব?

—নিশ্চয় হবেন। শুধু এইটুকু বলতে পারি। কিন্তু সেই সন্তানের ললাটে কি রয়েছে তা জানতে হলে অন্তত তিনবছর লাগবে। তিনবছর পরে যদি আমাকে জানাতে পারেন, তাহলে আমি সব বলে দিতে পারব।

—ওইটুকু যথেষ্ট। আমি মহারাজের পুত্রের জননী হতে চাই। আর কিছু নয়।

আরও কিছুক্ষণ উজ্জয়িনীর নানা কথা হয়। দেবযানী মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর আনন্দ দেখে মহারাজের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। তিনি তো জানলেন যে তিনি আবার জনক হবেন।

একসময়ে মহারানী বিদায় নেন। মহারাজা আলোচনা প্রসঙ্গে আসার আগে আর একবার বলেন—আপনারা সিংহল সম্বন্ধে কৌতূহলান্বিত হতে পারেন ভেবে একটি কথা জানাচ্ছি। এক বিদেশী পোত ঘাটে ভিড়েছে। সেই পোতটি সিংহল ছুঁয়ে এসেছে। ওদের নাবিকের সংখ্যা কম ছিল বলে সিংহল থেকে কয়েকজন নাবিককে নিয়ে এসেছে।

খনা বলেন—তাদের সঙ্গে যদি দেখা করতে পারি তাহলে অনেক কিছু জানতে পারতাম।

—আপনাদের গৃহে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করব?

—খুব ভাল হয়।

—ঠিক আছে। আগামী কাল সকালে ওরা আপনাদের ওখানে যাবে। ওখানকার কথা আপনার নিশ্চয় মনে রয়েছে।

—থাকবে না কেন? আমি তখন দ্বাদশ বর্ষীয়া। মাত্র বিশ বৎসর আগের কথা। তবে আপনি নাবিককে চারদিন পরে পাঠালে ভাল হয়। আমাদের কাছে পুণ্ড্রদেশের কয়েকজন কৃষক আসবে কাল। মহারাজা, নিজের দেশের কথা কেউ ভোলে না। আমার স্বামীর দেশও সিংহলই। তিনিও সেখানে মানুষ হয়েছেন। আমি নিজের দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা করার জন্য উতলা বোধ করছি। কিন্তু কৃষকদের কথা দিয়েছি।

—বেশ তাই হবে।

এবারে মিহির বলেন—আমার আর একটি দুর্ভাবনা রয়েছে।

—আপনার দুর্ভাবনা? আগে বলেননি তো?

—অন্যের কাছে এই দুর্ভাবনার গুরুত্ব নেই, কিন্তু আমার কাছে রয়েছে।

—আপনি নিঃসঙ্কোচে বলুন।

—তাত ত্র্যম্বক যতটা উৎসাহ নিয়ে এখানে এসেছিলেন, তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখানে এসে এক বৎসর পর থেকেই তাঁর উৎসাহে ভাটা পড়ে। পৃথিবীতে আমার পিতার চেয়ে নিকট ব্যক্তি তাঁর কেউ নেই। একসঙ্গে থাকলে সব সময় কলহ করবেন। অথচ উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ প্রবল। তিনি শুধু পিতার কথা বলেন। তাই ভাবছি তাঁকে কেমন করে পাঠিয়ে দেব? তাঁর বয়স অষ্টাশীতি।

—এখান থেকে যতদূর নদীপথে যাওয়া যায় তার জন্য দুশ্চিন্তা কিছু নেই। কিন্তু স্থলপথে যেতে হলে সঙ্গী প্রয়োজন। আপনি এক কাজ করুন, কালই অপরাহ্ণে ওঁকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন।

—স্থলপথে?

—আমি সঙ্গী দেব। আমার সৈন্যদলে একজন তরুণ সেনাপতি রয়েছে। তাকে পাঠাব। সে ওখানে গিয়ে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সেনাদল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে আসবে। আপনি ভাববেন না। আমার উপকার হবে।

—আমি চিন্তামুক্ত হলাম।

—দেবযানী তার পিতা-মাতাকে পত্র দিতে পারবে। তরুণটি ফিরে এলে তাদের সংবাদও পাবে। দুই আড়াই মাসের মধ্যে হয়ে যাবে।

এবার কিছুক্ষণ সবাই নীরব। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মহারাজ আজ তাঁদের আসতে বলেছিলেন এবারে সেই সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হবে। স্বামী-স্ত্রী অপেক্ষা করেন।

শেষে মহারাজা বলেন—এতক্ষণ অনেক কথা হল। এমন কি আমি জানলাম যে আমি জনক হব। তাতে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু উচ্ছ্বসিত হতে পারিনি। উচ্ছ্বসিত হওয়ার একটি মাত্র পথ রয়েছে।

—বলুন।

—যদি আপনারা গণনা করে ভবিষতের সমৃদ্ধ চন্দ্রকেতুগড়ের কথা বলেন, তাহলে আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারি। আমার ধারণা আপনারা এর মধ্যে নিশ্চয় গণনা করে দেখেছেন। সেই গণনার ফলাফল জানতে আমি খুবই ইচ্ছুক।

খনা ও মিহির দুজনাই গম্ভীর হয়ে যান।

মহারাজা ওঁদের আচরণের অস্বাভাবিকতা দেখে বলেন—আমার সহিষ্ণুতার প্রতি আপনারা ভরসা রাখতে পারেন। ভবিষ্যৎ যত ভয়ংকর হোক আমি ভেঙে পড়ব না।

মিহির খুব ধীরে ধীরে শান্ত স্বরে বলেন—সে বিশ্বাস আমাদের আছে মহারাজ। কোন স্থানের ভবিষ্যৎ যত ভয়ংকরই হোক না কেন বলা যায়। কিন্তু ভয়ংকরের চেয়েও যদি বেশি কিছু থাকে সে কথা কি করে বলব?

মহারাজ চন্দ্রকেতু মিহিরের উক্তির মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। তিনি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—আপনি কি বলতে চাইছেন আচার্য?

—আমি আর খনা দুজনা মিলে বারবার গণনা করেছি গতকাল। গভীর রাত পর্যন্ত গণনা করেছি। দেখলাম চন্দ্রকেতুগড়ের কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছে। সেই শৈশব থেকে গণনা করে আসছি। কিন্তু এই ধরনের ফল কখনো দেখিনি। একটা অন্তহীন কৃষ্ণবর্ণ গহ্বর।

—এই শূন্যতার, এই গহ্বরের তাৎপর্য কী?

—দেখে মনে হয় এই রাজধানীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। গঙ্গারিদির কথা মানুষে

বিস্মৃত হবে।

—তাই কখনো হয়? মানুষের মৃত্যু বলে তার শবদেহ থাকে। সেই শব দাহ করে ভস্মটুকু তো পাওয়া যায়।

—সেই ভস্ম কি পৃথক অস্তিত্ব নিয়ে থাকতে পারে? এক ফুৎকারে কোথায় মিলিয়ে যায়।

সহসা খনা বলে ওঠেন—মহারাজ আপনি এখান থেকে দূরে কোথাও রাজধানী স্থানান্তরিত করুন। যত শীঘ্র সম্ভব করুন। নইলে কারও নিস্তার নেই। আমাদেরও নয়। নটী কাঞ্চনমালার মৃত্যু গঙ্গে এবং চন্দ্রকেতুগড়কে অভিশপ্ত করেছে। তবে সেটি হয়ত উপলক্ষ মাত্র। এই নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত। আপনি দ্রুত আয়োজন শুরু করুন।

বিমর্ষ চন্দ্রকেতু ম্লান হেসে বলেন—আমি পারব না। আমি এখানে থাকব। আমি পিতার গড়া এই গড়-বেষ্টিত নগরী আর তার নগরবাসীদের ফেলে রেখে কোথাও যাব না। মৃত্যু এলে ওদের সঙ্গেই মরব। বরং আপনারা সম্মত হলে আমি আপনাদের ওই অর্ণবপোতে সিংহলে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন করে দিতে পারি। ত্র্যম্বক তো আগামী কাল যাত্রা করছেন। বিদ্যাধরী বিশুদ্ধ হতে নিশ্চয় অনেক বছর লাগবে। হয়ত কয়েক যুগ।

মিহির বলেন—বিদ্যাধরী তো রয়েছেই। কিন্তু সেটি আশু বিপদের কারণ নয়। এক দুর্নিবার মহামারী গ্রাস করবে চন্দ্রকেতুগড় এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে।

—মহামারী? বিসূচিকা?

—জানি না।

—আপনাদের সুযোগ রয়েছে জীবিত থাকার। আপনারা সাগর পাড়ি দিয়ে সিংহলে যেতে পারেন ওই পোতে। আমি বললে ওরা সসম্মানে আপনাদের নিয়ে যাবে। ওদেশের রাজকন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ওরা গর্ববোধ করবে। শ্বেতাঙ্গ নাবিকদের বুঝিয়ে বললে তারা আপত্তি করবে না।

খনার মধ্যে সহসা একটা অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করেন দুজনা। তিনি যেন ইহজগতের পরিবেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিও অন্যরকম।

তবু স্বাভাবিক স্বরে বলার চেষ্টা করেন তিনি—এ আপনার ভ্রম মহারাজা। এ কথা সত্য, যে সিংহল সম্বন্ধে জানার আগ্রহ আমার যথেষ্ট। সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড় আমাদের আশ্রয় দিয়েছে, সম্মান দিয়েছে। চন্দ্রকেতুগড় আমাদের প্রাণ। তাকে আমরা ভালবাসি। ওই বিষ্ণুমন্দির পরিত্যক্ত রেখে আমরা কোথায় যাব? এখানকার দেবতা জনহীন দেবালয়ে বসে প্রহর গুনবেন? না, না, তা হয় না মহারাজ। কাঞ্চনমালাকে অমন বিকৃতভাবে হত্যার অভিশাপ বোধহয় আমাদের দিয়েই শুরু হবে। তাই হোক। কাঞ্চনমালা চলে যাওয়ার পর থেকে চন্দ্রকেতুগড় শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

মিহির বলে ওঠেন—এ তুমি কি বলছ খনা?

চন্দ্রকেতু খনার সম্মুখে নতজানু হয়ে বলে ওঠেন—আপনি শান্ত হন। আপনার ওই চাহনি আমি সহ্য করতে পারছি না।

মিহির এবারে খনাকে স্পর্শ করে বলেন—খনা, তুমি প্রকৃতস্থ রয়েছ? ওভাবে বলছ কেন?

—কিভাবে বলছি? যেমন দেখছি তেমনি বলছি। যে দেশে এমন একজন তুলনাহীন মহারাজা রয়েছেন সেই দেশের ওপর বিধাতার রুদ্রবোষ কেন বর্ষিত হতে শুরু করল?

এর কারণ কি শুধু দ্বিজন্মের বিকৃত কামনা নাকি এই রাজবংশের অতীতের পাপের ফল? তুমি কি বুঝতে পারছ স্বামী?

—না, বুঝতে পারছি না। পারবও না। তবে কোন পাপের ফল ছাড়াও এমন ঘটে থাকে। বিধাতা বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে সতত ক্রীড়ারত। তুমি তো প্রায়ই রাত জেগে দেখে থাক, আকাশের কত তারকা কক্ষচ্যুত হয়ে ছিটকে কোথায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এও ক্ষুদ্রাকারে তেমন কিছু হতে পারে। তবে একটা উপলক্ষ্য চাই। দ্বিজন্মের আর্বিভাবকে একটা গৌণ কারণ বলে ধরে নিতে পার। আমাদের সংস্কার আর পরিবেশের সঙ্গে দ্বিজন্মের ভূমিকা সুন্দরভাবে মিলে যায় বলে ওকে প্রাধান্য দিচ্ছি। ওর অস্তিত্ব না থাকলেও কিছু এসে যেত না। আমার এই কথা তোমাদের কাছে নীরস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এটাই সত্য। ভাঙা গড়া প্রকৃতির নিয়ম। চন্দ্রকেতুগড় অন্যান্য রাজ্যের মত কখনো আক্রান্ত হয়নি। বংশ পরম্পরায় নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করেছে। এখানকার অধিবাসীরা তাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বনভূমির হিংস্র শ্বাপদদের নিয়ে ঘর করে। কিন্তু কখনো তাদের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটেনি। এই একটানা শান্তি বোধহয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির কাছে অনেক ঋণ গঙ্গারিদির। তাই একসঙ্গে সমস্ত দেনাপাওনা তিনি মিটিয়ে নিতে চাইছেন। গঙ্গাও মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। তিনি সৌভাগ্যবতী যে তাঁকে জহ্নুমুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ভগীরথ ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগিনী বিদ্যাধরীর জন্য কোন ভগীরথ ভূমিষ্ঠ হননি এ পর্যন্ত। পরে হবেন কিনা জানি না।

যাঁরা আগে থেকে ভবিষ্যৎকে দেখতে পান, তাঁরা সেই কথা বলে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করেন না। নিজেদের উদ্বেগ নিজেদের মধ্যে চেপে রেখে সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে থাকেন। মহারাজ চন্দ্রকেতু ভবিষ্যদ্বক্তা না হতে পারেন কিন্তু সমস্ত গঙ্গারিদি রাজ্য তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। তাই খনা মিহিরের নিকট নিজ রাজধানীর ভাগ্যের আসন্ন দুঃসময়ের কথা জেনেও তিনি আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক থাকেন। মনের মধ্যে ঝড় উঠলেও বাইরে প্রকাশ করেন না। এমন কি দুই রাণীও এ বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ জানতে পারলেন না। তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে আগের মতই কালাতিপাত করতে থাকেন।

মিহির ও খনা তাঁদের দেবালয়ের বিস্তীর্ণ উদ্যানের দুই বৃহৎ জলাশয়ের মাঝখানে তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে গিয়ে বসে থাকেন রাজপুরী থেকে ফিরে আসার পর। সিংহলের নাবিকদের তাঁদের গৃহে আসার কথা কদিন পরে সেকথাও বিস্মৃত হন। তাঁরা অনেক যাগযজ্ঞ করে যুগল পুষ্করিণী খনন করেছিলেন। নাম দিয়েছেন অমিত্তোকুণ্ড ও জীয়ন্তকুণ্ড। সবার মত তাঁদেরও বিশ্বাস বিষ্ণুর আশীর্বাদে এই যুগল পুষ্করিণীতে অবগাহন করলে মনের গ্লানি দূর হয়। শরীরও নিরাময় হয়। কিন্তু প্রাসাদ থেকে আসার পরে তাঁরা হতাশা বোধ করছেন। মহারাজকে শীঘ্র এই স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার জন্য তাঁরা অনেক অনুরোধ করেছেন। কিন্তু মহারাজ নিজ সঙ্কল্পে অনড়। তিনি বলেছেন মৃত্যু এলে সেই মৃত্যুকে চন্দ্রকেতুগড়েই বরণ করবেন। স্থানটি তাঁর পূর্বপুরুষদের পদধূলি-ধন্য।

পরদিন একদল কৃষক এল। মন্দির দর্শন করে তারা মোহিত। যুগল সাগরে স্নান করে তারা তৃপ্ত। সঙ্গে করে নিয়ে আসা নিজেদের খাদ্যের সঙ্গে দেবালয়ের কণামাত্র প্রসাদ মিশ্রিত করে তারা গ্রহণ করে। তারপর মন্দিরের সামনের চত্বরে তারা খনা ও মিহিরকে বেষ্টন করে বসে পড়ে তাঁদের উপদেশ শুনতে। কিছুক্ষণ ধরে খনা তাদের দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা শোনেন। শেষে বলেন—আপনারা কেউ লিখতে পারেন?

একজন লিখতে পারে। খনার নির্দেশে সে ভূর্জপত্র, কালি ও লেখনী বের করে তার পেটিকা থেকে। খনা বলেন—লিখুন ঃ

কর্কট ছরফট, সিংহ শুকা, কন্যা কানে কান।
বিনা ব্যয়ে বর্ষে তুলা, কোথা থুবি ধান॥

লেখক সেটি লেখার পরে বারবার সবাইকে পড়ে শোনায়। কিন্তু কেউ ঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারে না। শেষে খনাকে অনুরোধ করে বচনটির অর্থ বুঝিয়ে বলতে।

খনা বলেন—অবশ্যই বলব। কিন্তু এটিকে মুখস্থ রাখতে হবে।

ওদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে সেটি হুবহু আবৃত্তি করল।

বিস্মিত খনা বলেন ওঠেন—আপনি কি শ্রুতিধর?

—হ্যাঁ মা। যা শুনি ভুলি না। এ এক জ্বালা হয়েছে।

—আমার মত। খুব ভাল লাগল। এবারে বুঝিয়ে দিচ্ছি। কর্কট হল শ্রাবণ মাস, সিংহ হল ভাদ্রমাস, কন্যা হল আশ্বিন মাস আর তুলা হল কার্তিক মাস। শ্রাবণে অতি বৃষ্টি ভাদ্রমাসে রোদ, কার্তিকে ঝড় ছাড়া বৃষ্টি হলে প্রচুর পরিমাণে ধান জন্মায়। এবারে রবিশস্য সম্বন্ধেও ছোট একটি বচন বলছি। শ্রুতিধর তো রয়েছেন। যিনি লিখছেন, তিনিও লিখে নিন।

আশ্বিনের উনিশ, কার্তিকের উনিশ।
বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বুনিস॥

কৃষকেরা যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে শিক্ষিত রয়েছে, এমনকি শ্রুতিধরও রয়েছে। এসব উন্নত কৃষক সম্প্রদায় অবন্তী দেশে রয়েছে কিনা জানা নেই মিহিরের। হয়ত রয়েছে, তাঁরা জানেন না। খনার তো বটেই, পিতৃভূমি হলেও মিহিরের নিজের দেশ সম্বন্ধে সম্যক জানা নেই। নাড়ীর টানও সিংহলের প্রতি।

তিনদিন পরে পাঁচজন সিংহলী এল তাঁদের গৃহে। তারা সবাই সেই দেশের রাজধানীর অধিবাসী। খনার প্রকৃত পরিচয় তাদের জানানো হয়নি তাঁরই অনুরোধে। শুধু জানানো হয়েছে তিনি তাদের দেশের কন্যা। অনেক বছর দেশ ছাড়া। কিছুক্ষণ কথা বলার পরে খনা লক্ষ্য করেন তাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছে। মনে হয় তার কোন শারীরিক যন্ত্রণা হচ্ছে।

তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—ওঁর কী হয়েছে?

—জ্বর হয়েছে। সারা গায়ে যন্ত্রণা আজ সকাল থেকে। গতকাল ভাল ছিল।

—মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ওঁকে নিয়ে এলেন কেন?

—কিছুতেই ছাড়ল না। বলল, আপনাকে দেখবে।

খনা ওদের জিজ্ঞাসা করেন—আপনাদের দেশের রাজা এখন কে?

ওরা নাম বলে।

খনার খুব আনন্দ হয় শুনে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এখন রাজা। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—এই রাজার পিতার কবে মৃত্যু হল?

—তিনি তো মৃত নন, জীবিত রয়েছেন। পুত্রকে রাজত্ব দিয়ে এখন সমুদ্রতীরে একটি গৃহনির্মাণ করে ধ্যান করেন। তিনি বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হয়েছেন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট থেকে দীক্ষা নিয়ে।

—আর মা?

—কোন্ মা?

—বৃদ্ধ রাজার রানী?

—গত বৎসর তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

খনার হৃদয় শোকাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তিনি স্বগতোক্তি করে ওঠেন—মায়ের মৃত্যু হয়েছে! গ তো হবেই। বরাবরই একটু দুর্বল ছিলেন। তবু তো এতদিন ছিলেন।

—আপনি দুবার 'মা' বললেন। কাকে 'মা' বলছেন?

খনা ভাবেন অনর্থক নিজের পরিচয় গোপন রেখে লাভ নেই। তিনি বলেন—আপনাদের খানকার রাজা আমার সহোদর ভ্রাতা। বৃদ্ধ রাজা আমার পিতা।

স্তম্ভিত নাবিকেরা খনার সামনে লুটিয়ে পড়ে—আপনিই বৃদ্ধরাজার সেই পৃথিবীবিখ্যাত ন্যা! আপনি স্বামীর সঙ্গে দেশত্যাগ করেছিলেন! আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি এভাবে আপনার র্শন পাব। আমরা ধন্য। মহারাজকে আপনার সংবাদ দিলে তিনি খুবই আনন্দিত হবেন। াপনার জন্য কোন উপঢৌকন আনতে পারিনি। কাল নিয়ে আসব।

—কোন প্রয়োজন নেই। আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যে আনন্দ পেলাম, কোন উপঢৌকন ার চেয়ে বেশি আনন্দ দিতে পারবে না। আপনি শুধু আপনাদের রাজাকে বলবেন যে ার ভগিনী সুখেই আছে। সে যেন পিতাকে একথা জানিয়ে দেয়।

—অবশ্যই জানব। সবই তো স্বচক্ষে দেখে গেলাম।

সেই সময় অসুস্থ ব্যক্তিটি সহসা আর্তনাদ করে ওঠে—আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। চোখে অসহ্য যন্ত্রণা। আমি কি অন্ধ হয়ে যাব?

খনা এবারে নিজে এসে তার চোখের দিকে দেখেন। দুই চোখ অস্বাভাবিক রক্তবর্ণের। মার তার সারা মুখমণ্ডল ফুস্‌কুড়িতে পরিপূর্ণ। হাতেও সাদা সাদা মুখ দিয়ে ফুসকুড়ি বের য়েছে।

তিনি নিম্নকণ্ঠে ওদের বলেন—এঁকে এখনি নিয়ে যান। দেখে মনে হচ্ছে, এঁর অবস্থা ভাল নয়। পোতে আপনাদের চিকিৎসক রয়েছেন?

—হ্যাঁ।

খনাকে নিজের দেশের রাজকন্যা জেনে ওদের ফিরে যাওয়ার একটুও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অসুস্থ সঙ্গীকে নিয়ে ফিরে যেতে হল।

ওরা চলে গেলে চিন্তাগ্রস্ত মিহির বলেন—অদ্ভুত রোগ। এত যন্ত্রণা। মুখটা কিছুক্ষণের ধ্যে কিরকম ফুলে গেল। অন্ধ হয়ে গেল নাকি?

—বুঝতে পারছি না।

—ওতো দেখলাম বাঁচবে না। বিদেশে এসে এভাবে মৃত্যু হবে?

—নিজের দেশের মানুষের খোঁজ পেয়ে কত আনন্দ নিয়ে এসেছিল, ওই শরীর নিয়ে।

—নাবিকদের এইভাবে বিদেশে মৃত্যু হতেই পারে। তাদের পরিবার পরিজন তাদের এই অদৃষ্টকে নিশ্চয় মেনে নেয়। মৃত্যুর আবার স্থান কাল।

চারদিন পরে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রবল আলোড়ন। দুদিন পূর্বে অর্ণবপোত থেকে একটি মৃতদেহ এনে নদীর তীরে দাহ করা হয়। তার পরদিনই আর একটি শবদেহ বিদ্যাধরীর জলে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মহারাজা এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোতের অধ্যক্ষকে নির্দেশ পাঠান অবিলম্বে ঘাট ছেড়ে সমুদ্রপথে যাত্রা করার। তিনি রাজবৈদ্যকে সন্ধান নিতে বলেন কোন রোগে দুজন নাবিকের এমন মৃত্যু হল। রাজবৈদ্য সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীরে

ছুটলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে নাবিকেরা দিশাহারা। তারা কোনরকমে কিছুদিনের খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহে ব্যস্ত। বাণিজ্য তাদের মাথায় উঠেছে। তাদের মধ্যে আরও দুজন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। রোগের লক্ষণ একই রকম। রাজবৈদ্য নিজের পরিচয় দিয়ে ওদের জলযানের ওপরে ওঠেন এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখে চমকে ওঠেন। তারপর ভীত হয়ে সেখান থেকে নেমে দ্রুত রাজপুরীর দিকে ছুটলেন। এই রোগে মড়ক হয়। বিসূচিকার চেয়েও সহস্রগুণ মারাত্মক। এই রোগের নাম মারিগুটিকা। এই গুটি কারও দেহে দেখা দিলে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। দু'চারজন বেঁচে উঠলেও জীবিতদের অধিকাংশের দেহে এবং মুখে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন রেখে যায়। এই গুটিকা চক্ষুদ্বয়ের মধ্যেও হতে পারে। যাদের হয় তাদের চোখের মণি গলে বেরিয়ে যায়। তারা বেঁচে থাকে অন্ধ হয়ে।

মহারাজ বৈদ্যের মুখে সব শুনে অতিমাত্রায় চিন্তান্বিত হল। ধনুর্ধরকে আদেশ দিলেন নাবিকেরা কেউ যেন নগরীর ভেতরে পদার্পণ করতে না পারে। শল্যকে দেখতে বলেন, নগরবাসীদের কেউ যেন নদীর তীরে না যায়। নদীতে স্নান এবং তার জল ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ধীবরদের বলা হল জলযানটি যতদিন চলে না যায় ততদিন মৎস্যশিকার বন্ধ। তিনি চান ওই রোগ রাজধানীর একটি প্রাণীকেও যেন আক্রমণ না করে।

বিধাতা হাসলেন। দ্বিজন্মের শিশুপুত্র ভরত সেই রোগে আক্রান্ত হল। পাগলিনী উর্বশী পুত্রের যন্ত্রণাকাতর চিৎকার শুনে অট্টহাসি হাসতে লাগল। মানুষে দূর থেকে দেখে। নিকটে যেতে ভয় পায়, পাছে তাদেরও অভিশাপ লাগে। রাজবৈদ্য বলেছেন রোগটি বায়ুদ্বারা ছড়ায়। নিশ্চয় চরক-সংহিতায় তেমন কিছু লেখা রয়েছে। নইলে উনি একথা বলবেন কেন? তারা ভাবে, দ্বিজন্মের পাপ তার স্ত্রীকে উন্মাদিনী করেছে, এবারে তার পুত্রকেও নিষ্কৃতি দিল না। তার অতটুকু দেহ এবং মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। পাপের ফল ফলতে শুরু করেছে। নাগরিকদের তখনও অনেক কিছু জানতে বাকি ছিল।

ভরতের মৃত্যুর পূর্বেই স্বয়ং খনা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মহারাজা এই সংবাদ শুনে অতিমাত্রায় চিন্তান্বিত হয়ে রাজবৈদ্য পাঠালেন।

রাজবৈদ্য খনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই খনা বললেন—আপনি এখানে থাকবেন না। এখুনি চলে যান।

—মহারাজা আমাকে পাঠালেন দেখতে।

—কোন প্রয়োজন নেই। নিজেকে আর রাজপুরীকে যদি রক্ষা করতে চান তাহলে এক দণ্ডও এখানে দাঁড়াবেন না। কদিন আগে যে নাবিকেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারাই এই রোগ এদেশে বহন করে এনেছে। আমার ভাগ্যে যা হয় হোক, আপনারা বাঁচুন। শেষ পর্যন্ত আমার জন্মভূমি এই দেশের সর্বনাশের কারণ হল।

রাজবৈদ্য মৃদু হেসে বলেন—মানুষের মনের কি অদ্ভুত পরিবর্তন হয়। সিংহলের নাবিকদের দেখতে আমি ওদের জলযানে উঠেছিলাম। তারপর ব্যাধিগ্রস্থ নাবিকদের দেখে আমি সভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। অথচ আজ আপনার পাশে দাঁড়িয়ে এতটুকু ভীত হচ্ছি না। আমি জানি আপনি ব্যতীত চন্দ্রকেতুগড়ের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে, নিরর্থক হয়ে পড়বে। ভবিষ্যতেও আপনাদের মাধ্যমে বোধহয় এই স্থানটি পরিচিতি পাবে। কারণ মারিগুটিকার মড়ক লেগেছে। আমি আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করব। আপনার মুখে এবং হাতে গুটিকার সংখ্যা অনেক কম। বোধহয় আমি সফল হব।

—কিন্তু আপনি অসুস্থ হয়ে পড়লে কে আপনাকে বাঁচাবে? এই দুঃসময়ে আপনাকে

তো প্রয়োজন রয়েছে।

—আমি বৃদ্ধ। জীবনের কতটুকু বা অবশিষ্ট রয়েছে। আমি সহজ সহজ চিকিৎসার প্রণালী রেখে যাব। তাতে যতটুকু উপকার হয়, হবে। যন্ত্রণার উপশমই মূল কথা।

সর্বক্ষণ মিহির খনার শিয়রে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাজবৈদ্য চলে গেলে খনা বলেন—কেন তুমি এভাবে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছ?

—তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

—আমার কথার উত্তর দাও।

—কোন্ কথার?

—তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাবে কিনা।

মিহির খনার পাশে বসে পড়ে তাঁর কপালে গাল ঠেকিয়ে বলেন—একথার উত্তর হয়? ছেলেমানুষী করো না। তোমাকে ভাল করে তুলতে হবে না? তখন আমার কত আনন্দ হবে।

—এরপর তোমার কী হবে?

—কিছুই হবে না। তুমি অত কথা বলো না।

দূরে কোথাও দুই কোকিল ডেকে চলেছে ক্রমাগত। তাদের মধ্যে চাপান-উতোর চলছে মিলনের বাসনায়।

খনা বলেন—বসন্তকাল। আমরা দুজনা যেদিন সাগর অতিক্রম করে এদেশের মাটিতে পা রাখলাম সেইদিন সেইক্ষণে কোন এক নারকেল কুঞ্জ থেকে এমনি কোকিল ডাকছিল। তুমি বলেছিলে, 'তুমি আর আমি, মনে আছে?'

—আছে খনা। মনে থাকবে না? ওই মুহূর্তগুলোই তো আমাদের জীবনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। আমি কি ভুলে যেতে পারি?

খনা বলেন—আমি জানতাম তুমি এখানেই থাকবে। তুমি বরাবর অবাধ্য। আমার কোন কথা শুনতে চাও না।

—তোমার কথা শুনলে তোমাকে দেখবে কে খনা? তৃষ্ণার্ত হলে তোমার মুখে জল দেবে কে? আমি যেমন জানতাম আমাদের কোন সন্তান হবে না তেমনি জানি অন্তত এই রোগে তোমার মৃত্যু হবে না। আমার একমাত্র ভয় ছিল তুমি অন্ধ হয়ে যাবে বলে। কিন্তু তোমার চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ নয়। এখনো তুমি দেখতে পাচ্ছ। সেই ফাঁড়াও কেটে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু আমি কুৎসিত হয়ে যাব।

—তুমি আবার কুৎসিত হও নাকি? সত্যই তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

খনা রাগত স্বরে বলেন—যত বুদ্ধি তোমার মাথায় গিয়ে ঢুকেছে।

মিহির একটি পাত্র খনার মুখের সামনে ধরে বলে—একটু জল খাও। তোমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

—আমার কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এই গুটিকায় আমার মুখবিবর, কণ্ঠনালী সব কিছু ছেয়ে গিয়েছে।

—রাজবৈদ্য আমাকে বলেন, তেমন হয়। শুধু শরীরের ওপরে নয় ভেতরেও। মথুরায় নাকি একবার তেমন হয়েছিল।

—আমার কিন্তু তেমন যন্ত্রণা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে কেমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। সেই সময়ে মনে হচ্ছে কে যেন আমার শয্যাকে ঝাঁকি দিচ্ছে। সেই সময় চেয়ে দেখি আমার মা দাঁড়িয়ে হাসছেন। মা আবার ধীরে ধীরে দেবী হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছেন। কোন্ দেবী বুঝতে পারলাম না।

মিহির খনাকে সযত্নে জলপান করান। খনা নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন। মিহির জাগ্রত থাকেন।

সিংহলী নাবিকদের নিয়ে বিদেশী পোত ঘাট ছেড়েছে কদিন হল। কিন্তু যাওয়ার আগে আরও একটি শব ফেলে গিয়েছে নদীতে। সেটি একজন শ্বেতকায় মানুষের। সেই শবটি জোয়ার-ভাটায় কদিন ধরে এদিক ওদিক করল। পচন ধরল। তারপর মিলিয়ে গেল। বোধহয় মৎস্য এবং অন্যান্য জলচর প্রাণীর খাদ্য হল এবং কংকাল তলিয়ে গেল।

রাজবৈদ্য ঘোষণা করেছেন, সবাই যেন প্রত্যহ নিমপাতা খায়। অন্য তিক্ত খাদ্যও খেতে পারে। এ সময়ে অজস্র সজিনা খাড়া ঝুলছে গাছে, তাও যেন খায় প্রত্যেকে। তাহলে রোগের প্রকোপ হ্রাস পেতে পারে।

তবু কিছুতে কিছু হতে চায় না। ঘরে ঘরে কান্নায় রোল ওঠে। মহারাজা বারবার আলোচনায় বসছেন। গঙ্গারিদির অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের বলে দিয়েছেন, তারা যেন একমাস রাজধানীতে না আসে।

শল্য বলে—মহারাজ, ধীবরেরা মাছ ধরছে না। বাইরে থেকে প্রতিদিন নানা ধরনের খাদ্য আসে। বন্ধ হয়ে গেলে খুব অসুবিধা হবে। নদীর ওপার থেকেও কেউ আসবে না।

মহারাজ বলেন—জানি। তবু দেখা যাক। রাজধানীতে অনেক কিছু উৎপাদিত হয়। কদিন চলে দেখা যাক। ইতিমধ্যে অন্য কোন ব্যবস্থার কথা ভাবনা চিন্তা করুন সবাই।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে একদিন রাজপুরীতে ছোটরানী অসুস্থতা বোধ করেন। তাঁর শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। রাজবৈদ্য আসেন। তিনি কক্ষের সমস্ত বাতায়ন খুলে দিতে বলেন চন্দ্রমুখীকে। সে দুরু দুরু বক্ষে খুলে দেয়।

পূর্বাকাশের সূর্যকিরণ আছড়ে পড়ে রানীর শয্যার ওপর। রাজবৈদ্য রানীর মুখ সেই আলোয় দেখামাত্র বুঝতে পারেন কালের করাল ছায়া এবারে রাজপরিবারেও এসে পড়ল। মাত্র একদিন সিংহলীদের সঙ্গে কথা বলে খনা আক্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু রানী ঊর্মিলা তো বাইরের কারও সংস্পর্শে আসেননি। আবার বৈদ্য নিজে সেই অভিশপ্ত জলযানে উঠে নাবিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। রোগাক্রান্তদের দেখেছেন। খনার চিকিৎসা করেছেন নিজের জ্ঞান অনুযায়ী। অথচ তিনি নিজে সুস্থ রয়েছেন কি করে, এ এক বিস্ময়। একি কোন দেবতার করুণা? সদুত্তর খুঁজে পান না বৈদ্য।

রানী ঊর্মিলার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রাজবৈদ্য মহারাজের সঙ্গে কথা বলতে গেলেন অত্যন্ত সংকোচে। তাঁর নিজেকে অস্পৃশ্য বলে মনে হতে থাকে। তিনি যদি শেষ পর্যন্ত মহারাজের রোগের কারণ হন? চন্দ্রমুখীকে তিনি বলে গেলেন, রানীকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখতে হবে। শুধু চন্দ্রমুখী তাঁর সেবায় থাকবে এবং সে ব্যতীত একমাত্র তিনি ছোটরানীর কক্ষে যাবেন যতবার প্রয়োজন হবে। অন্য কেউ নয়। শুনে চন্দ্রমুখীর হৃদকম্প উপস্থিত হয়। এতদিনের সখীকে তার শত্রু বলে মনে হতে থাকে। কিন্তু এখান থেকে কোথায় যাবে? তাম্রলিপ্তের রাজকন্যা আর গঙ্গারিদির রানীর যত্ন-আত্তি সে মোটামুটি করে এসেছে এতদিন। তার সামান্য অসুখ-বিসুখে শুশ্রূষা করতে অসুবিধা ততটা হয় না। কিন্তু এই ভীষণ

রোগাক্রান্ত রোগীর সান্নিধ্যে থেকে নিজের জীবনকে বিপন্ন করা যায় না। অথচ উপায় নেই। কোথায় পালাবে? সে সারাদিনে ধীরে ধীরে ঊর্মিলার মুখের পরিবর্তনে ভীত হয়ে পড়ে। সেই মুখ ধীরে ধীরে ফুলে উঠেছে। এতবেশী গুটি বেরিয়েছে যে খড়কে বেঁধানোর জায়গা নেই। প্রতিটি গুটির মুখে পুঁজ। ঊর্মিলা যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন। চন্দ্রমুখীকে বারবার কাছে যেতে বলেন। সে একবার দুবার যায় আবার তখনি যতদূর সম্ভব দূরে সরে যায়। মহারাজা একবার এলেন দেখতে। ঊর্মিলা আকুলভাবে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন মহারাজের দিকে।

—আমি আর পাচ্ছি না। আমাকে বাঁচাও। আমি বড়রানীর পথের কাঁটা হব না। শুধু যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাই।

মহারাজা তাঁর একটি হাত ধরে বলেন—এই রোগে যন্ত্রণা হবে ঊর্মিলা। সহ্য কর লক্ষ্মীটি। রাজবৈদ্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন। তুমি স্থির হয়ে থাকার চেষ্টা কর। জানি, সহ্য করা খুব কঠিন। তবু সহ্য যে করতে হবেই। চন্দ্রমুখী তো রইল তোমাকে দেখতে। আমিও এসে দেখে যাব।

ঊর্মিলা বলেন—ও আমার কাছে থাকে না। দূরে দূরে থাকে।

মহারাজা চন্দ্রমুখীর দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। চন্দ্রমুখী সভয়ে বলে—আমি ওঁর কাছেই থাকি। কিন্তু ওঁকে এত ভালবাসি যে ওঁর আর্তনাদ সইতে পারি না।

—নিজের মায়ের চেয়ে মেয়েকে কেউ ভালবাসেন না। ওঁর মা এখানে থাকলে কি করতেন? এঁকে অবহেলা করা আমি চাই না।

মহারাজা জানেন, রানী ঊর্মিলার বাঁচার আশা নেই। রাজবৈদ্য তাঁকে সেকথা জানিয়েছেন। এত বেশি গুটিকা এ পর্যন্ত কারও দেহে দেখা যায়নি। তবে আঁখি দুটি অক্ষত রয়েছে। রানীর অবস্থা খুবই খারাপ। তাঁকে দেখে মহারাজের মনে হয়েছে অচেনা কোন কদাকার রমণী। তাঁর মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাঁর প্রেমের প্রথম পাঠ এঁর কাছ থেকেই। এঁকে তিনি বিশেষভাবে ভালবাসেন। দেবযানীর মনের পরিবর্তনের পূর্বে ইনি ছিলেন তাঁর এক মাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি ভাবেন, মিহির যখন তাঁকে দ্রুত রাজধানী স্থানান্তরিত করার কথা বলেছিলেন, তখন তাঁর কথামত চলে গেলে হয়ত রাজপুরীকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু সেভাবে ভাবতে গেলে মন এখনো সাড়া দেয় না। তিনি জানেন, যে কোন মুহূর্তে তিনি নিজে আক্রান্ত হতে পারেন। কারণ রানী ঊর্মিলাকে তিনি স্পর্শ করেছেন। আরও কিছু আক্রান্ত ব্যক্তির গৃহে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন। তাই বলে কি তিনি একজন মৃত্যুপথযাত্রীর আকুল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবেন? তিনি ঊর্মিলার কাছে আবার আসবেন। শুধু একটি দুশ্চিন্তা তাঁর মনের মধ্যে বারবার উঁকি দিচ্ছে। তাঁর ভবিষ্যৎ বংশধরকে জীবিত রাখা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। এত দুঃসময়ের মধ্যেও দেবযানী তাঁকে বলেছেন, মনে হচ্ছে তাঁর গর্ভলক্ষণ দেখা দিয়েছে। গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এ যেন ক্ষণপ্রভার দ্যুতি।

ঊর্মিলার কক্ষ থেকে বের হয়ে তিনি ভালভাবে স্নান করলেন। তারপর ধীরে ধীরে দেবযানীর কক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি দেখেন সেখানে জাহ্নবী উপস্থিত নেই। অথচ তার সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।

দেবযানী তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে কণ্ঠলগ্না হন। বলেন—একী হল? শেষে ঊর্মিলাও?

—হ্যাঁ দেবযানী। ব্যাধি তো রাজা বা রানী দেখে অব্যাহতি দেয় না।

— তোমার তাহলে কী হবে?

—আমার কী হবে সে কথা ভাবি না। তবে এত ভয়ংকর এবং যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি জগতে রয়েছে আমি জানতাম না। তুমি ঊর্মিলাকে দেখে চিনতে পারবে না। শোন দেবযানী, আচার্য মিহির সস্ত্রীক রাজপুরীতে আসার পরদিন তুমি বলেছিলে যে তোমার মনে হচ্ছিল আবার তুমি অন্তরাপত্যা হতে চলেছ।

—হ্যাঁ, রাজা। আমি নিশ্চিত এ বিষয়ে। আজ সকালে প্রথমবারের মত বমনস্পৃহা দেখা দিয়েছে। সেইজন্য আমার সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা। একবার ব্যর্থ হয়েছি। মনে হয়েছে সেটি আমার পাপের ফল। আবারও যদি তেমন কিছু হয়?

মহারাজা চন্দ্রকেতু সব কিছু শুনছেন, সবকিছু করছেন, সবার সঙ্গে যথাযথ ব্যবহার করছেন, কর্তব্যও পালন করে যাচ্ছেন। কিন্তু কাঞ্চনমালার মৃত্যুর পর থেকে বীভৎস রোগাক্রান্ত নগরী। পার্শ্ববর্তী কক্ষে মৃত্যুপথযাত্রিণী তাঁর প্রিয় রাণী, রাজপথ দিয়ে দলে দলে পুরবাসীদের অজানা পথের উদ্দেশ্যে যাত্রা, সব কিছু তাঁকে এক ঘোরের মধ্যে রেখেছে। তাঁর যেন কোন অনুভূতি নেই। দেখতে হয় তাই দেখছেন। করতে হয় তাই করছেন। ঊর্মিলার জন্য উদ্বেগ নেই। নগরীর জন্য মন কাঁদে না। এমন কি দেবযানীর গর্ভের সন্তানের ভবিষ্যতের কথাও এই মুহূর্তে তাঁর চিন্তায় আসছে না।

দেবযানী যখন বললেন, তাঁর প্রথম পুত্রের মৃত্যুর কারণ তাঁর পাপের ফল এবং দ্বিতীয় সন্তানের সময়ও এমন হতে পারে, তখন মহারাজা অনুভবশক্তিহীন অবস্থায় তাঁর মুখের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

দেবযানী তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর বুকে মাথা রেখে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলেন—তুমিও নীরব রইলে? আমি ভেবেছিলামম তুমি অন্তত সান্ত্বনা দেবে। ভেবেছিলাম তুমি অন্য কিছু বলবে। মহারাজের চেতনা হয়। তিনি বলেন—তুমি কোন পাপ করনি দেবযানী। তোমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য একথা বলছি না। এটা আমার বিশ্বাস। কারও পাপই নয়। অদৃষ্টে এমন লেখা থাকে। যা হোক আমি তোমাকে সেই আম্রকাননে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে অনেকে যাবে। তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

—তুমি?

—তুমি যদি নগরীর পথের দিকে দৃষ্টি ফেল তাহলে দেখবে দলে দলে নগরবাসীরা যে যার যতটুকু সম্বল মাথায় করে কাঁখে করে কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তবু আমি জানি কিছু কিছু মানুষ থেকে যাবে। যদি শেষ ব্যক্তিও যেত আমি তাহলে তোমাদের সঙ্গে যেতে পারতাম। তেমন হলে আমিও যাব।

সেই সময়ে জাহ্নবী কক্ষে প্রবেশ করে। সে উদ্ভ্রান্তর মত চেয়ে থাকে মহারাজের দিকে। তার চক্ষুদ্বয় জবা ফুলের মত লাল। দেবযানী তাঁর সখীর এই বিসদৃশ আচরণে যারপরনাই বিস্মিত হন। মহারাজা এই কক্ষে উপস্থিত থাকলে সাধারণত সে সঙ্গে সঙ্গে কক্ষ ত্যাগ করে।

তিনি সখীকে বলেন ওঠেন— তোমার কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে জাহ্নবী? মহারাজকে দেখতে পাচ্ছ না।

জাহ্নবী কোনরকম ত্রস্ততার ভাব না দেখিয়ে ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে পা বাড়ায়।

মহারাজা ডাকেন—জাহ্নবী, যেও না। এদিকে এস।

জাহ্নবী এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দেবযানীর অসহ্য বোধ হয়। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না।

মহারাজা বলেন—জাহ্নবী, আগামী কাল উষালগ্নে মহারানী রাজধানী ত্যাগ করে সেই আম্রকাননের কুটিরে যাবেন। তিনি সেখানেই থাকবেন। তোমাকেও যেতে হবে সঙ্গে। উনি সন্তানবতী। সেই সন্তানকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য। তুমি তোমার মনের মত যে কোন সঙ্গীসাথীকে নিয়ে যেতে পার। বিমলাকেও নিও।

দেবযানী জাহ্নবীর নির্বিকার ভাব দেখে তাকে উৎসাহিত করার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না। তিনি মহারাজকে বলেন—কোন পুরুষ যাবে না সঙ্গে?

—অবশ্যই যাবে। সৈন্যদল থাকবে, রক্ষী থাকবে। আমি চিত্রাক্ষের কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সে এখন দেশের বাইরে। বাস্তুকার কৃতবিদ্যকে পাঠাব। গঙ্গার তীরে আরও একটি নগরী স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে কিনা সে দেখবে। তোমার সন্তান যদি পুত্র হয় তাহলে তার নামে নগরীর নামকরণ হবে। আমার পিতা আমার নামে এই গড়ের নাম রেখেছিলেন। বোধহয় অত্যন্ত অশুভ ক্ষণে নামকরণ করা হয়েছিল। তখন তো আচার্য মিহির কিংবা খনা দেবী ছিলেন না। খনা দেবীর মুখে কিছু ক্ষতচিহ্ন থাকলেও তিনি জীবিত রয়েছেন। এবারে তাই নামকরণের শুভদিন ও ক্ষণ নির্ণয়ে কোন ভুল হবে না।

দেবযানী বলেন—আমি বলতে চাইছিলাম রাজধানীর অন্য কোন পুরুষ যাবে না? অন্তত একজন বিখ্যাত পুরুষ সঙ্গে গেলে ভাল হয়।

মহারানীর কথা মহারাজা চন্দ্রকেতু ঠিক বুঝতে পারেন না। হঠাৎ বিখ্যাত ব্যক্তির কথা কেন উঠছে? তাও আবার পুরুষ। তিনি বলেন—বিখ্যাত তো বেশ কয়েকজন রয়েছেন। তাঁদের পরিবার রয়েছেন। তাঁরা এই মুহূর্তে গিয়ে থাকবেন কোথায়?

—একজন রয়েছেন, যাঁর কেউ নেই। আমি তাঁকে সঙ্গে নিতে চাই।

— কে তিনি?

—বল্লভ। জাহ্নবী তার ভক্ত।

জাহ্নবী একথা শুনে থর থর করে কেঁপে ওঠে। সেই কম্পন উভয়ের কারও দৃষ্টি এড়ায় না। মহারাজ বিস্মিত। দেবযানী ভীত।

তবু মহারাজা না দেখার ভান করে বলেন—খুব ভাল হয়। আমিও বল্লভের ভক্ত। তাকে নাকি এক পটুয়া একটি সিংহবাহিনী দেবীর পট দিতে চেয়েছে। বল্লভ বলেছে, তার মনের মত হলে, সে একটি মূর্তি গড়বে। পরে কোন স্বর্ণকারকে দিয়ে সেই মূর্তি নির্মাণ করবে। বল্লভ যদি ওখানে যেতে সম্মত হয়, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। তবে আমি জানি, চন্দ্রকেতুগড় ছেড়ে সে কখনো কোথাও যাবে না।

জাহ্নবীর কম্পন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু সে যেন কেমন হয়ে যায়। তার মুখের কোন অভিব্যক্তি নেই। চোখের দৃষ্টি শূন্যতায় ভরা।

দেবযানী বিচলিত হয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বলেন—কি হয়েছে তোমার সখী!

মহারাজা উপস্থিত না থাকলে সে হয়ত আর্তনাদ করে কেঁদে উঠত। কিন্তু মহারাজের সামনে সে অশ্রু মোচন করবে না। সে বলে—তিনি তো নেই।

চন্দ্রকেতু প্রশ্ন করেন—কোথায় গিয়েছে? নগরী ছেড়ে সেও চলে গিয়েছে?

—না মহারাজ। আপনার অনুমান সঠিক। নগরী তিনি কখনো ছাড়তেন না। কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় তাঁর তো কোন হাত নেই।

—জাহ্নবী।

—হ্যাঁ মহারাজ, পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন তিনি। আমি বিদ্যাধরীতে গিয়েছিলাম

শবদেহ বাহকদের সঙ্গে। দাহের পর স্নান করে এসেছি। একটু সেবাও করতে পারলাম না। কারও সেবা তিনি কখনো নিতে চাইতেন না।

কক্ষে নিস্তব্ধতা নেমে আসে। মহারাজা এতক্ষণে দেবযানীর কথার মর্মার্থ অনুধাবন করেন।

জাহ্নবী খুব সংযত নারী। সে তার শোক প্রশমিত করে বলে—তিনি একটি অনুরোধই করে গিয়েছেন।

—কিসের অনুরোধ?

—তাঁর প্রতিবেশী এবং সুহৃদ গুণবান এবং তাঁর স্ত্রী দোপাটিকে যেন কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

--তারা তোমাদের সঙ্গেই যাবে। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তাদের বসবাসের ভার আমি নিলাম। বল্লভের মৃত্যু স্বাভাবিক সময়ে হলে আমাকে খুব আঘাত করত। কিন্তু রাজধানীর এই অবস্থায় আমি অনুভব শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। পাশের ঘরে ঊর্মিলা শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি। জেগে উঠলে আবার আনন্দমুখর চন্দ্রকেতুগড় দেখতে পাব।

রাণী ঊর্মিলা সত্যই শেষ হলেন। সেই সঙ্গে শেষ হতে লাগল একের পর এক নগরবাসী। চন্দ্রমুখী সর্বাঙ্গে গুটিকা নিয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে চলেছে জনশূন্য রাজপথ ধরে তাম্রলিপ্তের দিকে। কেউ দেখল না তাকে। কে কার সংবাদ রাখে?

চন্দ্রকেতুগড় শ্মশানে পরিণত হল কিছুদিনের মধ্যে। শৃগাল কুকুর কুটিরগুলোর অভ্যন্তরে ঢুকে মৃতদেহ টেনে টেনে বের করে আনে। প্রথম কিছুদিন আকাশে শত শত গৃধিনী অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর থেকে তারা আর আকাশে ওড়ে না। দল বেঁধে পার্শ্ববর্তী বৃক্ষগুলোতে বসে, ঘুমোয়। সেখানে তাদের ডিম্ব হয়, ডিম্ব থেকে ছানা হয়ে মানব শিশুর চেয়েও উৎকট শব্দে কাঁদতে শুরু করে। রাত বেরাতে শৃগালদের ঐক্যতান, ঊর্ধ্বমুখী কুকুরের আকুল আর্তস্বর, কালপেঁচার ডাক, সব মিলিয়ে নরকের দৃশ্য। সেই দৃশ্য শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য নগরীতে অবশ্য একটি মাত্র প্রাণীও অবশিষ্ট ছিল না। চন্দ্রকেতুর কি হল কেউ জানে না। তাঁর সন্তানসম্ভবা মহিষী কি জাহ্নবীর সঙ্গে রোগবিমুক্ত অবস্থায় আম্রকাননে পৌঁছেছিলেন? কেউ কি জানে? মহারাজা ভাবী-উত্তরাধিকারীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাদের পাঠিয়েছিলেন, তাদের কী হল? কে উত্তর দেবে?

বেড়াচাঁপার মোড় থেকে সেই ঢিপিগুলোর পাশে যদি কোনদিন কোন ভগীরথ গিয়ে দাঁড়ান, যদি চাপা কান্নার শব্দ শুনে বিচলিত হন, তাহলে হয়ত চন্দ্রকেতুগড়ের মর্মকথা জানা যেতে পারে তাঁর তপস্যার ফলে। কিন্তু আর কতদিন?